১১৩০ সাল



শ্রীশান্তিসুধা ঘোষ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

আড়াই টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৯৩০ সাল

১

অন্ধকার ঘরের কোণগুলি সায়াহ্নের অন্ধকার লাগিয়া আরও ঘুট্‌ঘুটে কালো হইয়া উঠিযাছে, কিছু দেখা যায় না। কোণের তাকের উপর হাত্‌ড়াইয়া বিভা পিল্‌সুজ আর প্রদীপটি বাহির করিল।

উঠানে দাঁড়াইয়া কে ডাকিল, "মা!"

বিভা বাহির হইয়া আসিল। চাঁদ এখনও আকাশ আলো করে নাই; তুলসীতলায় যে দীপখানি মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল, তাহার আলোয় ভালো করিয়া মুখ দেখা যায় না। বিভা চিনিতে পারিল না। অস্পষ্ট আলো-আঁধারে লম্বা চওড়া যে পুরুষমূর্ত্তিটি চোখে পড়িল, তাহাকে কোনদিন দেখিয়াছে বলিয়া মনে তো পড়ে না।

অর্দ্ধেক আড়ালে থাকিয়া অর্দ্ধেক বাহিরে ঝুকিয়া বিভা বলিল, "কে?"

আগন্তুক দুই পা অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা কোথায় ?"

মা গিয়াছেন খিড়কির পুকুর ঘাটে। বিভা উনানের কাঠগুলি ঠেলিয়া দিয়া বাহিরে নামিয়া বলিল, "ডেকে দিচ্ছি।"

কাচা কাপড়খানি কনুইয়ের উপর ফেলিয়া হাতে জলভরা ঘটি লইয়া মা নিজেই আসিয়া আঙ্গিনায় দাঁড়াইলেন। আগন্তুক ক্ষেমদার পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, "ভালো তো সব ?"

দ্বিধাভরে সসঙ্কোচে তাহার চিবুক ছুঁইয়া ক্ষেমদা মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মিনিটখানেক তাঁহার তটস্থতাটুকু লক্ষ্য করিয়া সে হাসিয়া বলিল, "চিন্‌তে পার্চ্ছেন না, মা ?"

এবার ক্ষেমদাসুন্দরী কিনারা পাইলেন। সস্নেহে শিরশ্চুম্বন করিয়া বলিলেন, "ওমা, তুমি ? কপাল আমার! অন্ধকারে ঠাহর কর্ত্তেই পারিনি। বুড়ো হয়ে যাচ্ছি কিনা!—এসো বাবা এসো, ঘরে চল।"

উঠানের প্রান্তসীমায় বেড়ার উপরে কাপড়খানা মেলিয়া দিয়া ক্ষেমদা ঘরে গিয়া উঠিলেন, পিছন পিছন ভদ্রলোকটি।

বিভা রান্নাঘরের জানালা দিয়া চাহিয়া চাহিয়া অবাক্ হইল।

খাটের উপর মাদুর বিছাইয়া দিয়া ক্ষেমদা বলিলেন, "এতকাল পরে আজ হঠাৎ কোত্থেকে, ব্রতী ?"

"এতকাল দেশেই ছিলাম না যে!"

মা বলিলেন, "দেশেই ছিলে না ? ছিলে কোথায় ?"

ব্রতীন্দ্র বলিল, "পশ্চিমে। কাশী, কাণপুর, লক্ষ্ণৌ—ওদিকে।"

মা পাখা দিয়া হাওয়া করিতে করিতে হরেক রকমের কুশলপ্রশ্ন শুধাইলেন। সেই যে বছর পনেরো আগে বাপের মৃত্যু খবর পাইয়া ব্রতীন্দ্র এ বাড়ী হইতে বিদায় লইয়া দেশে গিয়াছিল, তারপর আর দেখা সাক্ষাৎ নাই। প্রথম প্রথম চিঠিপত্র আসিত; তারপর ব্রতীও আর খোঁজ করে নাই, তাঁহারাও না। বড় ভালো ছিল ছেলেটি; এমন শান্ত, শিষ্ট, বিনয়ী, অথচ কাজের তাহার আর জুড়ি নাই। এই জন্যই ক্ষেমদা তাহাকে এত ভালোবাসিতেন। লোকে বলিত, —গরীবের ছেলে, কর্ম্মঠ না হইবেই বা কেন? বিনয়ী হওয়াও স্বাভাবিক। কিন্তু তাহা নয়, যাহারা বলে তাহারা জানে না। গরীবের ছেলে ক্ষেমদা অনেক দেখিয়াছেন, কিন্তু এমনটি বড় মেলে না।

ক্ষেমদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "পড়াশুনো সব শেষ হয়ে গেছে?"

ব্রতীন্দ্র বলিল, "হ্যাঁ—একেবারে।"

"ক'টা পাশ করলে?"

"ওই আই-এ পর্য্যন্তই। আর হ'ল না।"

ক্ষেমদা আফশোষ করিলেন। পড়িবার সুযোগ পাইলে ছেলেটা ভালো করিতে পারিত, এই তাহার ধারণা। কিন্তু অদৃষ্ট! যাক্।

"কাজ কর্ম্ম জুটেছে কিছু?"

"বরাত ভালো ছিল, ছ'মাসের মধ্যেই একটা পেয়ে গেলাম মার্চ্চেণ্ট আফিসে। ওই চাকরী নিয়েই তো এতদিন এখানে সেখানে ঘুরলাম, এখন ঘুরে ফিরে এসেছি আবার বাংলাতেই। এখন কিছুদিন এখানেই থাক্‌বো, আশা করছি।"

মা বলিলেন, "বেশ বেশ !"

কৈশোরে যে পেটের দায়ে কত মানুষের দ্বারস্থ হইয়া ফিরিয়াছে, এতকাল পরে ভগবান আজ তাহার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন তবু ! না চাহিবেনই বা কেন ? এমন সোণার চাঁদ ছেলে কি আর হয় ? দুই মুঠা ভাত জুটিত না, এখন সে একশত টাকার চাকুরি করে ! ভগবান্ সুপ্রসন্ন হইলে অদৃষ্ট ফিরিতে কতক্ষণ ? ক্ষেমদা মনে মনে বড়ই খুসী হইলেন ।

"পরিবার পরিজন সঙ্গেই থাকে বুঝি, না দেশে ?"

"সঙ্গে আর থাকবে কে, বলুন ? মা বছর দশেক হ'ল মারা গেছেন ।"

"মারা গেছেন ? কবে ? আমাদের একটা খবরও তো দাওনি বাছা ।"

ব্রতীন্দ্র লজ্জিত হইয়া বলিল, "সত্যি মা, অন্যায় হয়ে গেছে । বড্ড দূরে গিয়ে পড়েছিলাম কিনা, দেশের সঙ্গে সম্পর্কই ছিল না ।"

"তা বাবা যত বিদেশেই থাক না কেন, দেশের আত্মীয় বান্ধবদের কি ভুলতে আছে ?"

ব্রতী সলজ্জ হাসিল ।

"বৌ সঙ্গে থাকে না ?"

ব্রতীন্দ্র হাসিয়া বলিল, "বৌ কোথায় ?"

ক্ষেমদা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া গালে হাত দিয়া বলিলেন, "ওমা সেকি কথা ! বে' করনি এখনও ?"

"ওটা বুঝি না করলেই নয়, মা ?"

"না করবেই বা কেন, বাছা ? কুলীন বামুনের ছেলে, বয়স হয়েছে, দিব্যি রোজগার কবছ—বে' করবে না ? অমন ছন্নছাড়া হয়ে থাকবার দরকারটা কি ?"

বাস্তবিক, চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স হইতে চলিল, তাহাতে এমন সুরূপ ও স্বাস্থ্যবান্ বিবাহ না করিবার কি যে কারণ হইতে পারে, ক্ষেমদাসুন্দরী ভাবিয়াই পাইলেন না। হুঁঃ, আজকালকার ছেলেদের কি যে মতিগতি !

ব্রতীন্দ্র হঠাৎ বলিল, "আসল কথাটাই তো বলিনি মা, আমি আজ এখানে খাব কিন্তু !"

মা বলিলেন, "তা খাবেই তো ! সে আর বলবে কি, বাছা ?"

"আরও আছে। আমি হপ্তাখানেক এখাতে থাক্‌তে চাই, মা।"

"বেশ তো !"

বিভাব বাবা বেড়াইয়া ফিরিলেন। ব্রতীন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

মা বলিলেন, "কথা কও তোমরা, আমি আস্‌ছি।"

বান্নাঘবে বিভা কাজে ব্যস্ত। মা ঢুকিয়া বলিলেন, "ও এখানে থাক্‌বে। চাল ক'টি বাড়িয়ে নে।"

বিভা জিজ্ঞাসা করিল, "কে উনি, মা ?"

"ব্রতী।"

বিভা না বুঝিয়া আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া রহিল।

"আরে, তোদের ব্রতী-দা !"

"ও—মা, তাই নাকি ?"

২

সেদিন দুপুরে ঝা ঝা রৌদ্র মাথায় লইয়া ব্রতীন্দ্র বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, বেলা বারোটা। বাবু কখন্ আহারাদি করিয়া আফিসে চলিয়া গিয়াছেন, মা ও বিভা স্নান সমাপন করিয়া তাহার জন্য বসিয়া আছেন।

অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া সে বলিল, "বড্ড দেরী করে ফেলেছি, না ?"

জামাটা খুলিয়া ক্ষিপ্রহস্তে মাথায় তেল মাখিতে মাখিতে কাঁধের উপর গামছা ফেলিয়া ব্রতীন্দ্র উঠান পার হইয়া নামিয়া গেল। বারান্দার কোণে বসিয়া বিভা একটা মাসিক পত্রিকার পাতা উল্‌টাইতেছিল, একবার চাহিয়া দেখিল। বাঃ, ব্রতীদার কি সুন্দর দেহের গঠন,—এমন জোরালো চেহারা! ছেলেবেলায় কবে এই বাড়ীর ছেলে হইয়া সে এখানে ছিল, আবছায়া একটু মনে পড়ে মাত্র। মাত্র বছর পাঁচ ছয় তখন তাহার বয়স, মনে থাকেই বা কেমন করিয়া ? সব ভুলিয়া গিয়াছে, পরে মার কাছে শুধু তাহার কথা শুনিয়াছে মাঝে মাঝে। শুনিয়াছে, কেমন করিয়া সে ব্রতীদার কাঁধে চড়িয়া গোলাপজাম গাছ হইতে গোলাপজাম পাড়িয়া পাড়িয়া খাইত, পড়ার সময় খাতার উপর কালি ঢালিয়া, কোনও কোনও দিন পেন্সিল হারাইয়া তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিত, অথচ বেচারী এত নিরীহ যে ধমক্ পর্য্যন্ত দিত না। বিভার হাসি

পাইল। একটু একটু লজ্জাও লাগে,—ছিঃ! সেই ব্রতীদা এতদিন পরে আজ আবার আসিয়াছে। কত বছর কাটিয়া গিয়াছে, কত পরিবর্ত্তন!—ব্রতীন্দ্রের অনাবৃত পিঠের উপর ঝাঝালো রোদ আসিয়া লাগিতেছে, ফর্সা রং যেন একেবারে সোণালী হইয়া উঠে! বিভা চাহিয়া চাহিয়া ভাবিল, ব্রতীদা' এত সুন্দর হইল কবে? আগে তো ছিল না! না, কক্ষণো না!

খাওয়া-দাওয়ার পর ঘরে আসিয়া বারান্দার খাটখানার উপরে একটা আধ-ময়লা তাকিয়া টানিয়া লইয়া ব্রতীন্দ্র শুইয়া পড়িল।

সূর্য্য মধ্যগগনের অনেকটা ওপাশে হেলিয়া পড়িয়াছে, পূবের বারান্দায় আর এখন রৌদ্র নাই, নীচে হাতখানেক ওপাশ পর্য্যন্ত একটা ছায়ার রেখা দেখা যায়। কিন্তু তাহার ওদিক হইতেই একেবারে কাঠ ফাটানো রৌদ্র, চোখ মেলিয়া চাওয়া যায় না। একটা যেন আগুনের ঝলক আসিয়া লাগে। ব্রতীন্দ্র অন্যমনে চাহিয়া রহিল সেইদিকেই।

বিভা আসিয়া বলিল, "পান খাবে না, ব্রতীদা?"

"দাও।" পাশ ফিরিয়া হাত বাড়াইয়া পান দুইটি তুলিয়া লইয়া ব্রতীন্দ্র আবার বাহিরের দিকে চক্ষু ফিরাইল।

বিভা ফিরিয়া গেল।

অনেক দূরে কতগুলি আম কাঁঠালের গাছ ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঝল্‌সানো মাঠটার প্রখর উলঙ্গতা ঢাকিতে এই একটুখানি মাত্র ছায়া। চোখ পড়িতেই চোখের পাতা জুড়াইয়া

আসে। ব্রতীন্দ্র দেখিল একবার, কিন্তু মনের মধ্যে ছবি ভাসিল না —যথা মাঠ, তথা ঐ গাছ!

অসহ্য গরম! একবার পাশ ফিরিয়া ধুতির খুট দিয়া বুকের ঘাম মুছিতে ডাকিল, "বিভা!"

পাশের ঘর হইতে বিভা সাড়া দিল, "উ?"

"একটা পাখা।"

বিভা পাখা হাতে করিয়া খাটের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "হাওয়া কর্ব?"

ব্রতীন্দ্র হাসিয়া বলিল, "না না, হাওয়া করবার দরকার নেই। পাখাটা পেলেই চল্বে।"

বিভা কথা না শুনিয়া মাথার কাছে বসিয়া পড়িল।

নির্ব্বিবাদে তাহার হাত হইতে পাখাটা টানিয়া লইয়া ব্রতীন্দ্র চক্ষু বুঁজিল।

বিভা বলিল, "ঘুমুচ্ছ ব্রতীদা? ঘুমোও না, আমি বাতাস কর্চ্ছি।"

"না, ঘুমুচ্ছি না আমি।"

বিভা উঠিল।

বিকালের ছায়া তখনও পড়ে নাই, ক্ষেমদা নারিকেলের শুক্না ছোবড়াগুলি উঠানের একপাশে জড় করিয়া গুছাইয়া রাখিতেছেন, উনান জ্বালাইতে কাজে লাগিবে।

ব্রতীন্দ্র সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া জামা পরিতে পরিতে বলিল, "মা, আমি বেরোচ্ছি একটু, সন্ধ্যে নাগাৎ ফিরব। বাজার-টাজার আন্তে হবে কিছু?"

সেই ছেলেবেলাকার ব্রতী! এখন বড় হইয়াছে, পদস্থ গণ্যমান্য ভদ্রলোক, কিন্তু যেমনটি ছিল ঠিক তেমনই আছে! ক্ষেমদার কেমন একটু সঙ্কোচ হইল, বলিলেন, "না বাছা, তোমাকেই কষ্ট কর্ত্তে হবে না। রামশরণই যাচ্ছে।"

ব্রতীন্দ্র নামিয়া গেল। বাহিরে কে যেন অপেক্ষা করিতেছিল তাহার জন্য।

৩

আঠারো বৎসরের ছেলে সুখেন্দু, সবে ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়ে। কিন্তু মোড়লী কবিতে তাহাব সমানটি আর নাই বলিলেই হয়। যেমন কলেজে, তেমনি বাড়ীতে। বাবা প্রচণ্ড কড়া মেজাজী লোক, কিন্তু সে একমাত্র দিদি ছাড়া আর কাহাকেও মানে না। বাবা গুরুগম্ভীরমুখে ভ্রূকুটি করিয়া ধমক্ দিলে ভালোমানুষের মত চুপটি করিয়া শোনে এবং পরক্ষণেই চোখের আড়াল হইলে আবার যে-কে সেই। মা যখন তর্জ্জন গর্জ্জন করেন তখন মুখেব সামনেই হাসিয়া বলে, "হয়েছে, হয়েছে মা, মুখস্থ হয়ে গেছে, এখন চুপ কর।" কলেজেও তথৈবচ; ফার্ষ্ট ইয়ার হইতে ফোর্থ ইয়ার পর্য্যন্ত সমানে বন্ধুত্ব, বড় বলিয়া কাহাকেও যে স্বীকাব করিবে, ইহা তাহার কোষ্ঠীতে লেখে নাই। ক্লাসে অধ্যাপকদের লেক্‌চার অধিকাংশ সময়েই শোনে না, যখন বা মন দিয়া শোনে, তখন নিজে শিখিবার চেয়ে অধ্যাপকদের শিখাইবার দিকে ব্যস্ততা দেখা যায় বেশী,

কুতর্ক করিবার প্রেরণা জাগে এবং অতর্কিত প্রশ্নবাণে তাঁহাদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। কিন্তু সৌভাগ্য আছে, অধ্যাপকেরা কেহই তাহার উপর অপ্রসন্ন নহেন। ছাত্রপরম্পরায় তাহার কানে আসিয়াছে, তাঁহারা নাকি পরোক্ষে বলেন, ছেলেটা ইন্‌টেলিজেণ্ট! —সুতরাং বন্ধুমহলে প্রতিপত্তি আরও বাড়িয়া যায়।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারে পশ্চিমকোণের ঝোপের কাছে বসিয়া বিকালবেলা পাঁচ সাতজন বন্ধুর সহিত সুখেন্দু আলোচনায় রত। দেশের আর পাঁচটা অঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রসমাজও সম্প্রতি স্বাধিকারপ্রবুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে এবং বৃদ্ধ শিক্ষকদল পাছে ছড়ি লইয়া তাঁহাদের পাঠাগারের অভ্যন্তরে উঁকি মারেন, অথবা বৃদ্ধতর ইউনিভার্সিটী আক্রোশবশতঃ তাহাদের পরীক্ষার নম্বর কাটিয়া তাহাদের অধিকারচ্যুত করে, ইত্যাদি সব কিছুর প্রতিবিধানকল্পে তাহারা কোমর বাঁধিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে। গোড়াপত্তন হইয়াছে বৎসরখানেক পূর্ব্বে কলিকাতায়, এখন বাংলাদেশের সর্ব্বত্র তাহার শাখাবিস্তার করিয়া সে হইয়া দাঁড়াইয়াছে মহামহীরূহ। কিন্তু অসঙ্গতি ইহার গায়ে কোথা হইতে আসিয়া ইতিমধ্যে পরগাছার মত জড়াইয়া উঠিয়াছে, ছাত্রনীতির মধ্যে আসিয়া ঢুকিয়াছে রাজনীতি। অভিযানটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুল-ত্রুটী অমনোযোগের বিরুদ্ধে তত নয়, যত বিদেশীশাসনের অবিচারের প্রতি। বাহির হইতে দেখিয়া এখন বুঝিবার জো নাই, কোন্‌টি গাছ, কোন্‌টি পরগাছা! এ বৎসর এই নবজাত উদ্ভিদ্‌টির প্রতিষ্ঠা হইবে মহাসমারোহে, তারই আয়োজন চলিতেছে। বাংলাদেশের

জেলায় জেলায় ছাত্র-প্রতিনিধিদের কাছে নিমন্ত্রণ গিয়াছে, গরমের ছুটির পরেই কলিকাতায় বিপুল ছাত্রসভার অধিবেশন হইবে। সভাপতিরূপে আসিতেছেন পণ্ডিত জওহরলাল।

ইহা লইয়াই জল্পনা কল্পনা।

কিরণ সোৎসাহে বলিল, "একটা উপযুক্ত reception দিতেই হবে।"

"আচ্ছা, delegates ক'শো আস্‌বে বলতে পারেন ?"

"আন্দাজে ঠিক বলতে পার্চ্ছিনে।"

"শ' দুই হবে না ?"

সোমেন বলিল, "তা জানিনে। কিন্তু কন্‌ফারেন্সটা খুব successful যে হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।"

কোণের দিক হইতে মহেন্দ্র ধীরে ধীবে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, জওহবলালকে প্রেসিডেণ্ট কবা কেন, বলুন দেখি ? ছাত্রসম্মিলনের নায়কত্ব করবার জন্যে যোগ্যতর লোক কি বাংলাদেশে মিলল না ?"

"কেন ? জওহরলালজীর চেয়ে যোগ্যতর লোক ক'টা আছে শুনি ?"

কিরণ বলিয়া উঠিল, "ওসব narrow provincialism আজকেব দিনে শোভা পায় না, মহেন্দ্রবাবু!"

মহেন্দ্র বলিল, "না না, সে কথা নয়। আমি বল্‌ছি, এটা যখন ছাত্রসম্মিলন, তখন veteran educationistদের বাদ দিয়ে politicianকে নিয়ে টানাটানি কেন ?"

"কেন ? ছাত্রদের রাজনীতিচর্চ্চা কর্ত্তে নেই নাকি ?"

"তা থাকুক, আপত্তি নেই। কিন্তু ছাত্র মুখ্যতঃ ছাত্রই।"

সোমেন বলিল, "ভুল কর্চ্ছেন, মহেন্দ্রবাবু! আজকেব দিনে politics আমাদের সবচেয়ে বড় কথা। ইউরোপের দিকে চেয়ে দেখুন দিকি, তাঁদের ছাত্রদল দেশেব জন্যে কি না করেছে এবং করছে? আমাদের দেশের মত তাদের দেশেব রাজনীতিটা ছাত্রদের পক্ষে একটা faboo নয়।"

মহেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "কথায় কথায় ইউরোপ, আমেবিকা টানেন কেন মশাই? এ, চৌধুরী একটা কথা বলেছিলেন জানেন তো?—A subject nation has no politics."

সুখেন্দু গর্জ্জিয়া উঠিল, "A subject nation has nothing but politics!"

মহাখুসী হইয়া সোমেন ও কিবণ বলিল, "Hear hear!"

"তা বেশ তো! রাজনীতিচর্চ্চা করবেন তো খোলাখুলিই করুন না? ছাত্র-আন্দোলনের মুখোস পরবার দরকার কি? একে তরুণ-আন্দোলন বল্লে আমার আপত্তি করবার কিছু নেই; কিন্তু ছাত্র-আন্দোলন যতক্ষণ নাম দেবেন, ততক্ষণ একে শিক্ষামূলক বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ কর্ত্তেই হবে। তা নইলে এটা একটা misnomer."

সুখেন্দু বলিল, "ও নিয়ে আমি মাথা ঘামাইনে। ওসব নিয়ে তর্কাতর্কি আপনারা পণ্ডিতেরা করুন গে'। আমি চাই দেশের রাজনীতিক মুক্তি—ছাত্রসভা বা শিক্ষকসভা, তরুণসঙ্ঘ কিংবা প্রবীণসঙ্ঘ, যার মধ্যে দিয়ে হোক্। সোজা কথা!

মহেন্দ্রের পাশ ঘেসিয়া আরেকটি যে ছেলে বসিয়াছিল সে ঠাট্টা করিয়া বলিল, "তোর মুখে এ হেন কথা, সুখেন্দু! দেশসুদ্ধ লোক যখন সাইমন কমিশনকে কালো নিশান দেখাচ্ছে, তোর বাবা যে সগর্বে দিতে যাচ্ছেন তার সামনে evidence! আর তুই বলিস্ এমন seditious কথা? উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র হতে পারলি নে। ছ্যাঃ ছ্যাঃ!"

সুখেন্দু চটিল, "বাবা সাইমন কমিশনে যোগ দিচ্ছেন তো আমার কি?"

"আরে চট কেন? শাস্ত্রে বলে কি না—যেনাস্য পিতরো যাতাঃ, যেন যাতাঃ পিতামহাঃ—সেইজন্যে বল্‌ছিলাম!"

বন্ধুরা জানে, বাবার রাজভক্তির খোঁচাতেই সুখেন্দু চটিয়া উঠে সবচেয়ে বেশী। কাজেই তাহাকে ক্ষেপাইবার পক্ষে এমন অব্যর্থ মহৌষধ আর নাই। ভারি মজা!

কিন্তু এবার সুখেন্দু লজ্জার মেঘ হাসির হাওয়ায় উড়াইয়া দিয়া বলিল, "আরে, রেখে দাও ওসব বাজে কথা! কাজের কথা শোন—"

কাজের কথা আজ তাহাদের অনেক। তিন সপ্তাহ পরে কন্‌ফারেন্স। অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যসংখ্যায় তাহারাও আছে। সোমেন ভালো বক্তৃতা দিতে পারে, সুতরাং সভায় তাহাকে বলিতে হইবে একটা কিছু নিশ্চয়ই। সুখেন্দুর গভীর ক্ষোভ, সে গুছাইয়া বলিতে পারে না মোটেই; ঘরোয়া আলোচনার মধ্যে তুমুল তর্ক করিতে পারিলে কি হইবে? তর্কযুদ্ধে ঘুষি পাকাইয়াও সময়ে

অসময়ে কিস্তিমাৎ করা যায়, কিন্তু প্রকাশ্য সভায় ধীরে সুস্থিরে সভ্যগণের হৃদয় জয় করিবার রীতি সে জানে না। অথচ এতবড় এক বিরাট্ সম্মিলনী, ইহাতে সে যে চুপটি করিয়া পিছনে বসিয়া থাকিবে, এও অসম্ভব। কেমন একটা অদৃশ্য ভূত তাহার বুকের কোণে বাসা বাঁধিয়া আছে, কেবলই সে ধাক্কা দিয়া সামনে ঠেলিয়া দেয়। ভিতরের ভূত যখন বা একটু ঘুমায়, বাহিরের দশচক্রে তখন ভগবান্‌কে ভূত বানাইয়া ছাড়ে। সুতরাং আড়ালে বিশ্রাম করা তাহার বরাতে নাই।

কিরণ বলিল, "ও resolutionটা তোমাকেই move কর্ত্তে হবে, সুখেন্দু।"

"move তো করব, তারপর? বলার পালাটা?"

"ও, সেটা সোমেনের ঘাড়ে রইল, সোমেন second করবে। তুমি resolutionটা পড়েই খালাস।"

সুখেন্দু রাজি না হইবার কারণ দেখিল না।

সেই ছেলেটি আবার কৌতুক করিয়া বলিল, "বল কি? সুখেন্দু move করবে ওই resolution? ওর বাবার রায়বাহাদুরী খেতাবটা—। সুখেন্দু রে, ভালো করে ভেবে চিন্তে ছাখ্!"

সুখেন্দু ক্ষেপিয়া গিয়া ঘুষি বাগাইয়া বলিল, "থামো বল্‌ছি!"

মুহূর্ত্তে অবনতপৃষ্ঠ হইয়া হাত দুখানি জুড়িয়া সে কৌতুকহাস্যে বলিল, "আঃ, কর কি, কর কি! মাপ কর ভাই, আর বল্‌ব না।"

আকাশে কখন্ একটু একটু করিয়া মেঘ জমিতেছিল। টিপ্

টিপ্ করিয়া বৃষ্টি নামিয়া পড়িল। গল্পগ্রস্ত ছেলেব দল হঠাৎ চেতনা পাইতেই কিরণ পাঞ্জাবীব পিঠে ও মাথায় হাত ঘষিতে ঘষিতে বলিল, "এঃ! সব ভিজে গেল! বিনা নোটীশে এমন করে ঘাড়ের ওপর নেবে পড়া—একি অভদ্রতা ?"

রাস্তায় খান্ দুই ট্রাম আসিয়া পড়িয়াছে। মাথায় রুমাল জড়াইয়া চট্‌পট্ করিয়া সবাই উঠিয়া ছুটিল ট্রাম ধবিতে। ফুটপাথের উপর গাধার মত কে ফেলিয়া গিয়াছে কলার ছোবড়া। সোমেন পা ফস্‌কাইয়া প্রায় পড়ে আব কি ?



৪

ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের উপরেই অবসরপ্রাপ্ত জজ্ রায়বাহাদুব রমেশচন্দ্র গুপ্তের দোতালা বাড়ী। রেলিংএব গোড়া দিয়া সাবি বাঁধা টবে দেশী বিদেশী ফুলের গাছ, উপরে টাঙানো অর্কিডেব পঙ্‌ক্তি, রাস্তায় দাঁড়াইয়া উপরে তাকাইলেই দেখা যায়। বাবান্দাব এক কোণে একটা খাঁচা ঝুলিতেছে; সবুজ পুচ্ছ দোলাইয়া তাহার মধ্যে বসিযা আছে দুইটি টিয়াপাখী। ছোট্ট একটি বছর বারোর মেয়ে বেণী দোলাইয়া দোলাইয়া টিয়ার সঙ্গে কথা বলিতে ব্যস্ত।

সুখেন্দু উপরে উঠিয়া বরাবর বারান্দা বাহিয়া প্রান্তসীমার ঘরখানার মধ্যে ঢুকিয়া ডাকিল, "দিদি!"

শিবানী ডেস্কের কাছে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে লিখিতেছে। মাথা না তুলিয়া উত্তর দিল, "উঁ ?"

ঘরখানি পরিপাটি, কিন্তু অনর্থক আড়ম্বর এবং বিলাসসজ্জা কিছুই চোখে পড়ে না। থাকিবার মধ্যে আছে কয়খানি বড় বড় ছবি, একখানি বিবেকানন্দ—ঘরে ঢুকিলে সর্ব্বাগ্রেই সেখানা চোখে পড়ে,—একখানা খৃষ্ট আর একখানা বুদ্ধ ; এদিকে হিমালয়ের শিখর, সমুদ্র এবং ঐ রকমেরই আরও কি কি। একপাশে দেয়াল ঘেসিয়া খাটের উপরে বিছানা, অন্যপাশে একটা ছোট কাঠের টেবিলের চারিপাশে খান দুই তিন কাঠের চেয়ার। পায়ের কাছে বেতের ঝুড়িতে ছেঁড়া অকেজো কাগজের টুক্‌রা স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে। আরও একটি জিনিষ—দেয়ালের কোনে একটা টিপয়ের উপর ধূপদানী।

সুখেন্দু টেবিলের পাশে একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিল, "একটা কাজ করে দিতে হবে আমাকে।"

"কি, বল ?"

"আমাকে একটা স্পীচ্ লিখে দেবে তুমি, আমি কন্‌ফারেন্সে পড়ব। বুঝলে ?"

শিবানী বলিল, "লিখে দেব আমি আর পড়বে তুমি ? ভারি মজা পেয়েছ রোজ রোজ, না ? নিজে লেখ।"

"বাঃ, আমি লিখ্‌তে পারি নাকি ?"

"না পার, লিখো না ; পড়েও কাজ নেই !"

"ঈস্ !"

শিবানী লিখিয়া চলিল। সুখেন্দু আবার বলিল, "সত্যি দিদি, দেবে কিন্তু !"

উঁহু। অনেক দিয়েছি। আর চলবে না পরের বিদ্যেয় বাহাদুরী করা। এবার নিজে লিখ্‌তে শেখ।"

সুখেন্দু বসিয়াই রহিল। কথা আদায় না করিয়া সে পড়িবে না, লেখাইতে তো সে অন্যকে দিয়াও পারে, কিন্তু দিদির উপরেই তাহার শ্রদ্ধা গভীর। একে তো সে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, সুতরাং পাণ্ডিত্য কিছু আছেই। তা ছাড়া, সাহিত্যিক বলিয়া শিবানীদেবীর খ্যাতি যথেষ্ট। ঘরের মধ্যে এমন সুযোগ পাইতে পরের কাছে প্রবন্ধ লিখাইতে গিয়া সে মান খোয়াইবে কেন?

অনেকক্ষণ পরেও দিদির তরফ হইতে সাড়াশব্দ না পাইয়া সুখেন্দু রাগিয়া বলিল, "দেবে কি না বল?"

শিবানী হাসিয়া বলিল, "না দিলে?"

"না দিলে আমার আর লেখাবার লোক নেই ভেবেছ নাকি?"

"তাদের কাছেই যাও তাহলে।"

কিন্তু সুখেন্দু উঠিল না।

শিবানী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কবে তোর চাই শুনি?"

উৎসাহিত হইয়া সুখেন্দু বলিল, "দু সপ্তাহের মধ্যে।"

"ওঃ, ঢের দেরী।"

"তা হোক্। লিখে তো রাখ তুমি।"

"আচ্ছা হবে এখন। ভয় নেই।"

ভয় আর সুখেন্দুর তিলমাত্র নাই। দিদি যখন একবার ভরসা দিয়াছে, তখন স্বচ্ছন্দে নির্ভাবনা হওয়া চলে। হাতের কাজটা না ফুরাইলে দিদি এখন গল্প করিবে না এবং অনর্থক কথা বলিয়া

তাহার কাজে ব্যাঘাত জন্মাইবার এখন আর প্রয়োজনও নাই; সুতরাং সুখেন্দু ঘরের বাহির হইয়া গেল।

বাহিরে কল্যাণী তখনও টিয়ার সঙ্গে খেলা করিতেছে। সুখেন্দু চুপি চুপি গিয়া পিছন হইতে তাহার বেণী ধরিয়া টান দিল।

কল্যাণী চম্‌কাইয়া পিছনে তাকাইয়া চেঁচাইল, "আঁঃ—কি কর যে দাদা!"

"শোন্ শোন্, একটা মজা দেখবি?"

মজা দেখাইবার মত কোনও বিষয়বস্তু কাছাকাছি কোথাও মিলিল না। অগত্যা সুখেন্দু তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল অপরাজিতা লতার চারা গাছটির কাছে।

"ছাখ্, এইটুকুন্ গাছে আবার ফুল ধরেছে কেমন, কালো কুচ্‌কুচে—ঠিক তোর মত।"

কল্যাণী বলিল, "ঈস্! তোমার মত।"

সুখেন্দু তাহার হাতের সঙ্গে নিজের হাতখানি মিলাইয়া বলিল, "ছাঁখ্ দেখি কে ফর্সা?"

কল্যাণী হাসিয়া কুটিপাটি। বোলো না আর, দাদা! যতই পিয়ার্স সোপ ঘষ, আমার সমান হতে তোমার ঢের দেরী!"

"বামঃ, আমি নাকি পিয়ার্স সোপ ঘষি তোর মত? বিলিতি সাবান, ছ্যোঃ!!"

ঘুরিয়া ফিরিয়া সুখেন্দু আবার শিবানীর ঘরের মধ্যে আসিয়া হাজির।

"এখনও তোমার লেখা হল না, দিদি?" বলিয়াই সটান্ শিবানীর খাটের উপরে গিয়া চিৎ হইল, "কলি, শোন্ শোন্, এদিকে আয়।"

কল্যাণীর হাত দুইখানা হাতের মধ্যে চাপিয়া বলিল, "একটা গল্প বলি শোন্। আচ্ছা, তোদের ইস্কুলে ক'শো মেয়ে?"

"অনে—ক।"

"কত?"

"তা জানিনে।"

"আমাদের কলেজে কত ছেলে জানিস্? এ—ক হাজার!"

"কক্ষনো না!"

"না? জিজ্ঞেস কর দিদিকে। দিদি, তাই না?"

সুখেন্দুর অর্থহীন বাক্যস্রোত ক্রমাগতই শিবানীর কাণে আসিতেছিল। সে মৃদু ধমক্ দিয়া বলিল, "তুই বড্ড বাজে বকিস্, সুখু।"

বিছানার উপরে অর্দ্ধেক উঠিয়া বসিয়া সুখেন্দু বলিল, "বাজে বক্‌ব না তো দিনরাত কাজের কথা নিয়ে ঘ্যানর ঘ্যানর করব নাকি? রবিঠাকুর কি বলেছেন জানো?—'মানবধর্ম্ম বল্‌তে আমরা যা বুঝি, প্রকৃতির প্রয়োজন সে পেরিয়ে, সে আস্‌চে অতিরিক্ততা থেকে।"

শিবানী হাসিয়া ফেলিল, "যার মানে বুঝতে পারিস্ না, তা নিয়ে তর্ক করিস্ নে।"

সুখেন্দুর আত্মসম্ভ্রমে ঘা লাগিল। সে যাহা পড়ে তাহার

অর্থবোধ করিতে পারে না, তাহার ধীশক্তির উপর এমন অপবাদ সহিতে সে কোনদিন রাজি নয়, দিদির কাছ হইতেও না। সে বলিল, “খুব বুঝেচি। বুঝিনি কি রকম? যত বুদ্ধি বুঝি তোমার একলারই?”

ছেলেমানুষ ভাইটির সঙ্গে তর্কাতর্কির দিক্ দিয়াও শিবানী গেল না, সুখেন্দুর ধাত সে জানে। লিখিতে লিখিতে গম্ভীরভাবে বলিল, “কথা যারা বেশী বলে, তাদের ভেতরটা বড্ডই ফাঁপা। তারা কস্মিন্‌কালেও মানুষ হতে পারে না। বুঝলে, সুখু?”

সুখেন্দু চুপ করিয়া রহিল। দিদি বকিলে তাহার মনে বড় লাগে, অথচ কিছু বলাও চলে না।



সমস্তটা দিন আকাশের মুখ ভারি হইয়া আছে। বৃষ্টি একফোঁটাও হয় নাই, অথচ মেঘে মেঘে দিগন্ত আচ্ছন্ন পশ্চিমের বাঁশগাছগুলি শন্ শন্ করিয়া হাওয়ায় নড়ে, মেঘলা আকাশের ধূসর গায়ে তাহার অভ্রভেদী শীর্ষগুলি দাঁড়াইয়া আছে পৃথিবীর আশেপাশের আর সব কিছুকে ছাড়াইয়া। থম্‌থমে আবহাওয়া আরও যেন উদাস হইয়া আসে। ঘরের কাছের টগরফুলের গাছটা ফুলের গুচ্ছ মাথায় পরিয়া বাতাসে রোজকার মতই নাচিতেছে, শুধু রৌদ্র লাগিয়া পাতায় পাতায় যে চক্‌চকে তৈলচিক্কণ আভা ঝরিয়া পড়ে, সেটুকু আজ নাই।

বিভার মনটা খারাপ।

সন্ধ্যা লাগিতেই ঘরে ঘরে লণ্ঠন জ্বালাইয়া রাখিয়া সে চলিয়া গেল রান্নাঘরে। ব্রতীন্দ্র আজ সখ করিয়া বাজার হইতে এক জোড়া ইলিশমাছ লইয়া আসিয়াছে তাহাদের জন্য। রামশরণ মশলা বাঁটিয়া রাখিয়া সে দুইটিকে আঁস্ ছাড়াইতে ঘাটে লইয়া গিয়াছে। বিভা তরকারীর ঝুড়ি টানিয়া বসিল। কাল সকালে আটটার ট্রেণে ব্রতীন্দ্র কলিকাতা ফিরিয়া যাইবে। বিভা তরকারীগুলি নাড়াচাড়া করিতে করিতে ভাবিল, কি আজ রাঁধিবে সে? ব্রতীদা কোন্ জিনিষ খাইতে ভালোবাসে, তাহার জানাও নাই। মার কাছে কখনও শোনে নাই; আজ একবার সে নিজে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'কি খেতে তুমি ভালোবাসো ব্রতীদা?' ব্রতীন্দ্র হাসিয়া উত্তর দিয়াছে, 'সবই।'

ঘরের মধ্যে মেঝেতে বসিয়া ক্ষেমদা একঝুড়ি সুপারি লইয়া খোসা ছাড়াইতে বসিয়াছেন। তিনি সংসারী মানুষ; পুকুরপাড়ে যে গোটা দশ বারো সুপারী গাছ আছে, তাহাতে ফল ফলে প্রচুর, যথাসময়ে সেগুলি পাড়াইয়া ও শুকাইয়া তিনি সঞ্চয় করিয়া রাখেন। বৎসরের সুপারীর কাজ তাহাতেই চলিয়া যায়, উপ্‌চাইয়াও পড়ে। এই সব খুঁটিনাটির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া গৃহস্থালীর সুবন্দোবস্ত করিতে তাঁহার ভালো লাগে।

ব্রতীন্দ্র পাশের কাম্‌রায় বসিয়া টেবিলের উপরে লণ্ঠনের আলোতে ঝুঁকিয়া কিসের নক্সা আঁকিতেছে। ক্ষেমদা জাঁতি হইতে মুখ না তুলিয়াই ডাকিয়া বলিলেন, "ভালো ছেলেটেলে খোঁজে আছে, ব্রতী?"

ব্রতীন্দ্র একান্ত অভিনিবিষ্টতায় কথাটা শুনিতে পাইল না। হাতের কাজ করিয়াই চলিল।

উত্তরের অপেক্ষায় থাকিয়া মা আবার বলিলেন, "শুন্‌ছ বাছা ?"

অন্যমনস্কভাবে ব্রতী বলিল, "উঁ ?"

ভালো ছেলেটেলে চোখে পড়ে ?"

ব্রতী সজাগ হইয়া উঠিল। কাণের মধ্যে শব্দগুলি সমস্তই ঢুকিয়া রহিয়াছে কেবল মনের অনবধানতায় সেগুলি অর্থহীনভাবে এলোমেলো ভাসিয়া বেড়াইতেছে মাত্র। মার প্রতি অমনোযোগিতায় ঈষৎ লজ্জিত হইয়া ব্রতী তাড়াতাড়ি বলিল, "এ্যাঁ ? ভালো ছেলে ? হ্যাঁ, অনেক আছে। কেন ?"

"বিভাটার বিয়ে দিতে হবে তো ? আর কদিন বসিয়ে রাখা যায় ? কল্‌কাতা ফিরে তাহলে একটু খোঁজ খবর রেখো, কেমন ?"

"ও। আচ্ছা।" ব্রতীন্দ্র আবার লিখিতে বসিল।

মা থাকিয়া থাকিয়া আবার কথা বলেন। ব্রতীন্দ্রের কাজে ব্যাঘাত পড়ে। কিন্তু আজ রাত্রের মধ্যে ইহা না করিলেই নয়, সুতরাং সে যথাসাধ্য ভদ্রতা রক্ষা করিয়া নাক কাণ বুঁজিয়া দ্রুত কলম চালাইতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে ফাউণ্টেন্ পেন্‌টা বন্ধ করিয়া ব্রতী বসিবার টুলটা দরজার গোড়ায় টানিয়া আনিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিল; ওপাশেই মেঝেতে বসিয়া মা।

ব্রতী জিজ্ঞাসা করিল, "বিভা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছে, না মা ?"

"হুঁ।"

"ওকে আর পড়ালেন না কেন?"

"কলেজ কোথায় এখানে?"

ব্রতী বলিল, "কল্‌কাতায় দিলে হত না?"

মা টানিয়া টানিয়া বলিলেন, "কল্‌কাতায় কে-ই বা আছে আমাদেব! বোর্ডিংয়ে রেখে পড়ালে খরচ দেদার, আমাদের সাধ্যও নেই। আর দরকারই বা কি? মেয়েমানুষের ওই যথেষ্ট! এখন সুপাত্রে দিয়ে দিতে পারলেই হয়।"

"হুঁ তা বটে।" খানিকক্ষণ থামিয়া ব্রতী একটু ভাবিয়া বলিল, "চেষ্টা করলে কল্‌কাতাতে ফ্রি—পড়াখরচ পাওয়া যায় কিন্তু অনেকসময়, মা।"

রান্নার কাজ সমাপন কবিয়া বিভা সিঁড়ির মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘরে পা দিতেই ব্রতীন্দ্র বলিয়া উঠিল, "এই যে বিভা! যাবে আমার সঙ্গে?"

"কোথায়?"

"কল্‌কাতায়?"

তাৎপর্য্য না বুঝিয়া বিভা ব্রতীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

ব্রতীন্দ্র হাসিয়া বলিল, "সত্যি!"

"কী যে বল তুমি!" বলিয়া একটুখানি হাসিয়া অকারণে লজ্জিত হইয়া বিভা পাশের বারান্দায় চলিয়া গেল।

ব্রতীন্দ্র ক্ষেমদাকে বলিল, "সত্যি মা, ভেবে দেখবেন। ওর

বাবাকেও বলে দেখুন। যদি দরকার মনে করেন তো আমাকে জানালে আমি চেষ্টা কর্ত্তে পারি।”

মা অর্দ্ধস্বগতোক্তির মত বলিলেন, “দেখি!” তারপরে, “আর আমি যে কথাটা বল্লাম, সে বিষয়ে একটু বিশেষ করে খোঁজ দেখো কিন্তু, ভুলো না। বুঝলে?”

বেড়ার ওপাশে বারান্দায় বসিয়া বিভা শুনিয়া বিশেষ কিছু বুঝিল না বটে, তবু যেন মাব উপর মনে মনে রাগ হইল।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হইতে-না-হইতে আকাশের চোখ ফাটিয়া বৃষ্টির ধারা নামিল—ঝরঝর, ঝম্‌ঝম্‌।

বিভা নিজের বিছানায় শুইয়া আপাদমস্তক কাঁথা মুড়ি দিল। টিনের উপর বারিপাতের শব্দ শুনিতে বেশ লাগে। ছেলেবেলাকার সেই ছড়াটা মনে পড়িয়া গেল, ‘আয় বৃষ্টি হেনে, ছাগল দেব মেনে।’ এমনি জোরে মুষলধারে বৃষ্টি যদি অনেকক্ষণ থাকে তো বেশ হয়! যদি আজ না-ই থামে, কালও না থামে। কাঁথার তলায় মৃদু ঠাণ্ডায় আরামে শুইয়া শুইয়া অর্থহীন নানা কথা আবোল-তাবোল ভাবিতে ভাবিতে বিভার চোখের পাতা ঘুমে বুঁজিয়া আসিল। কোথায় আধমরা নদীটি কচুরীপানায় কানায় কানায় ভরা, তীরের মত বৃষ্টির ধারা ছুটিয়া আসিয়া কচুরীগুলিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতেছে; বড় বড় ফোঁটা নদীর জলে পড়িয়া আবার ছিটকাইয়া উঠিতেছে, যেন পাল তোলা ক্ষুদে ক্ষুদে জাহাজের মত। কেমন মাঠ! কচি ধানের সবুজ আলোয় চোখ ভরিয়া উঠে! মাঝখান দিয়া রেল লাইন—বাঁকা, সোজা, কতদূর চলিয়া গিযাছে। অন্ধকারে ঝাপসা

হইয়া আসে আবার। ধোঁয়ায় মিলাইয়া গেল। ঝম্‌ঝম্‌, ঝম্‌ঝম্‌—ঝক্‌ঝক্‌, ঝক্‌ঝক্‌; গাড়ীতে বসিয়া বিভা শুনিতেছে রেলগাড়ীর চাকার শব্দ। ভোঁস্‌ ভোঁস্‌ করিয়া ইঞ্জিনের ধোঁয়া উঠিয়া আকাশে মিলায়? চাকার গতি মন্থর হইয়া আসিল নাকি? জানালা দিয়া কৌতূহলে মাথা গলাইয়া বিভা দেখে, সে আসিল কোথায়? দালান, বাড়ী, গাড়ী, মস্ত মস্ত—উঁ? শিয়ালদা?

ঘুমের ঘোরে অস্ফুট একটু ধ্বনি করিয়া বিভা পাশ ফিরিয়া শুইল। উঃ, বৃষ্টি এখনও আসে নাই। শিয়ালদা? কিন্তু নামে কি করিয়া?

ব্রতীন্দ্র কোন্‌খান্‌ হইতে আসিয়া ছাতাটা আগাইয়া দিল। —আঃ, বাঁচালে!

পরদিন সকালবেলাও বাদল ঝরিতেছে। গত রাত্রের প্রচণ্ড আবেগের পরে দেহ যেন তাহার অবসন্ন হইয়া আসিয়াছে। গা এলাইয়া দিয়া কেবল একটা একটানা শ্রান্তির আর্ত্তনাদ। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন; মনে হয় যেন এখনও রাত্রি শেষ হয় নাই, এমনই অন্ধকার! কিন্তু বিভার ঘুম ভাঙিয়া গেল যথাসময়েই। চোখ বুঁজিয়া শুনিতে পাইল, কাকগুলি গাছের ডালে ডালে ভিজিয়া আর্ত্তস্বরে চেঁচাইতেছে।

সকালের দিকে এমন বৃষ্টি হইলে কাজের দিনে অসুবিধা হয়। আফিস কাছারীর ভাত রাঁধিবার তাড়া, এদিকে ঘুম হইতে উঠিতে প্রায়ই দেরী হইয়া পড়ে, আবার এঘর ওঘর করিতে গিয়া

কাপড়চোপড় ভিজিয়া চুপ্‌চুপে হইয়া উঠে। ছাতা লইয়া কাঁহাতক ছুটোছুটি করা যায়? বিভা তাহা পারে না। অথচ কাজের ভার প্রধানতঃ তাহারই। মা আবার বলিয়া গেলেন দু'খানা লুচি ভাজিয়া ব্রতীকে জলখাবারটা পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া দিতে।

বিভা কথা না বলিয়া কাজগুলি যথাবিধি করিয়া চলিল। লুচি ভাজিয়া, বেগুন ভাজিযা, চায়ের কেট্‌লী উনানে চড়াইয়া সে রান্নাঘর হইতে মুখ বাড়াইয়া ডাকিয়া বলিল, "খেতে পাঠিয়ে দাও মা।"

ব্রতীন্দ্র লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া রান্নাঘরে আসিয়া উঠিল। হাত দিয়া মাথার চুলগুলি মুছিতে মুছিতে ভিজা পা দুইখানি মাটিতে রাখিয়া কোনমতে সিঁড়িতে বসিয়া পড়িল। বিভা বলিল, "ছাতাটা আন্‌তে বারণ করল কে?

"কেউ না?" অন্যমনস্কভাবে লুচির খানিকটা ছিঁড়িয়া ব্রতী মুখে পূরিল।

রান্নাঘরের জানালা দিয়া বড় জামরুল গাছটা দেখা যায়। এক একটা দম্‌কা হাওয়ায় তাহার পাতা বাহিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতেছে। বৃষ্টিরও স্থিরতা নাই, কখনও পাৎলা হইয়া আসে, কখনও আবার ঝপ্‌ করিয়া এক পশলা বৃষ্টি নামিয়া পড়ে। ব্রতীন্দ্র সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল, হাওয়ায় পাতা নড়া, আর পাতার প্রান্ত বাহিয়া মুক্তা ঝরা।

বিভা পেয়ালায় চা ঢালিতে ঢালিতে একবার তাহার আন্‌মনা মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বড্ড বৃষ্টি পড়ছে বাইরে, না? আচ্ছা, আজকে তোমার না গেলে চলে না?"

ঘরের মধ্যে চক্ষু ফিরাইয়া আনিয়া ব্রতী বলিল, "যেতেই হবে।"

"না গেলেই নয় ?"

ব্রতীন্দ্র মাথা নাড়িল।

বিভা আর কিছু বলিল না।

আকাশের পূবদিকটা একটু যেন ফাঁক হইয়া ফর্সা হইয়া আসিয়াছে। সূর্য্য না উঠিলেও ঘড়ির কাঁটা টিক্ টিক্ করিয়া চলে, সুতরাং সময়ের থামিয়া থাকিবার সাধ্য নাই। সাড়ে সাতটা বাজিয়া গিয়াছে।

ব্রতী পকেটে হাত দিয়া মানিব্যাগ এবং কয়েকখানা কাগজপত্র স্পর্শ করিয়া লইয়া মা ও বাবাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল, "এখন আসি তাহলে ?"

বিভা রান্নাঘরে চোখ তুলিয়া জানালা দিয়া একবার বাহিরের দিকে তাকাইল, দেখিতে পাইল, ব্রতীদা আঙিনা পার হইয়া চলিয়া গিয়াছে প্রায়।

ব্যাঙগুলি বিলের মধ্যে লুকাইয়া মহোল্লাসে ঘর্ঘর-চীৎকার সুরু করিয়া দিয়াছে। বিভা অন্যমনে কতক্ষণ শুনিয়া শুনিয়া অকারণে বিরক্ত হইয়া ভাবিল, "ধ্যেৎ !—সময় অসময় নেই, রাতদিন ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর !"

৬

স্কুলের কাজ শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিতে নিত্যই শিবানীর দেরী হইয়া যায়, আজ আরও বেশী। ছোটখাট সমস্ত প্রাত্যহিক অভাব, অভিযোগ, প্রয়োজন, শৃঙ্খলার ব্যাপার নিজে বুঝিয়া ও কেরাণীকে বুঝাইয়া দিয়া তবে তাহার খালাস। অধস্তন শিক্ষয়িত্রী অথবা কর্ম্মচারীদের উপর ভার দিয়া নিজের কর্ত্তব্যভার হাল্‌কা করিবার প্রচেষ্টা তাহার কোনদিন নাই।

বাড়ী ফিরিয়া শিবানী হাতমুখ ধুইয়া চুল বাঁধিয়া খবরের কাগজখানা হাতে লইয়া বারান্দায় একটা চেয়ার টানিয়া বসিল। সকালবেলা কাজের ভীড়ে দেখিতে দেখিতে সময় ফুরাইয়া যায়, কাগজ পড়া হইয়া উঠে না।

ঝি আসিয়া ছোট্ট বেতের টেবিলটাতে এক গ্লাস সরবৎ আর খাবারের রেকাবী সামনে রাখিয়া গেল।

সন্ধ্যা হয় হয়। রাস্তার ওপাশে উঁচু বাড়ীটার মাথায় সূর্য্যের একটুখানি আলো আট্‌কাইয়া রহিয়াছে। কতক্ষণ পরে কাগজখানা মুড়িয়া রাখিয়া শিবানী একবার আকাশের দিকে চাহিয়া খাবারের থালায় হাত দিল।

সুখেন্দু অনেকক্ষণ হয় বেড়াইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ হন্তদন্তভাবে ছুটিয়া উপরে আসিয়া উপস্থিত। ঝড়ের বেগে বলিয়া উঠিল, "দিদি! টেলিগ্রাম এসেছে!"

শিবানী মুখ তুলিয়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের ?"

"যতীন দাস মারা গেছেন !!"

"চমকিয়া শিবানী বলিল, "মারা গেছেন !!"

সুখেন্দু এক নিঃশ্বাসে বলিয়া চলিল, "হ্যাঁ, আমি নিজের চোখে টেলিগ্রাম দেখে এসেছি। পার্কে বসে গল্প করছিলাম, একটা ছেলে দৌড়ে এসে খবর দিলে, কংগ্রেস আফিসে তার এসেছে। দল বেঁধে সবাই ছুটে গিয়ে দেখি সত্যি। পত্রিকার আফিস-গুলোতে খোঁজ নিয়েছি, এসোসিয়েটেড প্রেস, ফ্রি প্রেস, সব জায়গা থেকে খবর এসে গেছে !—"

শিবানী সহসা কোনও কথা বলিল না। তাহার ভ্রূ দুইটি কুঞ্চিত হইয়া আসিল।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ভগৎসিং প্রমুখ বিদ্রোহীদের সঙ্গে সহাভিযুক্ত অন্যতম বাঙালী যুবক যতীন দাস দুই মাস যাবৎ অনশনব্রত আরম্ভ করিয়াছেন, এ সংবাদ দেশের জনসাধারণের মনে কিছুদিন হইতেই বেশ একটা উদ্বেগের সঞ্চার করিতেছিল। খবরের কাগজে ইদানীং প্রায়ই তাহার সংবাদ বাহির হয়। আজও এইমাত্র শিবানী পড়িয়াছে, অবস্থা বড়ই সঙ্কটজনক। সুতরাং মৃত্যু সংবাদে আশ্চর্য্য হইবার খুব বেশী কিছু নাই। শিবানী আশ্চর্য্য হইলও না।

সুখেন্দু ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া বলিল, "কি হবে, দিদি !"

নিরুদ্বেগের সুরে শিবানী উত্তর দিল, "কি আর হবে ?"

"ঈস্! উঁহুঁ, এ হবে না, হতে পারে না !" সুখেন্দু নিজের মনেই মাথা নাড়িল।

"হয়ে যে গেছেই !"

সুখেন্দু গরগর করিতে করিতে আবার কংগ্রেস-আফি অভিমুখে ছুটিল।

শিবানী উঠিয়া রেলিংএ হাত দিয়া দাঁড়াইল। রাস্তায় মানুষের স্রোত চলে, মোটর গাড়ীগুলি ডাইনে বাঁয়ে অবিরাম ছুটিতেছে, ট্রাম গাড়ীর সংঘর্ষে তারে তারে বিদ্যুৎ জ্বলিয়া উঠে। তিলেকের তরেও মানুষের কাজের বিরাম নাই। লক্ষ কোটি জীবনোৎসবের মধ্যে কোথায় কবে এক আধটি দীপ নিবিয়া যায়, উৎসববাসরের জ্যোতি তাহাতে ম্লান হয় না। অর্থহীন চোখে চাহিয়া শিবানী অনেক কথাই ভাবিল।

কিন্তু বেশীক্ষণ বিরামের বা আরামের সময় তাহার নাই। সে রেলিংএর কাছ হইতে ফিরিয়া ঘরে ঢুকিল। দেয়ালের কাছে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলিয়া লইয়া স্কুলের আফিসে ফোন করিয়া দিল, কাল বিদ্যালয় বন্ধ থাকিবে।

পরদিন ষোলই সেপ্টেম্বর। সকাল সাতটায় হাওড়া ষ্টেশনে শবদেহ আসিয়া পৌঁছিবে। তারপর নগরব্যাপী প্রকাণ্ড শোভা যাত্রা হইবার আয়োজন হইয়াছে। সুখেন্দু ভোর না হইতেই খদ্দরের পাঞ্জাবীটি গায়ে দিয়া খালি পায়ে হাওড়া-অভিমুখে ছুটিল।

কলিকাতার স্কুল কলেজ আজ সমস্তই প্রায় বন্ধ; কেহ ছুটি দিয়াছে শোকে ও সহানুভূতিতে, কেহ কেহ শোভাযাত্রা দেখিবার কৌতূহলে। সম্পূর্ণ ছুটি যাহারা দেয় নাই, তাহারাও বাধ্য হইয়া কতক্ষণ কাজকর্ম্ম বন্ধ রাখিয়াছে, কারণ, যে সকল পথ দিয়া

মিছিলেব গতি, তাহাতে যানবাহনাদির চলাচল একেবারে নিরুদ্ধ। পথপুলিশেরা সতর্ক পাহারা দিতেছে।

শোভাযাত্রা বড়বাজার পার হইয়া কলেজষ্ট্রীট্ ও ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের মধ্য দিয়া চলিবে, এইরূপ প্রোগ্রাম। শিবানী বারান্দাব রেলিংয়ের কাছে আসিয়া বসিল। ফুটপাথে ও রাস্তায় লোক আজ ধরে না; পথের দুই ধারের দোতালা ও তেতালা বাড়ীগুলির বারান্দায়, ছাদে, গাড়ীবারান্দার ওপর কোথাও তিলধারণের স্থানমাত্র নাই; প্রত্যেকটি জানালার ফাঁকে ফাঁকে পর্য্যন্ত ঠেলাঠেলি করিয়া অসংখ্য মানুষের মাথা। শিবানী নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়া দেখে।

বেলা বাড়িয়াই যায়। ভাদ্রের গা-পোড়ানো রৌদ্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অসম্ভব ভীড়ে ঠেলাঠেলি করিয়া প্রতীক্ষমান লোকগুলির সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া উঠিয়াছে। হঠাৎ জনস্রোত যেন দ্বিগুণ উথলিয়া উঠিল, অগণিত উৎসুক নেত্র প্রবল আগ্রহে উত্তর দিকে ফিরিয়া তাকাইল। কিছুই দেখা যায় না, শুধু লোকের সংঘট্ট, আর একটি দুইটি জলের গাড়ী জনতা ভেদ করিয়া ধীরবেগে তৃষার্ত্ত লোকগুলিকে জল বিলাইতেছে।

শিবানী উৎকর্ণ হইয়া উঠিল, দূরে শোনা যায় যেন সমুদ্রের কলরোলের মত অস্পষ্ট হুঙ্কার।

লক্ষ মানুষের আবেগময় চীৎকার উঠিল, "বন্দে মাতরম্!" লাল নিশান আর জাতীয় পতাকাগুলি পত্ পত্ করিয়া বাতাসে ওড়ে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাঁশ ঘাড়ে করিয়া যুবকেরা বহিয়া আনে

শাদা খদ্দরের উপর প্রকাণ্ড লাল হরফের লিপি "যতীন দাসকি জয়," শিবানী নিষ্পলক চোখে চাহিয়া রহিল। মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনি উঠে, মুহুর্মুহুঃ চীৎকার! কি যে বলে সকল কথা বোঝা যায় না, পরস্পর জড়িত হইয়া কেবল একটা আকাশবিদারী ধ্বনিই উঠে। মাঝে মাঝে এক আধটা লাইন কাণে আসে।

হঠাৎ চারিদিক্ মুখরিত করিয়া নারীকণ্ঠের হুলুধ্বনি। এদিক ওদিক্ কোণ কানাচ্ হইতে ফুলের পাঁপড়ি, ফুলের মালা ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল নীচে রাস্তার মানুষগুলির মাথার উপর। শব আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কালো কাঠের বাক্স আগাগোড়া পুঞ্জীভূত ফুলের তোড়ায় ঢাকা পড়িয়া ক্রমশঃ উঁচু হইয়া উঠিয়াছে, পথে পথে কেবলই জমা হইতেছে আরও ফুল, আরও ফুল!

উন্মত্ত জনসঙ্ঘের হৃদয় আজ দুর্ব্বার ক্ষিপ্ত। উত্তরে, দক্ষিণে যতদূর দৃষ্টি যায়, শিবানী চাহিয়া দেখিল—জনতার শেষ নাই। দেশে মানুষ তবে আছে! এখনও মরে নাই সব!

ধীরে—অতি ধীরে—শববাহীরা চলিতে থাকে। পা বাড়াইবাব পথ পায় না। পিছন হইতে একটা জনস্রোতের ধাক্কা আসিয়া সমস্ত ছত্রভঙ্গ করিয়া দিল; তাল সামলাইতে না পারিয়া এ উহার গায়ে পড়িয়া একেবারে পিষিয়া মারিবার ও মরিবার যোগাড়! একটা ছেলে সামনে পিছনে মানুষের চাপে মাটি হইতে ছিট্‌কাইয়া শূন্যে ঝুলিয়া রহিল; সারি বাঁধিয়া যে মেয়ের দল আসিতেছিল, তাহার মধ্যে একটি হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। ছুটিয়া আসিল অ্যাম্বুল্যান্স কার!

উত্তাল জনসমুদ্রই বটে !

প্রায় আধ ঘণ্টা ব্যাপিয়া শোভাযাত্রীরা ঐ দুই শত গজ রাস্তা পার হইল। জনতা পাৎলা হইয়া আসিয়াছে, গর্জ্জন অস্পষ্টতর। দূব হইতে দক্ষিণের বাতাসেব সঙ্গে রেশ ভাসিয়া আসিতেছে,— সেই জয়ধ্বনি আর কোলাহলের।

শিবানী আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে ফিরিয়া আসিল।

সমস্তটা দিন সুখেন্দুর আর দেখা নাই। বিকাল চারিটার সময় অবশেষে উস্কোখুস্কোমূর্ত্তিতে আসিয়া হাজির !

কল্যাণী হঠাৎ হাসিয়া অস্থিব !—"দাদা, দাদা, পিছন দিকে —হি-হি-হি—পিছন দিকে আয়না ধরা যায় না ? হিহি—হিহি !"

সুখেন্দু তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল, "বোকার মত হাস্‌ছিস্ কেন ?"

কল্যাণী একেবারে তাহাব পিঠের কাছে গিয়া পাঞ্জাবীর তলাটা ধরিয়া দিল টান, কাঁধের কাছটা ফর ফব কবিয়া নামিয়া আসিল।

সুখেন্দু থালি পিঠটার উপরে হাত বুলাইয়া বলিল, "এঃ ! ছিঁড়ে গেছে নাকি ? ওঃ—হো ! যা ভীড় !—তা যাক্ গে।" পট্ কবিয়া জামাটা খুলিয়া চেয়ারেব কাঁধে ফেলিয়া রাখিল।

ঘর হইতে বাহির হইয়া হেমপ্রভা ব্যস্তসমস্তভাবে বলিলেন, "কিরে ? সারাদিনে খাওয়া-দাওয়া নেই নাকি আজ ? তুই হচ্ছিস্ কি দিন দিন ? যা চট্ ক'রে নেয়ে থাবি আয় !"

সুখেন্দু বলিল, "আমি থাব না।"

"কেন, কি হল আবার ?"

সুখেন্দু মুরুব্বিয়ানা চালে বলিল, "তুমি দেখচি দুনিয়ার কোনও খবরই রাখ না, মা! কত বড় প্রসেশন বেরিয়েছে আজ জানো?"

"জানি রে জানি। যতীনদাস মারা গেছে, তুইও সঙ্গে সঙ্গে না খেয়ে মরবি নাকি?"

"তুমি কথা বোলো না তো!"

হেমপ্রভা ভয় দেখাইয়া বলিলেন, সবতাতে গোয়ার্ত্তুমি করিস্‌নে, সুখু। উনি শুনলে রাগ কববেন কিন্তু!

সুখেন্দু মুখের উপর বলিয়া দিল, "তা করুন গে।"

সন্ধ্যাবেলা আবাব বাহির হইতে হইবে। জামা পরিতে পরিতে সুখেন্দু দিদির ঘরে আসিয়া ঢুকিয়াছে, এমন সময় রমেশবাবু তলব পাঠাইলেন। সুখেন্দু শিবানীব দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "সেরেছে এবার!"

রমেশবাবু চেয়াবে বসিয়া একখানি ইংরাজী উপন্যাস পড়িতেছিলেন। সুখেন্দু ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "ডেকেছ, বাবা?"

চশমাটা নাকের উপরে একটু নামাইয়া মাথা না তুলিয়াই চক্ষু তুলিয়া রমেশবাবু গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "আজ সারাদিন বাড়ীতে দেখতে পাইনি কেন?"

"বাড়ী ছিলাম না।"

"কোথায় যাওয়া হয়েছিল, শুনি?"

"processionএ।"

"processionএ! কলেজ ফাঁকি দিয়ে প্রোসেশানে যাওয়া হয়েছিল!—"

সুখেন্দু বলিল, "কলেজ আজ ছুটি।"

রমেশবাবু একটু থামিয়া বলিলেন, "হুঁ! বড্ড বাড়াবাড়ি সুরু হয়েছে আজকাল!—কাল রাত দশটা অবধি কোথায় ছিলে?"

সুখেন্দু প্রথমটা চুপ করিয়া রহিল।

রমেশবাবু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কথা নেই যে?"

চট্ করিয়া একটা মিথ্যা জবাব দিয়া দায় সারিবার কল্পনা তাহার মাথায় আসিল, কিন্তু আত্মগর্ব্বে খানিকটা ঘা লাগাতে পারিয়া উঠিল না। সুতরাং মাথা নীচু করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "কংগ্রেস আফিসে।"

রমেশবাবু একেবারে আঁৎকাইয়া উঠিলেন; প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়া বলিলেন, "কংগ্রেস আফিসে!!!"

সুখেন্দু আব সাড়াশব্দ দিল না।

"ইয়ার্কি পেয়েছ নাকি? কংগ্রেস অফিসে!"

অত্যন্ত সাহসে ভর করিয়া সুখেন্দু বলিল, "কেন, দোষ কি?"

রমেশবাবু ভ্রূকুটিসহকারে তর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "ফের মুখে মুখে কথা!"

সুখেন্দু পালাইতে পারিলে এখন বাঁচে; কোনও গতিকে উপায় খুঁজিতে লাগিল।

রমেশবাবু বলিলেন, "খবরদার! আর কখনও যেন এমন কথা না শুন্তে পাই। বড্ড বেয়াড়া হয়ে উঠেছ!—বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেব তাহলে। বুঝলে?—যাও।"

সুখেন্দু দরজার এপিঠে আসিয়াই নির্ব্বিবাদে আবার রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

৭

বাপ-মা-হারা ব্রতীন্দ্র সংসারে একেবারে নিরালম্ব। সুতরাং সে থাকে মেসে। বসতির স্থিরতা কিছুই নাই, আজ এখানে, কাল সেখানে। দেশে গাঁয়ে কত বৎসর যে পদার্পণ করে নাই, গণিতে গেলে স্মৃতি যেন ঝাপ্‌সা হইয়া আসে। নিকট আত্মীয় বলিতে বড় কেহ তাহার নাই। থাকিবার মধ্যে ছিল দুই বোন, দুইটিরই বিবাহ হইয়া গিয়াছে, আছে সুখে। সুতরাং তাহারও ভাবনা ঘুচিয়াছে। ঘরের টান এখন আর কাহার জন্য? কিন্তু মানুষের বিচিত্র মন! টানের হাত হইতে একেবারে আল্‌গা থাকিতে সে যেন পারে না। ঘর যেমনি রাশ শিথিল করিয়া দিল, অমনি বাহির টানিল। অথবা বাহির টানিয়াছে বলিয়াই কি ঘরের বন্ধন ছিঁড়িয়া গিয়াছে, কি প্রচণ্ড আকর্ষণ—বিপুল আহ্বান! সাড়া না দিয়া পারে এমন ক্ষুদ্র মন কয়জনের? অথচ—ব্রতীন্দ্র ভাবে—অথচ সাড়া তো কই সবাই দেয় না?

একা মানুষ, কিন্তু সে উপার্জ্জন করে যথেষ্ট। আফিসের সহকর্ম্মীরা পরোক্ষে বলে, এত টাকা দিয়া লোকটা করে কি? সৌখীনতায়ও একটা পয়সা খরচ করিতে তো দেখা যায় না। বেজায় কঞ্জুষ! প্রত্যক্ষে ঠাট্টা করে, "চিরকালটা কেবল কি ব্যাঙ্কেই টাকা মজুত করবেন ঠাউরেছেন? বিয়ে-টিয়ে করুন তাড়াতাড়ি, আমরা একটাবেলা নেমন্তন্ন অন্ততঃ পাই!"

মেসের ছোট ঘরখানায় ক্যাম্প-খাটিয়ার পায়ের কাছে দুইটা বড় বড় স্যুট্‌কেস্‌। সাময়িকভাবে সেই দুইটিকেই উচ্চাসনে পরিণত করিয়া ব্রতীন্দ্র পাশের জানালার কাঠে কনুই ঠেকাইয়া বসিয়া আছে। জানালাটা মস্ত, বিকালেব অস্তায়মান রবির রশ্মি তাহার শিকের ফাঁক দিয়া মেঝের উপবে আগুনের প্লাবন আনিয়াছে। চারিপাশের মেঘের আস্তরণেব মাঝখানটা কেমন কবিয়া ছিঁড়িয়া গিয়া সূর্য্যের রক্ত-আঁখি তীব্রচ্ছটায় সেই ছিদ্রপথে চাহিয়া আছে ' ব্রতীন্দ্রের চোখেব অনিমিষ দৃষ্টি তাহারই চোখের মধ্যে আট্‌কাইয়া গিয়াছে। জাহাজের সার্চ্চলাইটেব দ্যুতি যেমন করিয়া এক সরল-রেখায় ছুটিয়া বাহিব হইয়া আসিয়া চক্ষু ধাঁধাঁইয়া দেয় ঠিক তেমনই। কালো মেঘগুলি আলোর উৎপীড়নে আরো কালো হইয়া উঠিয়াছে—একটা অস্বাভাবিক ছবি!

পিছনে দরজার চৌকাঠে পা দিয়া ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে একজন ডাকিল, "ব্রতী!"

তীরেব ফলার মত রশ্মিরাশি চোখে আসিযা বিঁধিতেছিল; আপনার অগোচরে বাম হাতখানা কপালে ঠেকাইয়া এক্‌টু আড়াল করিয়া ব্রতী আবার চাহিয়া রহিল।

সামনের চেয়ার টানিয়া বসিয়া সে বলিল, "ব্রতী!"

ব্রতীন্দ্র মুখ ফিরাইল। গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তাবপর? কতদূব?"

"তারপর—সব ঠিক করে এসেছি। এক সপ্তাহের মধ্যে রওনা হতে হবে।"

"এত শীগ্‌গির !"

"হ্যাঁ, বেশী দেবী করে লাভ কি ? আমি কথা দিয়ে এসেছি।"

ব্রতীন্দ্র বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "চট্ করে কথা দিয়ে এলে ? তার মানে ?"

ব্রতীর মুখের দিকে তাকাইয়া সে একটু থামিয়া বলিল, "মানে —তিনি অনেকখানিই সাহায্য কর্ত্তে রাজি হয়েছেন, সঙ্গে গাইড দিতেও প্রস্তুত। আমি বলেছি, তাহলে আমরা তৈরী, এক সপ্তাহের মধ্যে যাত্রা কর্ত্তে চাই।"

"আমবা তো তৈরী নই !"

"তৈরী নই কি রকম ?"

ব্রতীন্দ্র ভৎর্সনা করিয়া তাহাব মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি বড্ড ব্যস্তবাগীশ, সুপ্রসন্ন !"

সুপ্রসন্ন বলিল, "ঢিমেতেতালায় চল্লে কাজ এগোয না। তোমাব ঐ একটা মস্ত দোষ ব্রতী।"

ব্রতীন্দ্র হাস্‌লি, "তা বেশ। কিন্তু তাঁকে কথা ফিবিযে এসো।"

"সে কি !"

"তাঁকে বলবে যে, তাঁব প্রতিশ্রুতি পেয়ে আমবা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এক মাসের মধ্যে আমরা আমাদের মন্তব্য তাঁদের সঠিক জানাব।"

"এ—ক মা—স ! এত দেবী ? তুমি বড্ড ভুল কবছ, ব্রতী।"

"ভুল তুমি করেছ। সেটা ফিবিয়ে আন এখন।"

"আমি পারব না।"

"পার্ত্তে হবে।"

সুপ্রসন্ন খানিকক্ষণ গুম্ হইয়া থাকিয়া বলিল, "আচ্ছা।"

ব্রতীন্দ্র পায়ের উপর পা তুলিয়া দেয়ালে ঠেস দিয়া বলিল, "তুমি যদি আর একটু চিন্তাশীল হতে, সুপ্রসন্ন! তোমার যেন ভাববার ফুরসংই নেই! সেইজন্তেই তোমার ওপরে দায়িত্ব দিতে আমার ভরসা হয় না সব সময়।"

সুপ্রসন্ন বলিল, "যারা এক পা' বাড়াবার আগে তিনবার পেছন ফেরে, তুমিও তাদের দলে নাকি, ব্রতী?"

"বল্‌তে হয় বল।"

"তাহলে তাদের দলেই ভিড়ে গেলে না কেন? পাছে পায়ে হুঁচট্ লাগে সেই ভয়ে যারা চলে না; পাছে দম্‌কা ঝড়ের হাওয়া কোনও কুক্ষণে ঘরে এসে ঢোকে সেই ভয়ে যারা চিরকাল দোর জানলা বন্ধ কবে রাখে; দাবানল জ্বল্‌বার ভয়ে যারা অন্ধকারেও প্রদীপটি জ্বালায় না; তারাই তো তুনিয়ায় বেশীর ভাগ, তারাই তো সম্ভ্রান্ত! যাও না, তাদের মতই পরম গৌরবে বিজ্ঞমত্তার বুলি আওড়াও না গে'? দেশের মুখ আরও উজ্জ্বল হবে।"

ব্রতীন্দ্র বুঝিতে পারিল, সুপ্রসন্ন ক্ষুব্ধ হইয়াছে। এক একটি মানুষ থাকে, যাহাদের উচ্ছ্বসিত প্রাণশক্তি মনকে ডুবাইয়া ফেলে, কূলকে আচ্ছন্ন করিয়া আসল পথ এলোমেলো করিয়া দেয়। সুপ্রসন্ন ঠিক তেমনটি না হইয়া প্লাবনের বেগকে মন্দতর করিয়া আনিতে পারিত যদি, হইত ভালো। ব্রতী মনে মনে ইহাই ভাবে।

বলিল, "দেখ, বুদ্ধি পদার্থটি সর্ব্বদাই কাজে লাগে, ওকে অবহেলা করলে বিষম ভুল হবে। তবে বুদ্ধিমত্তার নামে যে সব মূঢ় বিজ্ঞজন নিজেকে ও পরকে, দেশকে ও দশকে পঙ্গু করে রাখবার সুযোগ খোঁজে, তাদের দলে আমি নই এ তুমি জানো।"

"কিন্তু কথা হচ্ছে কি, বুঝলে ? যে আগুন এখন জ্বল্‌ছে, হাওয়া না পেলে সে নিব্‌তে কতক্ষণ ? বেশীদিন নিষ্কর্ম্মা করে বসিয়ে রাখা ভালো নয়, প্রেরণার অভাবে ওরা এলিয়ে পড়্‌তে পারে।"

একটু হাসিয়া ব্রতী জিজ্ঞাসা করিল, "ওরা পড়তে পারে ?- তুমি পড়বে না তো ?"

সুপ্রসন্ন গম্ভীর হইয়া ব্রতীন্দ্রের মুখের দিকে তাকাইল, "ব্রতী !"

দুই চারি মুহূর্ত্ত সুপ্রসন্নের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ব্রতীর চোখের দৃষ্টি নিজের মধ্যে ফিরিয়া আসিল। অনেকটা আপন-মনেই বলিল, "বাইরের প্রেরণা দু'দণ্ড স্থগিত থাকলেই যাদের প্রাণ মরে, তাদের তুমি বাঁচিয়ে রাখ্‌বে কি দিয়ে ? ক'দিন ? প্রেরণার উৎস উঠবে নিজের বুকের মধ্য থেকে। বাইরে থেকে গরম সেক দিয়ে শরীর যদি উত্তপ্ত রাখ্‌তে হয়, সে তো মরাব লক্ষণ। এমন চিকিৎসার দরকার, যাতে ভেতরের সহজ সুস্থ রক্তের তাপে সে আপনি তাজা হয়ে ওঠে। এ না কর্ত্তে পারলে আমাদের অনর্থক অনেকখানিই পণ্ডশ্রম হবে, সুপ্রসন্ন। এমন মানুষ তৈরী কর্ত্তে হবে, যে আপনার বেগে আপনি পথ সৃষ্টি করে নেয়; মনের জঞ্জাল এমন করে ঝেঁটিয়ে ফেলা চাই, যাতে অন্তর্য্যামীর মুখখানি অভয়-হাস্যে মনের মধ্যে হেসে ওঠে। বাইরের প্রেরণা বা তাগিদের

মুখাপেক্ষা করবার মত স্বভাব যেন না হয় আমাদের। বাইরের হাততালি বা জয়ধ্বনির লোভও আমাদের উৎসাহ যোগাবে না কোনদিন। সমস্ত জগৎ অকর্ম্মণ্যতায় পঙ্গু হয়ে থাকে থাক, ভয়ে পেছিয়ে পড়ে পড়ুক, নিরাশার মন্ত্রে, ধিক্কারে, ফুৎকারে পথ আচ্ছন্ন হয় হোক্, তবু একলা যাব। এই প্রতিজ্ঞা মনে রেখো।"

সুপ্রসন্নের মুখশ্রী আনন্দে হাসিয়া উঠিল। ব্রতীর ফর্সা কপালের উপর সূর্য্যাস্তের ছটা আসিয়া যে আভা মাখাইয়া দিয়াছে, অন্তর্নিবদ্ধ চোখের তারায় যে জ্যোতি জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া সে ভাবিল, এইজন্যই ব্রতীকে তাহার এত ভালো লাগে।

ব্রতীন্দ্র বলিল, "এমন ছেলে তোমার ক'টি আছে, সুপ্রসন্ন ?"

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সুপ্রসন্ন উত্তর দিল, "হয়তো বেশী নেই।"

"তবে ?"

"তবে কি ?"

"তুমি নির্ব্বিবাদে কথা দিয়ে এলে, আমরা তৈরী ?"

"বাঃ, তার সঙ্গে এর কি ? সে বলেছি—"

দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া লোকেন ডাকিল, "ব্রতী-দা !"

"এসো।"

কাছে আসিয়া চুপি চুপি লোকেন বলিল, "ওরা কথা বল্‌তে রাজি আছে।"

"কবে ?"

"সময় আপনি ঠিক করবেন।"

ব্রতীন্দ্র ক্ষণকাল ভাবিয়া বলিল, "কাল সাড়ে সাতটায়। সুপ্রসন্ন ?"

সুপ্রসন্ন বলিল, "আচ্ছা।"

লোকেন চলিয়া গেল।

৮

পাঁচটা বাজে। শিবানী উঠিয়া পড়িল ;—ওয়াই, ডব্লিউ, সি, এ,-র দালানে মহিলা সমিতির সাধারণ বৈঠক আজ সাড়ে পাঁচটায়।

হাতমুখ ধুইয়া মুছিয়া সে ঘরে ঢুকিল। তাড়াতাড়ি খোঁপা বাঁধিয়া কালো ব্লাউজের বুকের উপর শাদা গরদের কালো পাড়টা ঠিক করিতে করিতে ব্যাগ্‌টি হাতে লইয়া বারান্দায় পা বাড়াইতেই টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

শিবানী ফিরিল।—"হ্যালো।—"

—"হ্যাঁ। কে ?

—"শঙ্করবাবু ? ও।

—"আচ্ছা।

—"তাই নাকি ? বেশ।

—"কখন্ ?

—"আচ্ছা।

—"আচ্ছা।"

রিসিভারটা নামাইয়া রাখিয়া ব্যস্তভাবে শিবানী হাত ঘড়িটার দিকে তাকাইয়া নীচে নামিয়া গেল।

কর্পোরেশন ষ্ট্রীটের উপরে দোতালা একটি বাড়ীর সামনে গাড়ী আসিয়া থামিল। বিচিত্রবসনা অনেক মহিলার শাড়ীর আঁচল এখানে সেখানে, সিঁড়িতে, দরজার মুখে দেখা যায়। সিঁড়ির পথেই কাহার সঙ্গে দেখা হইয়া পড়িল, সহাস্যে পরস্পর শিষ্ট সম্ভাষণ করিয়া দুইজনে একত্র উপরে উঠিয়া গেল।

হলের মধ্যে প্রবলভাবে মাথার উপরে পাখা ঘুরিতেছে; সারি সারি শ্রেণীবদ্ধ চেয়ার; মৃদুমধুর গন্ধে আবহাওয়া ভরপূর। দুই জনে ঘরে ঢুকিতেই মিসেস্ গর্ডনের সঙ্গে সাক্ষাৎ। গর্ডন বলিলেন, "Good evening, Miss. Gupta—Miss. Seyne!"

প্রতিনমস্কার জানাইয়া শিবানীরা চলিয়া আসিল।

মিস্ সরকার ফ্রফুরে হাওয়া শাড়ীর আঁচল দুলাইয়া বলিলেন, "এসেছেন? বসুন, বসুন। গত দুটো sittingএ আপনাকে দেখিনি তো?"

"বড্ড ব্যস্ত ছিলাম, আস্তে পারিনি" বলিয়া শিবানী বসিয়া পড়িল।

"আপনার আজকে একটা paper পড়বার কথা, না?"

শিবানী মাথা নাড়িল।

কাজ আরম্ভ হইতে দেরী আছে। ততক্ষণ উদ্যোক্তা মহিলাদের বারম্বার ঘর হইতে বাহিরে ও বাহির হইতে ঘরে চলাচলটি দেখিতে

চিত্তাকর্ষক। শিবানী প্রতিবারই এই সময়টুকু ইহা দেখিয়াই উপভোগ করে। ঘর ভরিয়া রঙের কি ছড়াছড়ি! রামধনুর শোভা হার মানে। কাহারও কাঁধ-অবধি-আস্তিন-ছাঁটা ব্লাউজের লাল টুকটুকে অবশেষটুকু স্থূল দেহখানিকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না। খয়েরী রঙের জামার উপরে নীল শাড়ী জড়াইয়া কোনও ক্ষীণাঙ্গিনী মাছরাঙ্গা পাখীর মত এদিক্ ওদিক্ ফরুৎ ফুরুৎ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কাহারও বা পাৎলা সোণালী রঙের স্বচ্ছ ব্লাউজ ভেদ করিয়া পিঠের ঘোরকৃষ্ণ বর্ণাভা বিসদৃশভাবে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। ওপাশে গোল হইয়া জটলা বাঁধিয়া যাহারা দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে, তাহাদের মধ্যস্থিত পার্শী তরুণীটির ঠোঁটের ও গালের মাখানো লাল রংটা এত বেশী পরিস্ফুট দেখা যায় যে শিবানী নিজেই লজ্জিত হইয়া উঠিল।

মিস্ ব্রাউন্ টেবিলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, সঙ্গে মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি।

সভার কাজ আরম্ভ হইয়া গেল। কেউ শোনে, কেউ শোনে না, পিছনে বসিয়া কেহ কেহ ফিস্ ফিস্ করিয়া গল্প করিতেছে। যাহাদের পড়িবার পালা ছিল পড়িল, দু'কথা যাহার বলিবার আছে বলিল; শিবানী তাহার লিখিত প্রবন্ধ পড়িয়া আসিয়া আবার বসিয়া পড়িল মিস্ সরকারের পাশে। মিসেস্ সেন তাহার কাণের কাছে মুখ আনিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "মিস্ দীক্ষিতা বিড়্ বিড়্ করে কি যে বলে গেলেন, বোঝাই গেল না ছাই। আপনারটা চমৎকার হয়েছে কিন্তু।"

শিবানী হাসিল। এমন প্রশংসা শুনিতে সে অভ্যস্ত এবং ইহার কতটা সত্য, কতটা স্তুতিবাদ তাহাও মনে মনে আন্দাজ করিয়া লয়।

শেষের দিকটায় যখন চিরপুরাতন বিবিধপ্রসঙ্গ ও টাকাকড়ি আসিয়া পড়িল, তখন নিত্যকার মতই অমনোযোগের গুঞ্জন ও কলরব। 'গুটিকয়েক কার্য্যনির্ব্বাহক সভ্য ব্যতীত আর সকলেই আপন আপন আলাপ আলোচনায় মাতিয়া গিয়াছে। ছোটখাট আকৃতির একটি তরুণী মহিলা পিছনদিক্ হইতে শিবানীর কাঁধে হাত দিয়া বলিল, "থাক্‌বেন নাকি আরো, না উঠবেন এখন ?"

"মিসেস্ আগরওয়ালা যে! বস্থন, বস্থন। এই উঠ্‌ছি আর কি!" শিবানী খুসী হইয়া তাহাকে পাশে টানিয়া বসাইল।

মিসেস্ আগরওয়ালা ওরফে কুন্তীদেবী এক বিশিষ্ট ব্যবসাদারের পত্নী। কি করিয়া শিবানীর সঙ্গে তাহার ভাব হইয়া গিয়াছে, তাহা সে-ও নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিবে না, কিন্তু আলাপের সূত্রপাত এইখানেই এক মিটিংএ বৎসরখানেক আগে।

কুন্তীদেবী বলিল, "বসে কি হবে আর ? চলুন, কথা আছে।"

"ও, আচ্ছা।" শিবানী উঠিয়া দাঁড়াইল। চলার তালে বুকের মণিহারের দোলকটি নড়িয়া ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিল।

আপাদমস্তক গাঢ় নীলে মোড়া একটি মহিলা সপ্রশংস চোখে চাহিয়া বলিলেন, "what a nice pendent you've got Miss Gupta—beautiful!" একটু ঝুঁকিয়া একবার হাতে লইয়া নাড়িয়া দেখিলেন।

কুন্তী ও শিবানী নীচে নামিতে নামিতে পরস্পর হাসিল।

সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া খানিকক্ষণ কথা বলিয়া শিবানী বিদায় লইল, "তাহলে আসি আজ। শনিবার যাবেন কিন্তু আমার বাড়ীতে।"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়!"

বাড়ী ফিরিয়া নীচের বসিবার ঘরে ঢুকিয়াই শিবানী দেখে, আবত্নল আজিজের সঙ্গে আর একটি কে ছেলে তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিয়া সে পকেট হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া দিল।

শিবানী চোখ বুলাইয়া বলিল, "এ আবার কোথায়?"

"এই তো হেদোর কাছে, বেশী দূরে নয়। যাবেন কিন্তু।"

"দেখা যাক।"

ছেলেটি সবিনয়ে দাবী করিল, "যেতেই হবে। দেখুন, অন্য সব জায়গাতেই আপনার নাম দেখতে পাই, আমাদের কোনও functionএ একবারও যাননি। এটা অবিচার!"

শিবানী হাসিয়া বলিল, "দেখি, চেষ্টা করব।"

"হ্যাঁ, কথা রইল কিন্তু। বড় বড় সাহিত্যিকেরা সবাই আস্‌বেন—ছেলেরা, মেয়েরা। আপনি না গেলে চলবে কেন?" ছেলেটি নমস্কার করিয়া বিদায় লইল।

এতক্ষণ ধরিয়া বসিয়া বসিয়া আজিজের পা তুইটা প্রায় ধরিয়া গিয়াছে। সে বলিয়া উঠিল, "বাপ রে বাপ! আপনি আজ কোথায় গিছলেন বাণীদি? সেই কখন্ থেকে তুজনে বসে আছি, আপনার আর দেখা নেই!"

শিবানী বলিল, "মহিলা সমিতির মিটিং ছিল কিনা একটা—"

আজিজ বলিয়া উঠিল, Y.W.C.A.তে বুঝি আবার ?"

"হুঁ।"

"আচ্ছা, ওখানে আপনি যান্ কেন বলুন তো ? আপনার সঙ্গে খাপ খায় ? একটা aristocratদের আড্ডা ! ঐ যে এক শ্রেণীর জীব আছে, ওদের দেখলেই আমার ঘেন্না হয় !"

শিবানী বলিল, "তা হোক্। এখন তোমার কাজটা কি বল, শুনি।"

"কাজ বিশেষ কিছুই নেই। দু' সপ্তাহ জ্বরে পড়ে ছিলাম, আস্তে পারিনি। তাই।"

"ও। জ্বর সেরে গেছে তো একেবারে ? ভাত খেয়েছ ?"

"হ্যাঁ, কাল খেয়েছি।"

শিবানী তাহার শুক্‌নো মুখখানার দিকে চাহিয়া বলিল, "তা অসুস্থশরীরে অনর্থক আজকে এলে কেন আবার ? যা বৃষ্টিবাদ্‌লা পড়ছে আজকাল ঠাণ্ডা লাগবে।"

আজিজ বলিল, "এই ছেলেটা টেনে নিয়ে এলো যে, ছাড়লে না।"

"চিঠিখানা রেখে গেলেই কিন্তু ও পারত। খামখা এতক্ষণ বসে রইলে তুমিও, ও-ও !"

আজিজ হাসিয়া বলিল, "আসল কথাটা কি, জানেন বাণীদি ? চিঠি দেওয়া তো একটা ছুতো শুধু। ও আসলে আপনার সঙ্গে একটু আলাপ কর্ত্তে চায়। অনেকদিন ধরে আমাকে খোসামোদ করছে।"

"কেন ?"

"কেন কে জানে ? আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম,—ও বলে, 'এমনিই তিনি বাংলা দেশের রত্ন' !"

শিবানী প্রথমটা হাসিল, তারপর হঠাৎ কিছু গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ তথ্য সে সংগ্রহ করলে কোত্থেকে ?"

আজিজ বলিল, "বাঃ, আপনিও যেমন ! আপনাকে আবার না জানে কে ?"

"কি হিসেবে ?"

"কেন, সব হিসেবেই ? আপনি তো খবর রাখেননা—যেখানেই যাই, সবাই যে আপনার কথা বলে আর জিজ্ঞেস করে !" আজিজের বুকখানা যে গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিতেছে, তাহার মুখের দীপ্তি ও হাসি দেখিয়া সে বিষয়ে শিবানীর কোনও সন্দেহ রহিলনা।

সে সশঙ্কনেত্রে চাহিয়া বলিল, "আর তোমরা বুঝি আড়ম্বরে বাড়িয়ে বাড়িয়ে বল ?"

আজিজ একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "না, না, তা নয় কক্ষনো !"

"সাবধান। কিন্তু আজিজ্, ছেলেমানুষী কোরোনা।"

৯

মারাঠা খালের জল সন্ধ্যারম্ভে ঘোলাটে হইয়া যেখানে একটু পশ্চিমে বাঁকিয়া গিয়াছে, সেইখানে সেই বাঁকের ধারে গাছের তলায় লোকেন যাহাকে পরিচয় করাইয়া দিয়া গেল, সে শঙ্করানন্দ গোস্বামী।

ব্রতীন্দ্র ও সুপ্রসন্ন ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিল। পাৎলা একহারা গড়ন, প্রায় ছয়ফুট লম্বা, সোজা তীরের মত। সন্ধ্যার অন্ধকারেও একনিমেষে ব্রতীর চোখে পড়িল, তাহার কালো মুখের মধ্যে কৃষ্ণতর চোখ দুইটির ধারালো দৃষ্টি।

প্রতি নমস্কারে হাতখানি কপালে মাত্র ঠেকাইয়া শঙ্করানন্দ ব্রতীন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, যাচিয়া কোনও কথা বলিলনা।

ব্রতীন্দ্র মনে মনে মাথা নাড়িল।

এক মিনিট চুপ করিয়া থাকিয়া ব্রতী বলিল, "আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু কিছু আপনি শুনেছেন, আশা করি?"

গোস্বামী সংক্ষেপে জবাব দিল, "হুঁ।"

"মোটামুটি আর একবার তাহলে বলে নিই, তার পরে আপনার কথা শুন্‌বার প্রতীক্ষায় রইলাম।

"বলুন।"

ব্রতী বলিল, "বহু বছর বাংলার বাহিরে বাহিরেই ছিলাম, এসেছি সম্প্রতি অল্পদিনই। কাজেই এখানকার অবস্থাটা সম্পূর্ণ করে বুঝবার পক্ষে এখনও হয়তো ভুলচুক কিছু আমার আছে। কিন্তু মোটের ওপর, দূর থেকে যে আশা নিয়ে এসেছিলাম, তার অনেকটাই ভেতরে এসে ফাঁকা বলে মনে হচ্ছে। পশ্চিমের ওরা বাংলার ছেলেদের সংহতির কার্য্যনীতি সম্বন্ধে খুব একটা বড় ধারণা করে বসে আছে। কিন্তু আমি দেখ্‌চি, এরা যেন বড্ড hopelessly disorganised—"

শঙ্করানন্দ একবার মুখ তুলিয়া তাহার দিকে তাকাইল।

ব্রতীন্দ্র লক্ষ্য করিল, কিন্তু বলিয়া চলিল, "অর্থাৎ এদের পাঁচ হাজার ছেলের মধ্যে পাঁচশোটি দল, উপদল এবং প্রতিদল। সংখ্যার গুরুত্ব পরস্পর অনৈক্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গেছে কমে। সংহত থাক্‌লে যারা একটা দুর্দ্ধর্ষ শক্তি হয়ে দাঁড়াতে পারত অনর্থক কলহে তারা পরস্পর শক্তিক্ষয় করছে। এতে কোনও কাজ হবে মনে করেন?"

শঙ্কর মাথা নাড়িয়া বলিল, "না।"

ব্রতী একমুহূর্ত্ত থামিল, তারপর বলিল, "সেইজন্যে আমরা চেষ্টা করছি বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন দলকে এক করে সংঘবদ্ধ করতে এবং তা যদি সম্ভব হয়, তবে তারপরে তাকে বিভিন্নপ্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করে ভারতব্যাপী এক অখণ্ড সঙ্ঘ গড়ে তুলতে হবে। আপনাদের কাছে আমার প্রস্তাব হচ্ছে এই যে, আপনারা এই আইডিয়াটাকে সমর্থন করলে এর গঠনপ্রণালী ও কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা যেতে পারে।"

শঙ্করানন্দ মাথা না তুলিয়াই চিন্তিতমুখে বলিল, "আইডিয়াটা খুবই ভালো।"

ব্রতীন্দ্র এবার আর কথা না বলিয়া বিশদ মন্তব্যের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

শঙ্কর মুখ তুলিয়া চাহিল, "কথাটা খুবই ভালো। আমরাও সেই চেষ্টাই করছি। কিন্তু এ উদ্যোগ সফল করার পক্ষে যে সব অন্তরায় সাধারণতঃ এসে পড়ে, সে সম্বন্ধে বেশ করে ভেবে দেখেচেন তো?" পুনশ্চ যোগ করিয়া আবার বলিল, "আপনাদের অর্গ্যানিজেশনের অস্তিত্ব ও অভিজ্ঞতা কত বছরের সে সম্বন্ধে আমার সবিশেষ জানা নেই, তাই বলছি!"

সুপ্রসন্ন বলিয়া উঠিল, "সে বিষয়ে আপনার চিন্তার কারণ নেই। বাংলাদেশের বর্ত্তমান যে কোনও অর্গ্যানিজেশনের চেয়ে আমরা খানিকটে অগ্রসর।"

গোস্বামী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে একবার তাকাইল, ঠোটের কোণে একটু হাসিয়া বলিল, "সে কথা হলফ্ করে বল্‌তে পারেননা।—থাক্ আমি তা বল্‌তে চাইনি। আমি জিজ্ঞেস করছি শুধু যে, এরকম মিলন সংঘটিত কর্ত্তে হলে যে compromising spiritএর দরকার, তাতে আপনারা অভ্যস্ত কিনা? অতীতে এ চেষ্টা আরও বহুবার হয়েছে, কিন্তু ঐ জিনিষটির অভাবেই সব ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়।

ব্রতী বলিল, "তা সম্পূর্ণ মানি। এবং এটা আমাদের একটা দারুণ লজ্জার বিষয়। মতবাদ ও ভাবধারার অমিল যেখানে নেই,

সেখানে এরকমভাবে শত শত দল উপদল গজিয়ে ওঠার কোনও মানেই হয়না—একমাত্র ব্যক্তিগত অহঙ্কার ও রেষারেষি ছাড়া। এতো মতদ্বৈধের ঝগড়া নয়, এ হচ্ছে নেতৃত্বের ঝগড়া। এতে করে প্রমাণ হয়, আমরা দেশের চেয়ে নিজেকে বড় কর্ত্তেই ব্যস্ত।"

"সে কথা ঠিকই।

"কিন্তু দেশের কাজ কর্ত্তে যদি সত্যিই চাই, তাহলে আপাততঃ নিজের প্রভুত্বস্পৃহা এবং পার্টির প্রভুত্বস্পৃহা দুটোকেই খাটো কর্ত্তে হবে। সর্ব্বপ্রথম এই মারাত্মক ক্ষুদ্রতার হাত দেখে নিজেদের মুক্ত করুন।"

ব্রতীন্দ্রের কথাগুলি শুনিতে শুনিতে শঙ্করানন্দ একটু বিস্মিত হইয়া ভাবিল, এ যে দেবীরই কথার প্রতিধ্বনি যেন! মাথা নাড়িয়া বলিল, "নিশ্চয়! আমরাও তাই বলি। এবং আন্তরিকভাবে এর জন্যে চেষ্টা করলে সফল না হবার কোনই কারণ নেই।"

"হাঁ।"

"কিন্তু মুস্কিল হয় এই যে, কাজ হাঁসিল করবার জন্যে অনেকেই আজকাল মুখে আন্তরিকতা ও একতার কথা বলে বটে, কিন্তু বাস্তবিক মনোভাবের পরিবর্ত্তন এসেছে কিনা বলা যায়না।

শঙ্করানন্দের পাৎলা ঠোঁটের ঈষৎ হাসির দিকে নজর রাখিয়া ব্রতীন্দ্র বলিল, "মানি। এ দ্বিধা ও অবিশ্বাস যে আপনাদের মনে আপাততঃ আস্‌তে পারে, সেজন্যে দোষ দিইনা। কিন্তু এবিষয়ে আমার বল্‌বার কথা হচ্ছে এই যে, নিজেদের আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততা মুখে প্রচার করাটা আমাদের রীতি নয়; তার পরিচয় হয় শুধু

একান্তভাবে কাজের মধ্যে দিয়েই। সে পরিচয় চান্ যদি তো পাবেন।"

কিছুক্ষণ স্থিরভাবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া শঙ্করানন্দ সোজা তাকাইয়া বলিল, "হুঁ। তাহলে আমাদের কথা শুনুন, বলি। ঠিক আপনাদের মত এই আইডিয়া নিয়েই আমরা কিছুকাল হল বাংলার কর্ম্মীদের একতাবদ্ধ করবার কাজে ব্যাপৃত আছি এবং অসংখ্য বাধাবিপত্তিসত্ত্বেও যতটা সাফল্য এই অল্পকালের মধ্যে আমরা পেয়েছি, তাতে আশার সঙ্গে এটুকু আপনাকে জানাতে পারি যে, বাংলার প্রধান প্রধান ছিন্নভিন্ন দলগুলোকে এক কেন্দ্রিয় সমিতির অধীনে সংঘবদ্ধ করা আর খুব কষ্টকর হবে না।"

সুপ্রসন্ন ঠোঁটের একটা পাশ একটু চাপিয়া ধরিয়া নীরবে শঙ্করানন্দের আপাদমস্তক একবার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লইল।

ব্রতী বলিল, "সুখের কথা।"

"এবং আপনাদেব সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন কর্ত্তে পারলে আমরা সৌভাগ্যই মনে করব।"

"ধন্যবাদ।"

"অবশ্য যদি মতবাদের অনৈক্য কিছু না থাকে—"

ব্রতী বলিল, "সে তো গোড়ার কথাই। সেই আলোচনাই এখন তাহলে হোক্?"

শঙ্করানন্দ মাথা নাড়িল, "এখন তো হতে পারে না!"

"কেন?"

"সে আলোচনা করে পরখ করবেন যিনি, তিনি তো আজকে এখানে উপস্থিত নেই!"

ব্রতীন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "আলোচনা আপনি করবেন না?"

একটু হাসিয়া শঙ্কর উত্তর দিল, "কর্ত্তে পারি, আপত্তি নেই। তবে তার ওপরে নির্ভর করে final word আমি আপনাকে দিতে পারব না। সুতরাং তাতে লাভ হবে না কিছু।"

"তার মানে? আপনাদের তরফে আপনিই কি highest authority নন্?"

"না।"

ব্রতীন্দ্র গম্ভীর হইল। মিনিট্‌খানেক চুপ করিয়া শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "কিন্তু কথা ছিল, আপনাদের দলের সর্ব্বোচ্চ পরিচালক যিনি, তিনিই আজ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।"

"সেই কথাই ছিল এবং সেই কথা আমরা পালন করেছি। এর বেশী আজকে আর কিছু বল্‌তে পার্‌ছি না, মাফ করবেন। তবে আমরা যে একতিল কথার খেলাফ করিনি, এটুকু আজ বিশ্বাস করুন। পরে সব জান্তে পাবেন।"

ব্রতীন্দ্র তাহার তীক্ষ্ণ চক্ষুতারকার উপর দৃষ্টি মেলিয়া মৌন হইয়া রহিল।

শঙ্করানন্দ বলিল, "আজকের কাজ তাহলে শেষ হল। আমি তাঁকে গিয়ে বিষয়টা বিবৃত করি। তারপরে তিনি যদি আপনার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে রাজি হন্, তো কখন্ তাঁর সময় হবে আপনাকে জানাব। আপত্তি নেই তো?"

ব্রতী বলিল, "আচ্ছা।"

"এই কথা রইল তাহলে। নমস্কার!"

কালক্ষয় না করিয়া গোস্বামী লঘুপদে অন্ধকার পথ দিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

সুপ্রসন্ন সেইদিকে শেষ পর্য্যন্ত চাহিয়া দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ব্রতীকে বলিল, "লোকটার চাল দেখলে?"

"কেন?"

"একটা কথার জবাব দিতে তো আধঘণ্টা, তাও আবার 'হুঁ' এবং 'না'। কি গরিমার ভঙ্গী! যেন আমরা ওর সঙ্গে কথা কওয়ার যোগ্যই নই। লাটসাহেব আর—কি!"

ব্রতী একটু হাসিয়া বলিল, "কথা কম কওয়াই ভালো।

"উহুঁ, আমার লোকটাকে পছন্দ হচ্ছে না। বড্ড চালিয়াৎ! তারপরে—শেষ পর্য্যন্ত ধাপ্পাটা কি রকম দিলে, দেখেছ তো? বলে কিনা, final word সে দিতে পারে না? সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তা যখন সে নয়, তখন ফাঁকি দিয়ে এরকমভাবে আমাদের সঙ্গে আলাপ কর্ত্তে এল সে কোন হিসেবে? যার—তাব সঙ্গে কথা আমরা বলি না, তা তার জানা উচিত।"

ব্রতীন্দ্র গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া আপন মনে বলিল, "হুঁ।"

১০

হেমপ্রভা বারান্দার বাতির স্বুইচ টিপিয়া দিয়া হুকুম করিলেন, "খান্ তুই তিন চেয়ার নিয়ে এসো তো, সোণামুখী।"

দেওর সুরেশ গুপ্ত কাজ করেন কলিকাতার বাহিরে। পরিবার পরিজন সেখানেই থাকে; আজ দুপুরবেলা ইনি কার্য্যোপলক্ষে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। নহিলে দেখাসাক্ষাৎ সদাসর্ব্বদা হয় না। সুতরাং হেমপ্রভা আজ যত্ন পরিচর্য্যায় ব্যস্ত।

আশ্বিনের মাঝামাঝি, মিঠা ঠাণ্ডা হাওয়াটুকু বারান্দার খোলা আকাশের পথ দিয়া গায়ে আসিয়া লাগে বেশ মন্দ নয়। হেমপ্রভা দেওরকে বসিতে দিলেন এইখানে।

"এবার ছুটিতে আর কোথাও গেলে না, ঠাকুরপো?"

সুরেশ বলিলেন, "ন্নাঃ, ওরা দিনকয়েকের জন্যে একবার বাপের বাড়ী গেছে—বেড়িয়ে আসবে একটু, তাছাড়া বিপদ্ আপদ্ও আছে আবার!"

হেমপ্রভা উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিপদ্ আপদ্ আবার কার?"

"ঐ যে আমার বিধবা শ্যালীর ছেলেটা এবার বি, এ পাশ করলে না?—"

রমেশবাবু বেড়াইয়া ফিরিলেন, সঙ্গে অবিনাশবাবু।

হেমপ্রভা বলিলেন, "কি হয়েছে তার? মারা গেছে?"

অবিনাশবাবু আগাইয়া আসিয়া দুই হাত কপালে তুলিয়া বলিলেন, "সুরেশবাবু যে! কবে এলেন?"

"এই আজকেই। বসুন, বসুন!" সুরেশ পাশের চেয়ারখানা একটু টানিলেন।

কর্ত্তাদের মজলিসের ব্যাঘাত জন্মাইবার আশঙ্কায় হেমপ্রভা আসন ছাড়িয়া উঠিলেন। এই যে আরম্ভ হইল, রাত দশটা অবধি চলিবে ইহার স্রোত। অবিনাশবাবুর আবির্ভাব হইলে এমন প্রায়ই হইয়া থাকে। সুতরাং তিনি সোণামুখীর কাজের তত্ত্বাবধানে ভাঁড়ারে ঢুকিলেন।

কাপড় ছাড়িয়া রমেশবাবু ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। "বেড়াতে বেরোও নি বুঝি, সুরেশ?"

"নাঃ, বেজায় টায়ার্ড আজ!"

অবিনাশবাবু বলিলেন, "ক'দিন এখানে থাকা হচ্ছে আপনার?"

"দিন তিনেক।"

রমেশবাবু চশমাটা খুলিয়া সাম্নের টেবিলে রাখিয়া পায়ের উপর পা তুলিয়া মজবুত হইয়া বসিলেন।

অবিনাশ সুরেশকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "ভালোই হল, আপনার দেখাই পেয়ে গেলাম। কদিন থেকে একটা চিঠি লিখব লিখব ভাবছিলাম।"

"কারণ?"

"কন্যাদায় আর কি? আমার বড় মেয়েটিকে দেখেচেন তো? ওরই বিয়ের চেষ্টায় আছি।"

"আমার ঘট্‌কালীর দরকার বুঝি ?"

"হ্যাঁ,—ওই যে বলেছিলেন সেবার যে ছেলেটির কথা—আপনারই কুটুম ?"

"কে বলুন তো ?"

অবিনাশ বলিলেন, "আপনার শালীর ছেলে—ঐ যেটি—এবার বি, এ,তে ফাষ্ট´ক্লাস্ অনার্স´ পেয়েছে।"

সুরেশ মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "সে গুড়ে বালি পড়েছে, মশাই !"

"কেন, কেন ?"

"শোনেন নি বুঝি ? এই তারই কথা বলছিলাম এক্ষুণি বৌঠান্‌কে। সেটি মাসখানেক হল জেল খাট্‌ছে।"

অবাক্ হইয়া অবিনাশ ও রমেশ বলিলেন, "তাই নাকি ?"

"হুঁ সিডিশানে—এক বছর।"

অবিনাশবাবু বলিলেন, "ছেলেটার এমন মতিভ্রম ঘট্‌ল ? বড্ড দুঃখের কথা তো ?"

"আর বলেন কেন, মশাই ? আজকাল কি আর ছেলেদের বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু আছে ? নইলে দেখুন, বিধবা মায়ের ঐ একমাত্র ছেলে, সব দিক দিয়ে নিজেও কি রকম যোগ্য হয়ে উঠছিল, এমন অবস্থায় এরকম কেউ করে ? চেষ্টা কর্লে ভবিষ্যতে ও তো সিভিলিয়ান্ হতে পারত !"

রমেশবাবু বলিলেন, "হুজুগ—কেবল হুজুগ ! এই কংগ্রেস-ওয়ালারা ছেলেদের মাথা খেয়ে দেশের সর্ব্বনাশ করলে একেবারে !"

অবিনাশ বলিলেন, "যা বলেছেন! পড়াশুনোর বা কাজকর্ম্মের দিকে মন তো এমনিতেই নেই, তাতে আবার পাণ্ডাদের ফতোয়া পেয়ে আর কথা কি এখন? বয়কট্—বয়কট্—বয়কট্! স্কুল কলেজ তো চুলোয় গেছে, রাস্তায় রাস্তায় হৈ-হৈ আর পিকেটিং! নাম কেনাও হয়েছে শস্তা। একবার কলেজ স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে গলাবাজি কর্ত্তে পারলেই নেতা, আর মাসখানেক জেল ঘুরে আসতে পারলে তো কথাই নেই—এক্কেবারে মার্টার! এর যে উপায় কি হবে তাই ভাবি।"

রমেশবাবু বিজ্ঞভাবে একটু হাসিয়া বলিলেন, "উপায় আর কি? দু'চারদিন একটু লম্ফ-ঝম্ফ করুক্, তারপর পুলিশের গুঁতোটা আর একটু শক্ত রকমের পড়লেই দেখবেন সব একদম চুপ হয়ে গেছে। বেশী ভাবনা নেই। লাঠ্যৌষধি মহৌষধি!"

অবিনাশবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

সুরেশ বলিলেন, "হলে তো বাঁচা যায়! কিন্তু যে রকম হাওয়া দেখচি, আশা কর্ত্তে বড় একটা ভরসা হয় না। দেশসুদ্ধ যেন একেবারে ক্ষেপে গেছে। গান্ধিবেটা কি যাদুমন্ত্রই জানে!"

গান্ধির নামোল্লেখমাত্রই রমেশবাবুর মাথা গরম হইয়া উঠে। ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলিলেন, "এত বড় একটা হাম্বাগ! বলে, এক বছরের মধ্যে স্বরাজ এনে দেবে। আর দেশের লোকগুলো ভেড়ার পাল, অম্‌নি তাই বিশ্বাস করে ফেল্লে! mob ক্ষেপিয়ে বেড়াতে এমন ওস্তাদ আর দুনিয়ায় নেই।"

অবিনাশ বলিলেন, "বুজরুকি তো সেই সাত বছর আগেই বেরিয়ে গেছে, তবু লোকগুলোর চোখ ফোটেনা কেন, আশ্চর্য্য!"

"দেশের কি আর মেরুদণ্ড আছে? এখন সব হচ্ছে কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম।" বলিয়া রমেশবাবু অবজ্ঞাভরে ফুৎকারধ্বনি করিলেন।

শিবানী তাহার ঘরে বসিয়া পড়িতেছিল। অনেকক্ষণ হইতেই খোলা দরজার ফাঁক দিয়া বাহিরের আলোচনাধ্বনি কাণে আসিয়া ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। একবার মনে করিল, দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া আসে, কিন্তু ভেজাইল না। বইটা হাতে রাখিয়াই চেয়ারে হেলান দিয়া দরজার দিকে ফিরিয়া বসিয়া বাহিরে কাণ দিল।

সুরেশ বলিলেন, "এতে করে কি ভাবে যে স্বরাজ আস্‌বে, তাই ভাবি। কংগ্রেসের কর্ত্তৃত্ব যাঁরা কর্চ্ছেন, তাঁরা একবার ভেবেও দেখেন না?"

"ভেবে দেখবে কি? ভাবতে কি ওরা জানে? কেবল প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে নির্ব্বোধ গড্ডালিকার সামনে লম্বা লম্বা কথা!

অবিনাশ বলিলেন, "গাছে না উঠতেই এক কাঁদি! বলি, যেটুকু পেয়েছ ইংরেজের দয়ায়, তাই আগে হজম কর দিকিন্! Transferred Departmentগুলো হাতে পেয়ে কত কাজই না করা যেত দেশের, কিন্তু কতটুকুন্ হয়েছে শুনি? যা পেয়েছ, তাও বয়কট্! বলিহারি দেশপ্রেম! যদি বা ঘুরে ফিরে সেই ঢুকলে কাউন্সিলে, তাও কাজের বাড়ির ধারে কেউ নেই, বয়কট্ গেল তো এল obstructionist policy আর walk-out। ব্যারিষ্টারি আমলে সি, আর, দাসের বুদ্ধি-শুদ্ধি ছিল মন্দ নয়; গান্ধির পাল্লায় পড়ে সব গেছে!"

সুরেশ বলিলেন, “এই যে ‘অধিক খেতে করে আশা, তার নাম বুদ্ধিনাশা।’”

“ওরা যেটুকু রিফর্মস্ আমাদের দিয়েছে, বুঝে-সুঝেই দিয়েছে, আর বেশী হলে overdoseহয়ে যাবে। এই নিয়েই ধীরে সুস্থে ঘর সাম্‌লাও না আপাততঃ; তা নয়, একলাফেই চাঁদে হাত! তাও আবার দেখ, মোলায়েমভাবে আবেদন নিবেদন করে যতটা পাওয়া সম্ভব হোত, সেদিকে মন নেই। ঘুষি মেরে আদায় কর্ত্তে যায়! হায়রে কপাল, স্বাধীনতা আদায় করবে ভয় দেখিয়ে? ব্রিটিশজাত এমন জাত নয়! লাভের মধ্যে লাঠির বাড়ি খেয়ে কতগুলো লোক মরবে, আর ওদের মন যাবে বিগড়ে। ধীরে সুস্থিরে যা পাওয়া যেত, কংগ্রেসের এই নির্ব্বুদ্ধিতা আর গোঁয়ার্ত্তুমির ফলে তাও ফসকে যাবে, আমি ঠিক বলে দিলাম। রাজনীতিতে ডিপ্লোম্যাসি না জানলে চলেনা।”

অবিনাশ বলিলেন, “নির্ব্বুদ্ধিতা সুধু কি কংগ্রেসের? আর একদল যে এদিকে গজিয়ে উঠছে টেররিষ্ট্, সে যে আর এক মহা উৎপাত! গণ্ডস্যোপরি পিণ্ডকো জাতঃ।”

রমেশবাবু হাতের এক ইঙ্গিতে ব্যাপারটাকে ডিস্‌মিস্ করিয়া দিবার মত ভঙ্গীতে চক্ষু কুঁচ্‌কাইয়া বলিলেন, “আরে, রেখে দিন মশাই ওসব ছেলে ছোক্‌রার কথা। ও তো সেই আদ্যিকাল থেকে চল্‌ছে।”

“মাঝখানে কিছু দমে ছিল যেন। ইদানীং আবার চাঙ্গা হয়ে উঠছে যে!”

"উঠবেনা তো যাবে কোথায়, বলুন? এ-ও আপনাদের কংগ্রেসেরই কল্যাণে। দেশময় যে রকম lawlessnessএর spirit জাগিয়ে তুলেছে, তাতে এ সব ভণ্ডামি তো আস্‌বেই!"

সুরেশ বলিলেন, "সেই তো হয়েছে মুস্কিল। এখন হাজার non-violenceএর দোহাই দিয়ে Condemn করেও কংগ্রেস একে আর দমিয়ে রাখতে পারছে না যেন।"

রমেশবাবু নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "non-violence তো একটা মুখের কথা! গভর্ণমেণ্টকে ধাপ্পা দেবার চেষ্টা। কংগ্রেস তলে তলে এ ভণ্ডামীর কি রকম আস্কারা দিচ্ছে, দেখতে পাও না?

অবিনাশ পরিহাস করিয়া বলিলেন, "দেখা যাক্‌, পাকা ফলটির মত স্বরাজ এতে টপ্‌ করে হাতে এসে পড়ে কিনা!"

রমেশ তাচ্ছিল্যভরে একটা নিঃশ্বাস বাহির করিয়া ঠোটের কোণে হাসিয়া বলিলেন, "হুঁঃ। সে আশা জলে ভিজিয়ে কর্ত্তারা স্বচ্ছন্দে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোন্‌ গে'। চরকার ঘ্যান্‌ঘ্যানানি আর বোমা পিস্তলের টুস্‌টাস্‌—কোনটাতেই ইংরেজের পিলে চম্‌কাচ্ছে না। যত সব পাগলের কারখানা!"

নীচে বৈঠকখানায় কে এক ভদ্রলোক আসিয়াছেন, ভৃত্য একটুক্‌রা চিরকুট লইয়া হাজির হইল।

"বস্‌তে বল। যাচ্ছি।" বলিয়া রমেশবাবু তাহাকে বিদায় দিলেন। টেবিল হইতে চশ্‌মাটা তুলিয়া নাকে দিতে দিতে বলিলেন, "এই ছোক্‌রাগুলোর মাথা খেয়েছে একধারে যেমন কংগ্রেস,

নাই দিয়ে আরও সর্ব্বনাশ করছে তেমনি এদিকে গার্জ্জিয়ান্‌রা। শাসন কড়া থাক্‌লে পারে কখনও এসব গুণ্ডামীর দলে মিশ্‌তে ?”

রমেশবাবু নীচে চলিয়া গেলেন, একটু পরে বিদায় লইলেন অবিনাশবাবুও।

উপরতলাটা হঠাৎ যেন একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল। শিবানীর মনে হইল, তাহার ঘরের হাওয়ার তালে তালে এখনও যেন তর্কের রেশ রিন্‌-রিন্‌ করিয়া ফিরিতেছে। বই বন্ধ করিয়া বাহিরে আসিয়া সে সুরেশের পাশে খালি চেয়ারটাতে বসিয়া পড়িল। “সভা ভাঙ্গল, কাকাবাবু ?”

সুরেশ গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া হাসিয়া বলিলেন, “হুঁ। কি করছিলি এতক্ষণ ?”

“পড়ছিলাম।”

“কি ?”

“ঐ এমনিই, বিশেষ কিছু নয়।”

সুরেশবাবুর মগজের মধ্যে রমেশের বক্তৃতার ঢেউ ধাক্কা দিয়া দিয়া ফিরিতেছে। তিনি বলিলেন, “দাদার কথাগুলো শুনতে কিন্তু বেশ লাগে। বেশ বুদ্ধিমানের কথা।”

শিবানী বলিল, “অত্যন্ত সারগর্ভ !”

“না হবেই বা কেন ? জজিয়তি করে চুল পাকালেন, তার ওপর তাঁর পড়াশোনাও যে যথেষ্ট।”

শিবানী হাসিয়া বলিল, “সেইজন্যেই তো বাবা মনে করেন; তিনি ছাড়া ভূ-ভারতে আর কেউ কিছু পড়াশুনোর ধার ধারে না।”

"তা কথাটা নেহাৎ বাজে নয়। এই সব ভূইফোঁড় পলিটিশিয়ান্-দের পাল্লায় না পড়ে দাদার মত দু'চারজন স্থিরমস্তিষ্ক বিচক্ষণ লোকের হাতে যদি কংগ্রেসটা থাকৃত, তো অনেক লাভ হত দেশের।"

"তা, বাবা ঢুকলেন না কেন কংগ্রেসে? তাহলে একেবারে খাঁটি পথে এগিয়ে দিতে পারতেন!"

"লোকগুলো মানে কৈ? আজকাল কি আর ভেবে চিন্তে কিছু করে কেউ? মাতব্বরদের শেখানো বুলি তোতাপাখীর মত না আওড়াতে পারলে আর আমলই পাওয়া যায না!"

শিবানী মাথা নীচু করিয়া চিন্তিতমুখে বলিল, "তা বটে! লোকগুলো কি আহাম্মক!"

বারান্দাব খানিকটা দূবে সুখেন্দু দেখা দিল। হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিল, "কাকাবাবু তোমাকে রাজনীতি শেখাচ্ছেন নাকি, দিদি?"

শিবানী হাসিল; সুরেশকে উদ্দেশ কবিয়া বলিল, "সুখুটা আজকাল বেজায় জ্যাঠা হয়ে উঠেছে।"

সুরেশ ডাকিলেন, "আয় দেখি সুখু, এদিকে আয় একবার। তোকে যে সারাদিনে দেখ্‌তেই পেলাম না। খুব পড়াশুনো কর্চ্ছিস্ বুঝি?"

হেমপ্রভা পাশ দিয়া যাইতেছিলেন, মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, "পড়াশুনো যা করছে, ভগবান্‌ই জানেন!"

"এবার তোর পরীক্ষার বছর না রে? Test কবে?"

"দেড় মাস বাকী।"

মা বলিলেন, "পরীক্ষার তো বছর! কি যে বাছা করবেন পরীক্ষায়, বলা যায় না। বই তো ছুঁতে দেখি না দিনেরাতে একবার; কেবল হৈ হৈ!"

সুখেন্দু প্রবলভাবে প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "না কাকাবাবু। মা সব আমার নামে বানিয়ে বানিয়ে বলেন। এই দেখুন না, আমি এক্ষুণি একগাদা নোট্ মুখস্থ করে এলাম।"

সুরেশবাবু হেমপ্রভার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দলে-টলে মিশছে নাকি আবার? সর্ব্বনাশ! ওসব স্বদেশী ছোক্‌রাদের ধার দিয়েও যাবি নে সুখু, খবরদার!"

সুখেন্দু বলিল, "ঈস্! আমি কি তেম্‌নি গাধা?"

১১

অদৃষ্ট না মানিলেও মানিতে হয়। আজ যে আবেষ্টনের মধ্যে বসিয়া সুখে দিন কাটিতেছে, তাহার বাহিরে কি যে আছে বা থাকিতে পারে, চোখেই পড়ে না। কাল অকস্মাৎ কালবৈশাখী আসিয়া সে পরিচিত সুখবেষ্টনী এমনভাবে লণ্ডভণ্ড করিয়া হয়ত দিবে যাহার ধাক্কায় কে কোথায় ছিট্‌কাইয়া গিয়া পড়িবে, জানা নাই। বর্ত্তমানের ভিত্তিতে মানুষ যত কল্পনা গড়ে, ভবিষ্যৎ ছাঁটিয়া কাটিয়া তাহার কাঠামোটুকু যদি বজায় রাখে, তবেই যথেষ্ট, তাহাকেই মানুষ আশার পরম চরিতার্থতা বলিয়া মনে করে। কিন্তু

কাঠামোসুদ্ধ চুরমার করিয়া একেবারে অচিন্ত্যপূর্ব্ব নূতন মূর্ত্তিতে আসিয়া ভবিষ্যৎ রূপ ধরে, এমনও দেখা যায় এবং তখনই মানুষ কপালে কর হানিয়া বলে—অদৃষ্ট! ক্ষেমদার কপালেও তাই।

এক মাস আগে এমন দিনে সন্ধ্যাবেলা কর্ত্তা যখন আফিস হইতে বাড়ী ফিরিয়াছিলেন, তখন পর্য্যন্তও এমন সর্ব্বনাশ তাঁহার কল্পনাতেও তো আসে নাই। সহরের উপান্তে দুই চারি ঘরে কলেরা দেখা দিয়াছিল, কাণে শুনিয়াছে। কিন্তু মরণের খবর কই শোনা তো যায় নাই? হঠাৎ অতর্কিতে কালদূত কি সব বাছিয়া তাঁহারই ঘরে ছোঁ মারিতে আসিল? রাত্রির মধ্যেই কেমন করিয়া কালব্যাধি অকালে তাঁহার দেহে প্রবেশ করিয়া মরণের রূপ ধরিল, তার পর পরদিন সন্ধ্যা না ফিরিতেই সব শেষ! বাইশটি ঘণ্টা চোখের পলক না ফেলিতে সমস্ত উলট্পালট্ করিয়া কোথা দিয়া তাঁহাকে কোথায় আনিয়া ফেলিল, ভাবিতেও ক্ষেমদার বুকের মধ্যে শিহরিয়া উঠে। একটা বিভীষিকাময় দুঃস্বপ্ন! ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে, কিন্তু স্বপ্ন এখন বাস্তবের দুর্ব্বহ বোঝা হইয়া মাথার উপর নামিয়া আসিয়াছে চিরকালের মত।

সংসারে প্রাচুর্য্য না থাকিলেও অনাটন এতদিন তাহার কিছুই ছিল না। স্বামী ও একটিমাত্র কন্যা লইয়া অনাড়ম্বর স্বচ্ছন্দতার মধ্যে নিরিবিলি দিন কাটিয়াছে। যে একটিমাত্র মানুষের উপর সংসারের সমস্ত নির্ভর, সেই মানুষটি অন্তর্হিত হইলে যে মুহূর্ত্তেই কুটীরখানি ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে, অত্যন্ত স্বাভাবিক হইলেও এ

আশঙ্কা কখনও ক্ষেমদার মনে আসে নাই। অর্থাৎ মানুষের যে অন্তর্ধান হয়, এই চিরন্তন সত্যটি চিরন্তন সুখাকাঙ্ক্ষার আড়ালে চাপা পড়িয়া ছিল। আজ স্বামী চলিয়া যাওয়ায় আর্থিক দিক দিয়া সংসার যেমন হইয়া পড়িল অচল, রক্ষণাবেক্ষণ ও আশ্রয়ের উপলক্ষ্য বলিতেও তেমনই কেহই নাই; একা একটি অবিবাহিতা তরুণী মেয়ে লইয়া তিনি এখন করিবেন কি? স্বামীর শোক একদিকে, অন্ধকার ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া দুর্ভাবনার ব্যাকুলতা আর একদিকে তাহার চেয়েও বড় হইয়া উঠিল।

বিভা একেবারে মুষড়াইয়া পড়িয়াছিল, এমন আঘাত জীবনে সে কখনও পায় নাই। শ্রাদ্ধ-শান্তি হইয়া গিয়াছে আজ দিন পনেরো কুড়ি আগে। নীরবে কাঁদিয়া আর চোখের জল মুছিয়া মুছিয়া বিভার মনটা আস্তে আস্তে অনেকখানি হাল্কা হইয়া আসিতেছে। শুধু মায়ের শাঁখা-সিঁদূরবিহীন নিরাভরণ দেহের শাদা থানের দিকে চক্ষু পড়িতেই ছ্যাঁৎ করিয়া বুকের মধ্যে জ্বালা করিয়া উঠে। মুখ ফিরাইয়া ছল্‌ছল্‌ চোখ দুইটিতে শাড়ীর আঁচল বুলাইয়া লয়।

দিন কাহারও জন্য থামিয়া থাকে না, জীবনও বিবর্ত্তনের পথে চলে। বিভা ও ক্ষেমদারও একটা মাস দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। কিন্তু কোন্ পথে, কোন্ নিয়তির অভিমুখে—তাহাই ভাবে।

পাড়াপ্রতিবেশীরা নিয়তই দেখা সাক্ষাৎ করিতে আসে ও সান্ত্বনা দেয়। আজও বেলা-শেষে খোকার-মা আসিলেন। বিভা নিঃশব্দে

মাদুর বিছাইয়া দিয়া বারান্দার কোণে গিয়া মোড়া টানিয়া বসিয়া রহিল। ঘরের দাওযার কোল ঘেঁসিয়া যে সন্ধ্যামালতীর ঝোঁপটি, তাহাতে লাল টুকটুকে গুটিকয়েক কুঁড়ি ফুটিবার আশাপথ চাহিয়া বাতাসে দুলিতেছে; বিভা অকর্ম্মণ্যভাবে চাহিয়া দেখে। আর, ঘরের ভিতর হইতে মায়েদের কথাবার্ত্তাগুলি থাপছাড়া হইযা মাঝে মাঝে কাণে আসে।

খোকার-মা নিঃশ্বাস ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "জা'যেরা চলে গেছেন?"

ক্ষেমদা বলিলেন, "হুঁ, কদিন আর থাক্‌বে? ভাসুর-পোর চাক্‌রী-বাক্‌রী আছে তো?"

"তা তো বটেই!"

একটুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া খোকার-মা আবার জিজ্ঞাসা করেন, "তার পরে, তোমার এদিক্‌কার ব্যবস্থা কি ঠিক্ করলে তাহলে?"

আকাশের দিকে চক্ষু তুলিয়া ক্ষেমদা নিরুৎসাহভরে বলিলেন, "ভগবান্ জানেন?"

"সে তো হল মূল কথাই! নইলে কে-ই বা জান্‌ত এমন সর্ব্বনাশটা ঘট্‌বে? সর্ব্বোপরি বিধিলিপি! তবু মানুষের তো একটা চেষ্টা চিন্তা করা দরকার! এমনিভাবে কদিন আর থাকবে? একটা আশ্রয় তো চাই!"

ক্ষেমদা চুপ করিযা রহিলেন।

খোকার-মা বলিলেন, "আচ্ছা তোমার বাপের বাড়ীর অবস্থা তো ভালো। সেখানেই কি যাবে নাকি?"

বাপের বাড়ীর অবস্থা ভালো; কিন্তু বেশী ভালো বলিয়াই আজ কাঙালিনী হইয়া ভাইয়ের গলগ্রহরূপে সেখানে পদার্পণ করিতে ক্ষেমদার মন কিছুতেই সরে না। অসহায়ের মর্ম্মবেদনা ধনবান্ আত্মীয়ের করুণার ছটায় আরও নির্ম্মম হইয়া বাজে। ভাইয়ের হাজার ঐশ্বর্য্য থাকিলেও তাঁহার কোনও দাবী তাহাতে নাই, তার চেয়ে স্বামীর এই নিরালা কুটীরখানি তাঁহাকে গৌরব ও সৌভাগ্য দান করিতেছে, কারণ এ তাঁহার আপনার। ছেলেবেলা হইতে ক্ষেমদার স্বভাবের মধ্যে এই যে একটি আত্মমর্য্যাদা বোধ, আজ দুর্দ্দিনে পড়িয়াও ইহাকে তিনি কিছুতেই মাথা নোয়াইতে পারিতেছেন না। কিন্তু কপালে কি যে আছে, কে জানে? বিধাতা এমন করিয়াই কপাল ভাঙিলেন! নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিরসমুখে ক্ষেমদা বলিলেন, "অদৃষ্ট যদি টানেই, সেখানেই যেতে হবে। উপায় কি?"

"শ্বশুরকুলে ভার নেবার মত যখন কেউ নেই, তখন উপায় আর কি? তা বাপের বাড়ী ভাই-খুড়োরা আছে যখন, আদর-যত্ন হবে।"

ক্ষেমদা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "ছেলের অভাব আজ যেমন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি, এমন আর কখনও পারি নি।"

"তা আর বল্‌তে? সাধে কি আর লোকে ছেলে ছেলে করে পাগল হয়? নইলে ছেলেতে মেয়েতে আর তফাৎ কি? এই তো দেখ, এই মেয়ে যদি তোমার মেয়ে না হয়ে ছেলে হত, আজ

তাহলে তোমার ভাবনা কিসের? কুড়ি বাইশ বছর বয়স হয়েছে, দিব্যি রোজগার করে তোমার সংসারের ভার মাথায় নিতে পারত!"

"আর এখন একে নিয়েই তো হয়েছে আমার আরও ভাবনা।"

"সে আর নয়? মেয়েটাকে যদি কোনও গতিকে পাত্রস্থ করে দিতে পার্ত্তে এর মধ্যে, তাহলে তোমার একলার জন্যে আর চিন্তা ছিল কি? জামাই-ই তো একটা মস্ত সম্বল হ'ত।"

সন্ধ্যামালতীর আধফোটা কুঁড়িটাকে নখ দিয়া ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে বিভা বাঁশবনের দিকে চাহিল।

ক্ষেমদা বলিলেন, "অদৃষ্টে দুঃখ থাক্‌লে খণ্ডায় কার সাধ্যি? নইলে এমনটাই বা হবে কেন, বল?"

"যাক্, বাপের বাড়ী চলে গেলে ভাইয়েরা যাহোক্ একটা গতি করবেই। সেই এখন ভরসা।"

ক্ষেমদা চুপ করিয়া রহিলেন।

সন্ধ্যা হয়-হয় দেখিয়া খোকার-মা উঠিলেন, "যাই, কাল দুপুরে সময় পেলে আবার আস্‌ব। খোকার ছেলেপুলেগুলোর দৌরাত্ম্যে আর ফুর্সৎই পাইনে একদম।"

সন্ধ্যার পরে ক্ষেমদা সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন করিয়া খাটের উপরে আসিয়া বসিলেন। কাজ তাঁহার কোনদিনই ছিল না, বিভাই সব করে; এখন আরোই নাই, সারা সংসারটিই যেন কেমন আলগা হইয়া গিয়াছে। বিভাও রাতের বেলায় আর কাজ খুঁজিয়া পায় না। আগে রান্নাবান্না লইয়া ব্যস্ত থাকিত, এখন আর রাঁধিবে

কাহার জন্য ? একা সে, আর চাকরটি। কোন রকমে ভাতে-সিদ্ধ-ভাত নামাইয়া রাখিয়াই সে অবসর।

বাবার টেবিলের কাছে বসিযা তাঁহার বই কয়খানা নাড়িতে নাড়িতে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বিভা ডাকিল, "মা !"

পাশের কামরা হইতে মা উত্তর দিলেন, "কি ?"

"আমি চাকরী করব।"

একান্ত অবাক্ হইযা মা বলিলেন, "চাকরী করবি !! তুই ?"

"হুঁ।"

"সেকি ! কেন ?"

বিভা বলিল, "নইলে সংসার চলবে কিসে, মা ?"

ক্ষেমদা বলিলেন, "সে ভাবনা তোর করে লাভ কি ? ভগবান্ যেমন চালাবেন তেম্‌নিই চল্‌বে !"

"আমি ছেলে হলে একথা বল্‌তে কি, মা ?"

ক্ষেমদা একটু চুপ করিয়া রহিলেন।

বিভা আবার বলিল, "আজকাল তো অনেক মেযেই কাজ করছে, মা। লোকে কিচ্ছু নিন্দে করে না !"

"না, তা তো নয। তবে কি না—তোর দরকার কি ? ভগবান্ কি এমনি করেই কপাল ভাঙ্‌বেন ? না, না, যাহোক্ করে দিন যাবেই।"

বিভা বলিল, "মামার বাড়ী গিযে ?"

ক্ষেমদা কথা বলিলেন না।

"না, মা, তা হবে না। আমি চাকরী করব।"

অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া ক্ষেমদা ভাবিতে লাগিলেন। বিভাও কথা বলিল না, মায়েব অনুমতির আশায় প্রতীক্ষা করিয়া করিয়া টেবিলের উপর দাগ কাটিতে লাগিল।

"চাকবী যে বলিস্, তাই কি বল্লেই পাওয়া যায? চাকরীর উমেদারী করে কত মানুষ বেকারে ঘুরছে, দেখতে তো পাই!"

"চেষ্টা করতে দোষ কি মা? চেষ্টা করলে জুটতেও পাবে বা! মেযেদের কাজের বাজারের অত দুরবস্থা এখনও হযনি।"

"সে চেষ্টাই বা করে কে? তেমন গরজ করে কাজেব জন্যে খোঁজ করবে, এমন আছে কে বল্? তোর মামাদেব কাছে যদি বলি তোর চাকরীর কথা, তো লাঠি নিযে মারতে আসবে, জানিস্ তো?"

বিভা খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করিল। জানালা দিয়া বাহিরেব দিকে একবার তাকাইল, টেবিলের আস্তরণটা টানিয়া একবার ঠিকঠাক্ করিল, পেন্সিলটা হাতের নখে ঘসিতে ঘসিতে বলিল, "ব্রতীদাকে একবার লিখ্‌লে হয না?"

১২

সুপ্রসন্ন দুয়ারের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

রবিবারের ছুটি। ব্রতীন্দ্র দুপুরবেলা খাটিয়ায শুইয়া শুইয়া খবরের কাগজ পড়িতেছে। সুপ্রসন্নের দিকে চোখ পড়িতেই পা-টা একটু গুটাইয়া পাশ ফিরিল। শিযরের কাছে চেযার টানিয়া আনিযা সুপ্রসন্ন বলিল, "ষ্টেশন থেকে ফিরতে ফিরতে দেরী হযে গেল।"

"বৌকে বাপের বাড়ী পাঠিযে এলে ?"

"হুঁ। নইলে আমি এদের একা ফেলে যাই কি করে? বরাতে থাকে তো ফিরে এসে মাসখানেক বাদে আন্‌বো ক্রিসট্‌-ম্যাসের পরে। তুমি বাপু দিব্যি সুখে আছ!—যাক্, তারপর, গিছ্‌লে কংগ্রেসমণ্ডলে ?"

ব্রতীন্দ্র কাগজ মুড়িতে মুড়িতে উঠিযা বসিযা বলিল, "হুঁ।"

"এগোলে কতদূর ?"

ব্রতীন্দ্র বলিল, "ব্যাপার হচ্ছে কি, বুঝলে, কংগ্রেসের প্রভাব থেকে মুক্ত হওযাই ওদের পক্ষে বেজায় মুস্কিলের কথা! এমন মেরুদণ্ড কারো নেই যে, ভুল বুঝলেও সে ভুল ধরিয়ে দিতে পারে, অথবা প্রকাশ্য সভায একটা প্রতিবাদ কর্ত্তে সাহস করে।"

সুপ্রসন্ন বলিল, "কিন্তু ওরা নিজেরা নিশ্চযভাবে বুঝেছে কিনা ?"

"না বুঝবার কোনও কারণ তো নেই!"

সুপ্রসন্ন বলিল, "ওদের কবল থেকে কংগ্রেসকে ছিনিয়ে আনতে না পারলে দেশের মরণ সুনিশ্চিত, আমি বল্লাম।"

ব্রতীন্দ্র একটু মাথা নাড়িযা বলিল, "সে কথা ঠিক নয, সুপ্রসন্ন। আমাদের বর্ত্তমানের একমাত্র কাজ হচ্ছে এই মড়ার দেহে মানুষের প্রাণসঞ্চার করা। মানুষের এই সহজ অধিকার আগে পাক্, দেবত্বের আসন নেবে তার পরে। সে আজ নয, আজ অসম্ভব!"

সুপ্রসন্ন সজোরে মাথা নাড়িযা বলিল, "সে কথা আমি মানিনে।"

ব্রতী হাসিয়া বলিল, "যাঁর যা প্রাপ্য তাঁকে তা দিতে তোমার মন সরে না কেন ?"

"উঁহুঁ, তোমার সঙ্গে ঐ খানটাতে আমার বনে না, ব্রতী। বড্ড বেশী উদারতা দেখাও—অস্থানে, অপাত্রে।"

ব্রতীন্দ্র কোনও উত্তর করিল না।

সুপ্রসন্ন বলিল, "সে থাক্। যা বলছিলে তাই বল দেখি। কংগ্রেসের কর্ত্তারা বল্লেন কি ?"

"আমি তাদের বল্লাম, কংগ্রেসের এই নন্-ভায়োলেন্সের বিপদ্ যখন আপনারা পরোক্ষে সবাই স্বীকার করছেন, তখন এই ক্রীড্‌টাকে স্পষ্টভাবে বদ্‌লবার চেষ্টা করুন না ?—তারা ইতস্ততঃ কর্চ্ছে, বলে, কি করে বদ্‌লানো যায় ?"

সুপ্রসন্ন বলিল, "সাহস থাক্‌লে বদ্‌লানো অতি সহজেই যায়। এই লাহোর-কংগ্রেসে রেজোল্যুশান তুল্লে আট্‌কায় কে ?"

"হ্যাঁ, সেকথা আমি বলেছি। কিন্তু তারা বলে, আচম্‌কা এরকম একটা প্রস্তাব তোলা একেবারেই অস্বাভাবিক হবে এবং অসমীচীনও বটে। তাতে ফল ভালো হবে না।—আমি তাতে বলেছি, যদি এমন কোনও ঘটনা এবার কংগ্রেসের প্রাক্কালে ঘটে, যাতে সে সম্বন্ধে কংগ্রেসের সভায় আলোচনা উঠতে পারে, তখন সেই অবকাশে ক্রীড্-এর প্রশ্নটা পুরোভাগে আনতে পারবেন কি আপনারা ?"

"তারা কি উত্তর দিলে ?"

"তারা বল্লে, তাহলে অবশ্যই পারি এবং অবশ্যই করব। কারণ,

এ ক্রীড্-এর সংশোধন হওয়া যে একান্তই দরকার, সে বিষয়ে আমরা বাংলার কংগ্রেসীদল কিছুদিন থেকেই ভাবছি। কিন্তু ওরকম একটা ঘটনা ঘটা-না-ঘটা একেবারেই অনিশ্চিত, সুতরাং আমরা তো কথা দিতে পারি না!—”

সুপ্রসন্ন বলিযা উঠিল, “তুমি বল্লে না কেন—”

আস্তে বাধা দিযা ব্রতী বলিল, “হুঁ, আমি বলে এসেছি, ‘সে ভার আমাদের’।”

সুপ্রসন্ন উৎসাহিত হইয়া বলিল, “বেশ!”

কতক্ষণ নীরবে ভাবিতে ভাবিতে ঘরের মেঝের দিকে চাহিযা ব্রতীন্দ্র বলিল, “সাম্রাজ্যবাদ তো দূরের কথা, রাষ্ট্রবাদেরই গোড়ার কথা হচ্ছে শাসন, নইলে রাষ্ট্রের বন্ধনই থাকে না। এবং যতদিন না জগৎ জুড়ে লাখে লাখে সব মহাত্মা গজিযে উঠবে, ততদিন এ রাষ্ট্রবন্ধনের প্রয়োজনও আছে। আপাততঃ সে স্বপ্ন নিযে মাথা না ঘামিয়ে আমাদের লড়তে হচ্ছে প্রত্যক্ষ বাস্তবের সাথে। রাষ্ট্রের এ সহজ নীতিটুকু যে উপলব্ধি কর্ত্তে পারে না, দেশের রাজনীতির কর্ণধার হওয়া তার কম্ম নয়।”

“ঠিক বলেছ, ভাই। হাটে, বাটে, ঘাটে এই কথাটাই আজ বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করা দরকার।”

ব্রতী তেমনই চিন্তিত মুখে বলিল, “অতি দানে বলির্বদ্ধ, আর আমরা বদ্ধ হয়েছি অতি প্রেমের নির্ব্বুদ্ধিতায়!” ব্রতীন্দ্রের কপালের রেখাগুলির মধ্যে একটা গভীর বিরক্তি ও অশ্রদ্ধার করুণা ফুটিয়া উঠিল।

নিষ্ফল আক্রোশে সুপ্রসন্ন মনের মধ্যে গুমরিয়া উঠিল ; পাঞ্জাবীর আস্তিনটা হাতের কনুই পর্য্যন্ত গুটাইয়া চেয়ারের উপর সোজা হইয়া বসিল, আবেগের আতিশয্যে মুখে কোনও কথা ফুটিল না।

ব্রতী আপনমনে বলিল, "এ নির্ব্বুদ্ধিতার প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে আজ আমাদের অনেক বড় ক্ষতি সইতে হবে।"

গম্ভীরমুখে কতক্ষণ বাহিরের রৌদ্রতপ্ত আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ব্রতী জিজ্ঞাসা করিল, "আজ আটটার ট্রেণেই যাচ্ছ তো ?"

সুপ্রসন্ন বলিল, "হুঁ। কিন্তু ওদের সঙ্গে তোমার এ্যাপয়েণ্ট্মেণ্ট্ আজ ক'টায়, ব্রতী ?"

"চারটে।"

"ফলাফলটা আজকে জেনে যেতে পারলে ভালো হত।"

ব্রতী বলিল, "না হয় ফিরে এসে জানবে।"

সুপ্রসন্ন খাটের উপর হইতে খবরের কাগজটা তুলিয়া লইল। এদিক ওদিক্ দুইচারি লাইন এলোমেলোভাবে পড়িতে পড়িতে বলিল, "লোকটা কে, জানতে আমার ভারি কৌতূহল হচ্ছে।"

"কোন্ লোকটা ?"

"যিনি আজ তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।"

"ও।"

"সেদিন ঐ ভদ্রলোক ভাবগতিকে এমন বিরাট্ সমারোহ দেখালেন তাঁর সম্বন্ধে, যে, মনে হয় যেন একটা অসাধারণ বিশেষ কেউ।"

ব্রতী বলিল, "দেখা যাক্।"

হেলিয়া-পড়া সূর্য্যের আলো জানালার মধ্য দিয়া একটু কাৎভাবে দেয়ালের গায়ে পড়িয়াছে। মেঝেতে, জানালার ঠিক নীচেই পড়িয়াছে কালো ছায়া। ঘড়ির দিকে না তাকাইয়াই ব্রতী অনুমান করিল, বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। দেয়ালে টাঙানো জামাটা পাড়িয়া লইয়া বলিল, "এবারে উঠতে হচ্ছে, সাড়ে তিনটে বাজে।"

"চল, যাওযা যাক্।"

ঘরের তালায় চাবী আট্‌কাইযা হাতঘড়ির দিকে পলকমাত্র ফেলিযা দুইবন্ধু একসঙ্গে বাহির হইযা পড়িল।

বাগবাজারের গলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া ব্রতীন্দ্র অতিকষ্টে যে বাড়ীখানি খুঁজিয়া বাহির করিল, দরজার উপরে চাহিয়া দেখে—হাঁ, এই নম্বরই বটে। সজোরে কড়া ধরিযা গোটাকতক ধাক্কা দিতেই দুযার খুলিয়া বাহির হইল শঙ্করানন্দ।

প্রকাণ্ড হলঘরের পাশ দিযা ভিতরকার কোণের দিকে একটা ছোটরকমের কামরার মধ্যে লইয়া গিযা শঙ্করানন্দ তাহাকে বলিল, "বসুন।"

"তিনি এসেছেন?"

"না, আসেন নি এখনও।"

ব্রতীন্দ্র ঘড়ির দিকে তাকাইল।

শঙ্কর একটু হাসিযা বলিল, "ব্যস্ত হবার কারণ নেই, সময়ের গোলমাল তাঁর কখনও হয না!"

চারটা বাজিতে এখনও চার পাঁচ মিনিট বাকী।

"আপনি বসুন একটু, আমি আসছি।" বলিযা গোস্বামী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ব্রতীন্দ্র চারিদিক্ একবার ভালো করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল —পুরাণো জমিদারীহালের বাড়ী, প্রকাণ্ড চক্‌মিলানো।

একটু পরেই শঙ্করানন্দ ফিরিয়া আসিল, সঙ্গে সঙ্গে ঢুকিল একটি অনতিপ্রবীণ মহিলা।

শঙ্কর পরিচয় করাইয়া বলিল, "এই ইনিই।"

ব্রতীন্দ্র একান্ত বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল। এমনতর প্রত্যাশা করিযা সে আসে নাই। যে অজানা লোকটার সঙ্গে বাগ্‌বিনিময় করিবে বলিযা সতর্ক সাবধানতার সহিত মনে মনে প্রস্তুত হইতেছিল, সে অকস্মাৎ নারীমূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হইয়া মনের মধ্যে কেমন একটা ধাঁধাঁ লাগাইয়া দিল। মুহূর্ত্তে মনটা দমিযা গেল, মুহূর্ত্তে উঁকি মারিল কৌতূহল।

শঙ্কর তাহার ক্ষুরধার দৃষ্টিতে হাসি মিশাইযা ব্রতীর দিকে একবার চাহিযা বলিল, "এই জন্যেই সেদিন আপনাদের কাছে সম্পূর্ণ-ভাবে কথা রাখতে পারি নি। কারণ, এঁর পক্ষে যখন তখন সর্ব্বত্র সাক্ষাৎ করা সম্ভবপর নয।"

ব্রতীন্দ্র বিস্ময়ের আবেশ সাম্‌লাইযা লইয়া বলিল, "হুঁ, বুঝেছি।"

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, "আমার থাকবার প্রয়োজন হবে কি, দেবি?"

"হ্যাঁ, বসুন।" ফরাসপাতা খাটের একধারে বিনাবাক্যব্যযে দেবী শঙ্করের পাশে বসিয়া পড়িল। কপালের পাশ দিযা একগুচ্ছ

কালো চুল সরাইতে সরাইতে ব্রতীর দিকে চাহিয়া বলিল, "আলোচনা কর্ত্তে চান আপনি ?"

ব্রতী মাথা নাড়িয়া জানাইল, "হ্যাঁ।"

"বলুন তা হলে।"

দেবীর কালো ভ্রূ তুইখানির নীচে যে আয়ত চক্ষু তুইটি সর্ব্বাগ্রে মানুষের চোখে পড়ে, তার অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির দিকে চাহিয়া দেখিয়া এবার ব্রতীন্দ্রের মনটা সজীব ও খুসী হইয়া উঠিল। এক মিনিট্ আগে যাহার অবয়বে ও হাসির মাধুরীতে নিছক নারীত্ব ছাড়া আর কিছুরই পরিচয় ছিল না, চোখের দীপ্তি জ্বলিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে মুখশ্রীতে যে গাম্ভীর্য্য ফুটিয়াছে, চিরন্তনী শক্তির আভাস তাহাতে আছে বটে!

১৩

পাশের বাড়ীতে কোন্ এক মেয়ে গান জুড়িয়া দিয়াছে; শুনিতে পাইয়া কল্যাণীর গান গাহিবার সখ জাগিল। ঘরে ঢুকিয়া অর্গ্যানটার ঢাক্‌না তুলিয়াই ঘাটে হাত দিল। ছেলেমানুষ,—সময়ের মূল্যবোধ নাই,—পরীক্ষা যে আর পনেরো দিন পরে, সে চিন্তাও নাই, একটার পর একটা গাহিয়াই চলিয়াছে।

শিবানী নিজের ঘরে বসিযা শোনে। একবার ভাবে, এবারে পড়ার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া গানের পালা সাঙ্গ করিয়া দিয়া আসে। নিজের স্কুলে বসিয়া নিজের বোন্ যদি তেমন একটা কিছু

অকৃতিত্ব দেখাইয়া বসে, বড়ই লজ্জার কথা হইবে। গতবারেও কলি পাশ করিয়াছে কোন রকমে টানিয়া ঠেলিয়া। সুখেন্দু আর কলি, দুইটিই একেবারে এক ধাঁচের,—তবে সুখুর বুদ্ধি আছে বেশী, এই যা!

কলির কচি কণ্ঠের সুর কাঁপিয়া ভাসিয়া আসিল,—

'তারা চরণে দলে গেল মরণশঙ্কারে—
তারা সবারে ডেকে গেল শিকল ঝঙ্কারে—'

শিবানী চেয়ারে গা এলাইয়া বসিয়া চিবুকে হাত ঠেকাইয়া নিস্তব্ধ হইযা রহিল। বিবেকানন্দের প্রকাণ্ড ছবিখানির পাযের নীচে ধূপদানীতে দহ্যমান ধূপের ধোঁযা কুণ্ডলী ঘুরিতে ঘুরিতে মন্থর-গতিতে উর্দ্ধে উঠিয়া যাইতেছে—ছবিখানিকে ঝাপ্‌সা করিযা দিয়া আবার তারও উপরে একেবারে কড়িকাঠগুলি পর্য্যন্ত। শিবানীর চক্ষু দুইটি অর্থহীন আবেশভরে তাহার আঁকাবাঁকা পথের পিছন পিছন অনুসরণ করিয়া চলিল। পুড়িযা পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া ধূপের যে ঢেলাগুলি অপূর্ব্ব গন্ধের মধ্যে রূপান্তরিত হইয়া চলিযাছে, সমস্ত ঘরখানির আনাচে কানাচে ছড়াইযা গিয়া সে সৌরভ ঘরের আবহাওয়াটিকে করিয়া তুলিয়াছে নিবিড়।

আবার কল্যাণী গায়—

'চরণে দলে গেল মরণশঙ্কারে—"

নিবিড় মৌনতা মন্থন করিয়া ঐ সুরের ঝঙ্কার আকাশে বাতাসে শিহরণ তোলে; তালে তালে ঢেউএর আঘাত বুকে আসিয়া

লাগে, হয়তো বা অজানিতে অগোচরে রক্তের চলন হইয়া উঠে উত্তাল। শিবানী মনে ভাবিল, কলি গায় বেশ! পদবিন্যাস ভুলাইয়া দিয়া, সুরের ইন্দ্রজাল অতিক্রম করিয়া ভাবের অনুভূতি ঘরের হাওয়ায়, কাণের মধ্যে, প্রাণের মধ্যে বিরাট হইয়া জাগিয়া উঠে। খোলা দুয়ারের মধ্য দিয়া শিবানী নিরুদ্দেশ চোখের দৃষ্টিকে বাহিরের রাজপথে মুক্তি দিল—যতদূরে খুসী সে চলিয়া যায় অন্ধকার গহন পথে।

ঝম্ করিয়া অকস্মাৎ বাজনা বন্ধ হইয়া গেল, গানের পঙ্ক্তি মাঝখানে পড়িল ছিঁড়িয়া। আশ্চর্য্য হইয়া শিবানী পাশের ঘরের পানে কাণ ফিরাইয়া ভাবিল, একি!

"কলি!" রমেশবাবুর বজ্রস্বর কাণে আসিল, "এ সব গান শেখায় কে তোকে?"

বাবা যে কাছাকাছি কোথায় বসিয়া রহিয়াছেন, তাহা কল্যাণী জানিতেও পারে নাই; গানের মধ্যে কি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাও সে বুঝিল না। আচম্‌কা ধমকে ভয়ে ঘাবড়াইয়া গিয়া সে তাড়াতাড়ি বলিল, "ইস্কুলের একটা মেয়ের কাছে শিখেছি।"

"হুঁ!" গম্ভীরে হেমপ্রভাকে উদ্দেশ করিয়া রমেশ বলিলেন, "ইস্কুলে বসে এই সমস্ত গান? শিবুটার কি বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু নেই? এ সমস্ত allow করে কেন?"

কল্যাণী আর অগ্রসর হইতে সাহস করিল না, অর্গ্যান বন্ধ করিয়া চুপি চুপি উঠিয়া আসিল।

ঘরে বসিয়া শিবানী নিজের অন্যমনস্কতাকে তিরস্কার করিয়া

ভাবিল, তাহার ভুল হইয়া গিয়াছে। তখনই গিয়া কলিকে গান ভাঙাইয়া পড়িতে বসাইলেই ঠিক হইত, বাবার কাণে শিকলের ঝঙ্কার পশিয়া বিভীষিত করিবার অবসর আর হইত না। কলির উপর অনুকম্পা ভরে মনে মনে ভাবিল, বেচারী ছেলেমানুষ!

শেল্‌ফের উপর হইতে কাগজপত্র কতগুলি নামাইবার উদ্দেশ্যে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতেই কল্যাণী ঘরে ঢুকিয়া ডাকিল, "দিদি, দাদা তোমায় নীচে ডাক্‌ছে।"

নীচে ডাকিবার মানেই অনাত্মীয় সাঙ্গোপাঙ্গ কাহাকে যেন লইয়া আসিয়াছে—উপরে আসিবার যাহার বিধি নাই। শিবানী বুঝিল। কাগজগুলি যথাস্থানে সরাইয়া রাখিয়া বলিল, "আচ্ছা, তুমি এখন পড়তে বস গে' যাও। বুঝলে কলি, বাবার সাম্নে যখন তখন গান-টান বেশী কোরো না।"

"সত্যি দিদি, বাবা বক্‌লেন কেন বল তো? ওটা ভালো গান নয়?"

শিবানী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, গান ভালোই।"

নীচে নামিয়া বসিবার ঘরে আসিয়া দেখে, সুখেন্দু আর আজিজ্।

শিবানী একটুখানি হাসিয়া বলিল, "কি?"

সুখেন্দু লাফাইয়া বলিল, "আজিজ্ আজকে আমাদের খাওয়াবে দিদি!"

"সত্যি নাকি? কেন? ব্যাপার কি?"

আজিজ্ মৃদু প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "কিছুই নয়, বাণীদি। সুখু একটা আস্ত পাগল!"

সুখেন্দু তাহার দিকে ফিরিয়া ধম্‌কাইয়া বলিল, "ঈস্, না বল্লেই শুনছি নাকি? ছাড়াছাড়ি নেই আজ, আজিজ্ মিঞা।"

শিবানী বলিল, "হয়েছে কি, শুনি আগে।"

"ও একটা চাকরী বাগিয়েছে। খাসা চাকরী! তা আবার পেটে পেটে লুকিয়ে রেখেছিল, আমাকে বলে নি!"

আজিজ্ চট্ করিয়া বলিল, "দিদির আগে বল্‌ব কেন তোমাকে?"

"তা বেশ, ধরে তো ফেলেছি! এখন তোমার পকেট্‌টা হাতড়ে বান্ধব মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে বায়না দিয়ে আসি গে'। কেমন দিদি?"

শিবানী হাসিল। গরীব ছেলেটি, এত কষ্ট করিয়া পড়াশুনা করিতেছিল মানুষের দয়ার দানের উপর, এমন চট্ করিয়া পাঠ সাঙ্গ না হইতেই যে উপার্জ্জনের পথ খুলিয়া গিযাছে, এ বড়ই সুখের কথা। শিবানী মনে মনে ভারি তৃপ্ত হইল।

"কবে থেকে হল, আজিজ্?"

আজিজ্ বলিল, "এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার পেলাম সবেমাত্র আজ। জয়েন্ করিনি এখনও।"

"বেশ!"

সুখেন্দু বলিল, "টাকা আদায কর, দিদি।"

শিবানী বলিল, "তুই থাম্ তো।"

কিসের চাকরী, কোথায় চাকরী, কত টাকা—শিবানী খোঁজ করিল। আজিজ্ নিয়োগপত্রখানা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে

বাণীদি’কে দেখাইবে বলিয়াই। পকেট হইতে বাহির করিয়া টেবিলের উপরে রাখিল।

সুখেন্দু বলিল, “কি রকম বরাত দেখ, দিদি! লোকে আজকাল পাশ করে করেও একটা কাজকর্ম্ম পায় না, আর আজিজের ভাগ্যে খোদা একেবারে টপ্ করে অকালে পাকা মেওয়াটি হাতে এনে দিলেন!”

আজিজ্ হাসিয়া বলিল, “খোদা দিতে যাবেন কেন, গাধা? আজিজ্‌কে আর সুখুকে অসমপক্ষপাত করবার জন্যে খোদার দায় পড়েনি।”

শিবানী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “সত্যি আজিজ্, ধরেছ ঠিক।”

আজিজ্ বলিল, “বাণীদি, কথাটা ঠাট্টা করে হেসে হেসে বল্লাম বটে, কিন্তু সত্যি বল্‌তে কি, লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যায়।”

“তোমার লজ্জা কেন?”

“বাণীদি, আমি তো পরিষ্কার বুঝতে পারি—আইডিয়ালিজ্‌ম্ না থাকলে কোনও মানুষ বা কোনও জাত কখনও বড় হতে পারে না।”

ছেলেটির উদ্দীপ্ত মুখের উপরে আন্তরিকতার ছবি দেখিতে দেখিতে শিবানী সহানুভূতিভরে গম্ভীরমুখে বলিল, “এই সহজ কথাটা বুঝতে পারে, এমন মানুষ যদি আমার দেশবাসীর মধ্যে আর দু’একটি দেখতাম, বড় সুখী হতাম, আজিজ্। কিন্তু আমাদের হিন্দুমুসলমান নেতারা শিক্ষিত হয়েও না বুঝতে পারলে যে বড় আফশোষের কথা।”

আজিজ্ বলিল, “স্বাধীন হতে চায় কে? আপনারা চান্, মুসলমানরা হয় তো চায় না!”

সুখেন্দু বলিয়া উঠিল, “বল কি আজিজ্ সাহেব? তোমার মুখে এই কথা! তোমার জাতভাইরা—”

মোটেই না ক্ষেপিয়া আজিজ্ সহজভাবে বলিল, “তা করুক্।”

আবদুল আজিজের মুখের দিকে নিবিড়ভাবে চাহিয়া শিবানী স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বলিল, “তোমার সবচেয়ে বড় কাজ আজ কি, জানো আজিজ্? তোমার ভাইবোনদের মধ্যে এই জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করা—যে জাতীযতাবোধ তোমার বুকের মধ্যে জেগে উঠেছে মনের নিরর্থক অবিশ্বাস যতদিন তাদের না যায়, ততদিন কেমন করে বোঝাব তাদের যে তা নয়? এ কাজ পার তোমরাই আজিজ্—তোমরা যারা মুসলমানের মধ্যে প্রকৃত দেশপ্রেমিক। প্রাণপণ করে তাদের একবার উপলব্ধি করাও দেখি, যে তাদের স্বার্থ আর হিন্দুর স্বার্থ বিভিন্ন নয়! ভারতবর্ষ তাদেরও মাতৃভূমি; আমি তোমাকে আত্মীয় বলে যতখানি ভালোবাস্‌তে জানি, আফগানিস্থানের আমানুল্লা বা তুরস্কের কামালপাশা ততখানি ভালোবাসে না তোমাকে। এই কথাটা তাদের একবার নিঃসন্দিগ্ধ-ভাবে বুঝিয়ে দিতে পার যদি, তাহলে ভারতবর্ষের এমন কল্যাণ সাধন করা হ’বে, যা’ আজ ভাবতেও পার্চ্ছ না।”

আজিজ্ উত্তর না দিয়া সামনের দেযালের দিকে দীপ্ত দুই চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিল।

শিবানী বলিল, “এ ভার তোমার আজিজ্।”

নিজের অগোচরে আজিজের মুখখানা লাল হইয়া উঠিল।

সুখেন্দু একটা কাগজ টানিয়া পেন্সিল দিয়া হিজিবিজি দাগ কাটিতে কাটিতে অতিগাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল, "আমি কিন্তু বাপু খাবারের লিষ্টি করছি, আমার ভেতরকার মানুষটি অসহ্য ক্ষিদেয় ক্ষেপে উঠেছে।"

১৪

নিরালা পল্লীভবনের কোল হইতে বিভা আসিয়া পড়িয়াছে মহানগরীর বুকে। সেখানে নিস্তব্ধ, শূন্য গৃহপ্রাঙ্গণের কোণে একা নিজেকে লইয়া ছিল ব্যস্ত, শূন্যতা তাহাতে আরও বিরাট হইয়া উঠিত, আজ এখানে লোক-সংঘটের সংস্পর্শে সে শূন্যতা ভরিয়া উঠিতেছে; সেখানে কর্ম্মহীন মন্থর জীবনধারা কেবলই পিছনের আনন্দময় দিনগুলির দিকে চাহিয়া হাহাকার করিতে চাহিত, এখানে নূতন কর্ম্মকোলাহলের বৈচিত্র্য সাম্‌নের পানে অবিরত টানে। পিতার বিচ্ছেদস্মৃতি, মায়ের বেদনার ছবি ক্ষণতরে চোখের অন্তরাল হইয়া মন বাহিরের দিকে ভুলাইয়া রাখে। দিনে দিনে বিভার মনটা যেন সজীব হইয়া উঠিতেছে।

এত শীঘ্র যে তাহার জীবিকার্জ্জনের পথ সুগম হইবে, তাহা সে নিজেও আশা করিতে সাহস করে নাই। দুঃখ যিনি দেন, তিনি দুঃখ অপনোদন করিতেও জানেন—এ বিশ্বাস আজ বিভার মনে একেবারে গাঁথিয়া বসিয়াছে। নহিলে বৎসরের শেষভাগে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর কাজ জুটিয়া যাওয়া একরকম

অসম্ভবই ছিল—বিশেষতঃ তাহার পক্ষে,—কলিকাতা হইতে দূরে পল্লীপ্রান্তে সহায়সম্বলহীন অনতিবিদুষী একটি বালিকা মাত্র সে। ক্ষেমদাসুন্দরীও তাহাই ভাবেন। অশ্রুসজল ম্লানমুখে মেয়েকে যেদিন কোলের কাছ হইতে বিদায় দিয়া কলিকাতার কর্ম্মজগতে পাঠাইয়া দিলেন, সেদিন তাঁহার ভাগ্যবিধাতাকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন না করিয়া পারিলেন না, আব আশীর্ব্বাদ করিলেন মনে মনে ব্রতীকে। মানুষের জীবন নিয়মন করেন বিধাতা, তাহাতে স‌ংশয় নাই, কিন্তু উপলক্ষ্য হইতে হয় মানুষকেই। হাত পা গুটাইয়া চক্ষু বুঁজিয়া বসিয়া থাকিলে কোনও ভাগ্যই খোলে না। চেষ্টা চাই মানুষেব। কিন্তু তাঁহাব নিঃসহায জীবনের পক্ষ হইয়া চেষ্টা আজ কে করে, যদি না ঐ পরের ছেলে ব্রতী থাকিত? প্রাণ ভরিয়া ব্রতীকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে ক্ষেমদার মনের কোণে অলক্ষিতে আরও কত কি আশা উঁকি মারে।

সেই যে প্রথম দিন বিভাকে তুলিয়া লইতে ব্রতীন্দ্র ষ্টেশনে আসিয়াছিল, তাহাকে হোষ্টেলে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া চলিয়া গেল, তারপরে এ যাবৎ দেখা নাই। না—আর একদিন আসিয়াছিল বটে, সেদিন বিভা স্কুলের কার্য্যভার গ্রহণ করে, সেইদিন। প্রধান শিক্ষয়িত্রীর কাছে পরিচয় করাইয়া তাহাকে স‌ঁপিয়া দিয়া ব্রতীন্দ্র সেখান হইতেই বিদায় লইয়া আফিসে চলিয়া গিয়াছে, এই পর্য্যন্ত। বিভা মনে মনে ভাবে, একা সে এই অপরিচিতপ্রায় বিপুল নগরীর মধ্যে কোথায় কি ভাবে পড়িয়া আছে, একটা খবর লওয়াও কি ব্রতীদার উচিত ছিল না? যদি তাহার একটা জরুরী

প্রয়োজন ঘটিত, যদি তাহার গুরুতর অসুখ করিত? হোষ্টেলে মেয়েরা আছে বটে, তবু বিপদে আপদে একান্ত প্রয়োজনে আপনার জন কেহ জিজ্ঞাসা না করিলে কি হয়? হঠাৎ বিভার মনে পড়িয়া যায়, ব্রতীদাই বা তাহার আপনার জন কিসে হইল? তাইতো, সে তো তাহার কেউ নয়! ব্রতীদা তাহার সহজ অনুকম্পা ও কৃতজ্ঞতাভরে তাহাদের জন্য যতটুকু করিতেছে, তার বেশী দাবী করিবার ধৃষ্টতা তাহার কেন হয়? ছিঃ!

হোষ্টেলে কতক আছে ছাত্রী, কতক শিক্ষয়িত্রী—বয়সের তারতম্য বিশেষ কিছুই তাহাতে ঘটে নাই। সবাই একত্র মিলিয়া গল্প, পরচর্চ্চা ও হাসিকৌতুক করে। বিকালে জনকয়েক মিলিয়া একসঙ্গে চা ও জলখাবার খাইতেছে। একটি মেয়ে আর একটির লম্বা বেণীটা লইয়া তাহার পিঠের উপর চাবুক মারিতেছে; বিরক্ত হইয়া সে বলে, "ধ্যেৎ, কি লাগিয়েছিস্? ছাড় বলছি!" চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া যে মেয়েটি একটু একটু করিয়া চুমুক দিতে দিতে ততক্ষণে নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছে, সে আর সবাইকে তাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "চল্ চল্, এবারে আড্ডা ভেঙ্গে চট্ করে কাপড়-চোপড় পরে নে'। বায়োস্কোপের টিকেট্ বন্ধ হয়ে যাবে যে!"

বিভা বাহিরের দিকে অন্যমনস্ক হইয়া চাহিয়া রহিল, কতজনে কত জায়গায় যায়—বায়োস্কোপে, থিয়েটারে, কার্নিভালে। তাহার পয়সাও নাই, সখও নাই। ওদের বাবা আসে, দাদা আসে, কাকা আসে, তাহারাই আদর করিয়া বেড়াইতে লইয়া যায়;

তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবার কেহ নাই। তা হউক না, একাকী জীবনই বা মন্দ কি ?

নীচে হইতে একটি মেয়ে আসিয়া বলিল, "বিভাদি, তোমার ভিজিটার এসেছে।"

তাহার আবার ভিজিটার কে ? একেবারেই অপ্রত্যাশিত। বিভা গাত্রোত্থান করিয়া ঘরে ঢুকিল—সরাসরি নীচে নামিয়া গেল না। দেওয়ালের গায়ে যে বড় আয়নাটা টাঙানো আছে, তাহাতে আপাদমস্তক প্রতিবিম্ব পড়ে। বিভা সেই দিকে চাহিয়া মাথার চুলটা একটু টানিয়া হাত দিয়া ঠিক করিয়া লইল। শাড়ীর আঁচলটা চাবীর গোছাসুদ্ধ কাঁধের উপর দিয়া ঘুবাইয়া তারপরে আগ্রহভরে লঘুপদে নীচে আসিয়া দেখে—ব্রতীদা।

ব্রতীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছ ?"

"ভালোই !"

"কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো ?"

"না।"

"মেয়েদের সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে বেশ ?"

"হুঁ।"

"মার কাছে রীতিমত চিঠিপত্র লিখ্‌ছ তো ? তিনি তোমার জন্যে ব্যস্ত আছেন খুব।"

"হ্যাঁ, লিখি মাঝে মাঝে।"

ব্রতীন্দ্র একটু চুপ করিল। বিভাও কোনই কথা বলে না। কি বা বলিবে ? ব্রতীদা কর্তব্যের খাতিরে যাহা যাহা

জানিতে চায়, তাহার উত্তর দেওয়ার বাহিরে আর বলিবার আছে কি ?

ব্রতীন্দ্র বেঞ্চের উপর বসিয়া দেয়ালে ঠেস্‌ দিয়া বলিল, "অনেক-দিন থেকেই একবার আস্‌ব আস্‌ব মনে করছি, হয়ে ওঠেনি কোন মতেই।"

বিভা কিছু বলিল না।

ব্রতীন্দ্র বলিল, "সময় পাইনে কি না একেবারে !"

"এত কি কাজ তোমার ?"

"এই তো দশটায় অফিসে যাই, ফিরি পাঁচটায়। শীতের বেলা, আর কি থাকে কিছু ?"

"ছুটির দিনে ?"

ব্রতী বলিল, "ছুটির দিনেও আবার আর পাঁচ রকমের কাজ এসে হয়তো জোটে ! এই তো আজ রবিবার পেয়েই চলে এলাম তবু !"

বিভা মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিল, ইতিমধ্যে অন্ততঃ ছয়টা রবিবার পার হইয়া গিয়াছে। মুখে বলিল, "আজকেও একটা কাজ জোটাতে পারলে না ?"

ব্রতী এক মুহূর্ত্ত আশ্চর্য্য হইয়া, হাসিয়া বলিল, "রাগ করেছ, বিভা ?"

বিভা খানিকটা লাল হইয়া উত্তর দিল, "রাগ কর্ত্তে যাব কেন ? তোমার সময়ের টানাটানি, সেইজন্য বল্‌ছিলাম।"

"টানাটানি—সেকথা সত্যিই। কিন্তু সেজন্যে ভাবনা কোরো

না। কাজের ভীড়ে সর্ব্বদা তোমার এখানে আস্‌তে না পারলেও তোমার খোঁজখবর আমি সর্ব্বদাই নিচ্ছি।"

"সূক্ষ্মদৃষ্টি দিয়ে নাকি ?"

ব্রতী হাসিয়া বলিল, "তা ঠিক নয়। তবে নিই যে, সেকথা ঠিকই। আচ্ছা, বল দেখি, সপ্তাহখানেক আগে তোমার একটু অসুখ করেছিল কি না—একটু সর্দ্দিকাশি ?"

বিভা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কি করে জানলে ?"

সেকথার উত্তর না দিয়া ব্রতী জিজ্ঞাসা করিল, "এখন একেবারে ভালো হয়ে গেছ তো ?"

বিভা কুতূহলী হইয়া বলিল, "হুঁ।—বল না, কে বল্লে তোমায় ?"

ব্রতী বলিল, "যেই বলুক, ব্রতী-দা তোমায় কল্‌কাতার সহরে এনে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ভুলে বসে নেই, সে বিশ্বাস হল তো ? যাক্‌, সাবধানে থেকো, ঠাণ্ডা-টাণ্ডা লাগিও না বেশী।"

ব্রতীন্দ্র দুয়ারের দিকে তাকাইয়া ছিল। একদল মেয়ে সকৌতুকে উঁকি দিতে দিতে দরজার পাশ দিয়া সরু পথটা অতিক্রম করিয়া ওদিকে চলিয়া গেল। চক্ষু ফিরাইয়া আনিয়া ব্রতী জিজ্ঞাসা করিল, "ইস্কুলের কাজ কেমন লাগ্‌ছে ?"

"মন্দ নয়, বেশ !"

"মেয়েরা মানে তো তোমাকে ?"

বিভা বলিয়া উঠিল, "কেন মান্‌বে না ?"

ব্রতী একটু হাসিয়া বলিল, "তুমি বড্ড ছেলেমানুষ কিনা, তাই।"

"ছেলেমানুষ কিসে হলাম ? ঈস্‌ !

ব্রতীন্দ্র আবার জিজ্ঞাসা করিল, "হেড্‌মিস্‌ট্রেস্‌কে কেমন লাগে?"

"খুব ভালো।"

"ভাব হয়েছে?"

"ভাব কি করে হবে? একে তো হেড্‌মিস্‌ট্রেস্‌ মানুষ, তায় আবার বেজায় গম্ভীর! বেশী ঘেঁস্‌তে ভরসাই হয় না যে!"

"তাই নাকি?"

ব্রতীন্দ্র কুয়াসাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চাহিয়া একটু পরে বলিল, "আজকে উঠি, কেমন? কিছু দরকার টরকার আছে তো বল।"

বিভা মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, কিছু দরকার নেই।" থাকিলে সে নিজেই সারিয়া লইতে পারিবে, ব্রতীদাকে বিরক্ত করিতে যাইবে কিসের জন্য? ব্রতীদা কাজের লোক, বহুকষ্টে সময় করিয়া যদি বা আজ আসিয়াছে, তাও পনেরো মিনিটের বেশী বসিবার অবসর হইল না। তাহাকে অনর্থক ত্যক্ত করা কেন?

ব্রতী উঠিয়া বলিল, "কোনও কিছু অসুবিধে হলেই আমাকে জানিও কিন্তু।"

বিভা ভ্রূ দুইটি একটু টানিয়া আস্তে বলিল, "কি করে জানাবো, বলে যেও। ঠিকানাও তো দিয়ে যাওনি!"

"দিই নি বুঝি? আচ্ছা দিচ্ছি। কিন্তু চিঠি লিখবার দরকার নেই—লিখো না। আমি নিজেই আস্‌ব মাঝে মাঝে, প্রায়ই,—তখনই জেনে যাব।"

এ পর্য্যন্ত ব্রতী যেরূপ প্রায়ই আসিয়াছে, তাহা বিভার জানা

আছে, ভবিষ্যতেও সেইরূপই প্রায়ই আসিবে, ইহাও মনে মনে বুঝিয়া লইল। কিন্তু সে কথা লইয়া প্রতিবাদ না করিয়া সে বলিল, "তোমার যদি অসুখবিসুখ করে, আস্তে না পার? তখন চিঠি লিখে খোঁজ নেব না?"

ব্রতী হাসিয়া বলিল, "ভয় নেই, আমার অসুখ অত সহজে হবে না।"

বিভা দ্বিরুক্তি না করিয়া ব্রতীন্দ্রকে বিদায় দিয়া উপরে চলিয়া আসিল। ঘরের জানালাগুলির একটা পর্দ্দা খানিকটা সরাইয়া সামনের বাড়ীগুলির দিকে অন্যমনে চাহিয়া রহিল। কুয়াসাধূসর আকাশের প্রান্ত অন্ধকারে কালো হইয়া আসিয়াছে, তাহারই বুকে ঝিক্‌মিক্ বাতিগুলি কি সুন্দর! জনবিরল গলির পথের মৌন-মাধুরীর মধ্যেও কি প্রাণময় সজীবতা! এতদিন চোখে পড়ে নাই কেন, আশ্চর্য্য!

দুইটি মেয়ে গল্প করিতে করিতে ঘরে ঢুকিল।—"এই যে বিভা। তোকে খুঁজছিলাম। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কি কর্চ্ছিস্?"

"কিছু না।" বলিয়া বিভা ফিরিয়া আসিযা তাহাদের দলে যোগ দিল।

রেণু জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁরে ভাই, উনি কে এসেছিলেন তোর কাছে?"

বিভা বলিল, "কেন? আমার ভিজিটার একজন!"

সঙ্গিনী ঠাট্টা করিযা বলিল, "রূপ দেখে রেণুর একেবারে তাক্ লেগে গেছে কিনা, তাই!"

রেণু বলিল, "অকপটে স্বীকার করছি—লজ্জা নেই কিছুমাত্রই। তা হোক্, ভিজিটার তো বুঝেচি, কিন্তু তোর কে হন রে বিভা ?"

বিভা মনে মনে গর্ব্বিত হইয়া জবাব দিল, "দাদা।"

"নিজের দাদা ?"

বিভা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "না, এম্‌নি।"

রেণু সঙ্গিনীর দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "বলেছিলাম কিনা ?"

১৫

সকালবেলা ঘুম না ভাঙ্গিতেই কাগজওয়ালা হাত বাড়াইয়া বৈঠকখানার মেঝের উপর দৈনিক খবরের কাগজখানা ফেলিয়া দিয়া যায়। রমেশবাবু শয্যা হইতে উঠিয়াই চায়ের টেবিলে বসিয়া সর্ব্বাগ্রে কাগজখানা পড়িতে বসিয়া যান। দিনের কাজের সূত্রপাত হয় ইহা দিয়া। শীতের সকাল, ঠাণ্ডা কন্‌কনে হাওয়া। কাণ অবধি ঢাকা গরম কোটের বর্ম্মভেদ করিয়াও যেটুকু শীতের স্পর্শ গায়ে গিয়া পৌছায়, সেটুকু নিতান্ত মন্দ লাগে না। খোলা পূবের জানালা দিয়া যে রৌদ্রখণ্ড টেবিলের ঠিক নীচে আসিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সেখানে পা দুইটিকে একত্র রাখিয়া উত্তপ্ত করিতে করিতে রমেশবাবু চায়ের পেয়ালায় একবার করিয়া চুমুক দেন, আর চক্ষু দুইটি থাকে কাগজের অক্ষরগুলির উপর।

অবিনাশবাবু সহাস্যবদনে আসিয়া দুয়ারে দেখা দিলেন।

রমেশ চশ্‌মার ফাঁক হইতে চক্ষু তুলিয়া বলিলেন, "আসুন, আসুন, একেবারে সক্কালবেলা যে?"

শালের প্রান্তভাগ গুটাইতে গুটাইতে চেয়ারে বসিয়া অবিনাশ বলিলেন, "এদিকে একটি রুগী দেখে ফিরছিলাম কি না!"

রমেশ উদ্দেশ্যে হেমপ্রভাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আর এক পেয়ালা চা দিতে বলতো হে!" তারপরে হাতের পেয়ালাটা নামাইয়া জমকালোভাবে বসিয়া বলিলেন, "আজকের টাট্‌কা খবরটা শুনেছেন তো?"

"কি? না!—বলুন দেখি!"

রমেশ সোৎসাহে ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের প্রধান পৃষ্ঠাটা বিস্তৃত করিয়া টেবিলের উপর মেলিয়া ধরিলেন, "এই যে!"

বড়লাট চলিয়াছেন দিল্লীতে। আগে পিছে পথ পরিষ্কার করিয়া স্পেশাল ট্রেণখানি নিশ্চিন্তমনে বেগে ছুটিয়াছে প্রায় নিজামুদ্দিনের কাছাকাছি। এ হেন সময়ে অতর্কিতে রেল-লাইনের মাঝখানে বোমা ফাটিয়া উঠিল। অবশ্য ক্ষতি কিছু হয় নাই। এদিকে কংগ্রেস নেতারা দলে দলে সব সমবেত হইতেছেন লাহোরে লাজপৎ নগরে। অকস্মাৎ এই বোমাবিস্ফোরণের সংবাদ তাঁহাদের মাঝখানেও যেন বোমাবিস্ফোরণ ঘটাইল, কংগ্রেসমণ্ডলী তটস্থ হইয়া উঠিয়াছেন। দেশী বিদেশী সমস্ত সংবাদপত্রগুলি আজ একযোগে বড় বড় হেড্‌লাইনে তাহাই ছাপিয়াছে।

অবিনাশবাবু এক নিঃশ্বাসে বিবরণটা গিলিয়া লইলেন, "তাইতো, এযে বিরাট কাণ্ড!"

সুখেন্দু, কল্যাণী ও শিবানী পাশের খাবার ঘরে বসিয়া প্রাতরাশ চালাইতেছে। কেন যে এই সকালবেলার খাওয়ার সময় পিতাকে তাহারা একঘরে করিয়া রাখে, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সুখেন্দু বলে, বাবার কাগজ পড়ার ব্যাঘাত হয়, আসলে মনে মনে জানে, বাবা কাগজপ্রসঙ্গে রাজনীতিক মন্তব্য আরম্ভ কবিলে তাহাদেব পক্ষে সেগুলি হজম করা শক্ত হইয়া পড়িবে, সঙ্গে সঙ্গে উপাদেয় প্রাতরাশটিও বদ্‌হজম হইবার আশঙ্কা।

সুখেন্দু দিদির দিকে তাকাইয়া মুখভঙ্গিমা করিয়া বলিল, "এইঃ সেরেছে! বোমাও পড়ল, অবিনাশবাবুও এসে হাজির! আজ এখানে টেঁকাই দায় হবে।"

অবিনাশবাবু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "দিনে দিনে এ হচ্ছে কি? এ যে একেবারে climax!"

সুখেন্দু এদিকে বসিয়া টিপ্পনী কাটিয়া বলিল, "কিন্তু, এই আমার বেজায় আফশোষ—"

অর্দ্ধেকখোলা কবাটের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শিবানী ঠোঁটের উপর তর্জ্জনী ঠেকাইয়া বলিল, "চুপ্ চুপ্!"

রমেশবাবু উত্তর দিলেন, "climax আর বলি কি করে? হার্ডিঞ্জ সাহেবের কথা মনে নেই? কিন্তু মজাটা দেখলেন তো? খুন হওয়া তো দূরের কথা, জখমও নয়, এমন কি, যাঁর জন্যে বোমা ফেলা হল তিনি তার বিন্দুবিসর্গ পর্য্যন্ত জান্তে পেলেন না, খাবাব কামরাটা একটু নড়ে উঠল শুধু। হোঃ হোঃ হোঃ!"

অবিনাশ বলিলেন, "হবে কেন? ওদের হচ্ছে charmed life!"

রমেশ বলিলেন, "এই সামর্থ্য নিয়ে করবেন এঁরা দেশোদ্ধার!"

"হেঃ হেঃ হেঃ! বলি, ঢাল নেই, তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দ্দার! করতে যাচ্ছেন সব ইংরেজের বিরুদ্ধে সমরাভিযান! ছোকরাগুলোর কি যে হল?"

মাখন-মাখানো একটুকরা রুটি মুখে পূরিয়া সুখেন্দু চিবাইতেছিল। গব্ করিয়া সেটা গলাধঃকরণ করিয়া উত্তেজিত হইয়া আপন মনে গজ্ গজ্ করিতে লাগিল।

শিবাণী বলিল, "চুপ সুখু, ওঁরা শুন্তে পাবেন কিন্তু।"

"উঁহু। তুমি যাই বল তাই বল, আজ আমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে ঝগড়া একবার করবই!"

"করে লাভ? ওঁদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে স্বদেশী দলে টানবার আশা রাখিস্ নাকি?"

সুখেন্দু পরম তাচ্ছিল্যভরে ঠোঁট বাঁকাইযা বলিল, "ফুঃ! ওদের টান্‌ব স্বদেশী দলে—ঐ স্বার্থপর, কাপুরুষদের? সেজন্যে মোটেই নয়! কিন্তু ওদের যুক্তিহীন, বুদ্ধিহীন, লজ্জাহীন, দম্ভ আমি সহ্য করতে পারিনে—কোনমতেই না। আমার সারা গা ঘেন্নায় রী রী করে!"

রমেশ হাসিয়া অবিনাশকে বলিলেন, "হবে আর কি? আধখানা ভাঙ্গা পিস্তল আর দুটো পটাস্‌বাজি দিয়ে স্বরাজ তো তড়্‌তড়্ করে এনে ফেল্লে বলে! কাল্‌কের বোমার শব্দে হোয়াইট্ হল্‌টা ভেঙ্গে পড়েছে কিনা, রয়টারের তারের প্রতীক্ষায় আছি!"

অবিনাশ হাসিয়া উঠিলেন, "হেঃ হেঃ হেঃ!!!"

হেমপ্রভা ঘরে ঢুকিলেন, "শিবুর খাওয়া হল ?"

"কেন, মা ?"

"আমি যাচ্ছি ভাঁড়ারে। উনি একটুবাদে একবার বেরুবেন। মার্কেটের ঐ জিনিষগুলোর লিষ্টিটা আর টাকা সেই সঙ্গে দিয়ে দিস্, বুঝলি ? এই চাবীটা রাখ্।"

কলি বলিয়া উঠিল, "আমার ব্যাগের কথা লিখে রেখেছ তো, মা ?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ।" বলিয়া হেমপ্রভা তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন।

সুখেন্দু ডিমের শাঁসের উপরে মরিচের গুঁড়া ছড়াইতে ছড়াইতে পাশের ঘরে কাণ দিল। অবিনাশ বলিলেন, "খাম্‌খা এই সমস্ত নষ্টামি করে দেশটাকে দশবছর পেছু হটিয়ে দিলে।"

রমেশবাবু অবজ্ঞাভরে টেররিজ্‌মের উদ্দেশে কটূতিক্তকষায় মিশাইয়া টিপ্পনী কাটিতে কাটিতে যখন চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন, ততক্ষণে সুখেন্দু খাওয়া শেষ করিয়া রুমালে হাতমুখ মুছিয়া বসিয়া আছে, আর কলির বেণীটা ধরিয়া দোলাইতেছে। অবিনাশ রমেশের কাছ হইতে কাগজটা চাহিয়া লইয়া বলিলেন, "এখান থেকেই পড়াটা সেরে যাই।"

শিবানী ঘরে ঢুকিয়া দেরাজ খুলিয়া পিতাকে টাকাপয়সা ইত্যাদি বুঝাইয়া দিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কয়েকটা জামাকাপড় গুছ্‌গাছ্ করিতে মন দিল। রমেশ সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতেছিল—পায়ের শব্দ সুখেন্দুর কাণে গেল। জুতার শেষ মস্‌মস্ অস্ফুট হইয়া মিলাইয়া যাইতেই তড়াক্ করিয়া চেয়ার ছাড়িয়া সুখেন্দু সশব্দে

পাশের ঘরে ঢুকিয়া ডাকিল, "ডাক্তার বাবু, আপনাকে disturb কর্তে এসেছি কিন্তু।"

অবিনাশবাবু আপ্যায়ন সহকারে হাসিয়া বলিলেন, "কেন, ব্যাপার কি? পড়াশুনো কেমন চল্‌ছে?"

"চল্‌ছে ভালোই। কিন্তু শুনুন, দেশটাকে দশবছর পিছু হটিয়ে দিলে কেমন করে, আমাকে বুঝিয়ে দিন তো?"

অবাক্ হইয়া অবিনাশ বলিলেন, "বল্‌ছ কি?"

স্নখেন্দু বলিল, "বলছি ঐ টেররিষ্টদের কথা—ঐ বড়লাটের গাড়ীর বোমা—"

"ও, সেই কথা? আহা, সেটা বুঝতে পারো না,—এমনি করে যেখানে সেখানে বোমা পিস্তল ছুঁড়ে রাজ-পুরুষদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুল্‌লে গভর্ণমেণ্ট শেষকালে repressive measure নেবে না? দায়ে পড়েই যে নেবে! তাতে লাভটা হবে কি দেশের? এক লাট মরলে তো লাটের গদি আর শূন্য থাকছে না, এদিকে যেটুকু বা রিফর্ম্‌স্ এর আশা ছিল, তাও রেগে গিয়ে ইংরেজেরা দেবে বন্ধ করে! এ তো সোজা কথা!"

"আর চুপচাপ থাকলে দুহাতে রিফর্মস্ ছড়িয়ে দেবে, কি বলেন ডাক্তারবাবু? কি বল দিদি?"

শিবানী পিছন ফিরিয়া আলমারীর দেরাজ ঘাঁটিতে ব্যস্ত। কোনও উত্তর করিল না। অবিনাশবাবু স্নখেন্দুর ঔদ্ধত্য দেখিয়া মনে মনে একটু চটিলেন। কিন্তু সে ছেলেমানুষ, অপরাধ মার্জ্জনা করাই সমীচীন, কাজেই বলিলেন, "দেখ, টেররিজ্‌ম্ দিয়ে কখনও

কোনও দেশ স্বাধীন হয় না। ইতিহাস-টাতিহাসের খোঁজখবর রাখ কিছু ? কি কোর্স নিয়েছ—আই-এ না আই-এসসি ?"

সুখেন্দু দমিবার ছেলে নয়। তাহার ইতিহাসের খর্ব্বতাকে ইঙ্গিতে কটাক্ষপাত করায় সে আরোই শক্ত হইয়া উঠিল; বলিল, "আই-এস্‌সি নিলেও ইতিহাস আমি পড়ি কিছু কিছু।"

"বেশ বেশ, ভালো কথা, তাহলে তো সহজেই বুঝতে পারছ—টেররিজ্‌ম্‌ কোনকালেই স্বাধীনতা আনেনি কোথাও, আন্তে পারেই না। ও সব উষ্ণমস্তিষ্কের পাগলামি।"

সুখেন্দু একটু উগ্র হইয়া বলিল, "শীতলমস্তিষ্কের Constitutional agitationএ স্বাধীনতা এনেছে কোথাও, দেখাতে পারেন ? হাতজোড় করে, ভিক্ষে মেগে ? আপনাদের ইতিহাসে কি বলে ডাক্তারবাবু ?"

"দেখ, তোমরা ছেলেমানুষ—যা বোঝ না, তা নিয়ে তর্ক কোরো না!"

"বুঝি না বলেই তো আপনাদের মত সুবিজ্ঞ লোকদের কাছ থেকে বুঝতে চাই! এতে হবে না, ওতে হবে না—এ তো রোজই দু'কাণ ভরে শুনছি, শুন্তে শুন্তে হদ্দ হয়ে গেলাম। কিসে হবে, সেইটে একবার সোজা ভাষায় বাৎলে দিন না! তাহলেই তো দেশসুদ্ধু কৃতার্থ হয়ে যায়!"

শিবানী দেরাজ বন্ধ করিয়া বলিল, "আমার নীচের ঘর থেকে বইগুলো নিয়ে এসে আমার ঘরে গুছিয়ে রাখ্‌ গে' না যা ?"

সুখেন্দু কর্ণপাত না করিয়া অবিনাশকে বলিল, "বলুন, ডাক্তারবাবু!"

শিবানী জোর দিয়া বলিল, "যা সুখু, বল্‌ছি!"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সুখু অগত্যা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। দিদি যে বচসা থামাইবার জন্যই মাঝখানে আসিয়া বাধা দিয়াছে, তাহা সে বুঝিয়াছে।

অবিনাশ বলিলেন, "সুখুকে একটু কেমন কেমন ঠেক্‌ছে যেন!"

শিবানী একটু হাসিয়া বলিল, "বড্ড বেয়াড়া!"

"আপনারা একটু নজর রাখবেন ওর ওপর। দিনকাল ভালো নয়, বলা তো যায় না!"

"সে তো নিশ্চয়ই!

১৬

বৎসরের প্রথম দিনটি। ভোরের ঘন কুয়াসা পাৎলা করিয়া দিয়া তরুণ সূর্য্য হাসিয়া যখন মুখ বাড়াইল, হোস্টেলের তরুণী অধিবাসিনীদের চোখে তখন উৎসবের রং ধরিয়া গিয়াছে। বৎসরের আজ নূতন উষা, কিন্তু তাহাদের সপ্তাহব্যাপী ছুটির আজ শেষ। আজিকার দিবসটিকে আনন্দে পরিপূর্ণ সার্থকতা না দিতে পারিলে বৃথাই গেল। গতকাল হইতেই জল্পনা কল্পনা করিতে করিতে প্ল্যান্ সব ঠিক হইয়া আছে। প্রথম বেলায় মেয়েরা স্বহস্তে রাঁধিয়া বাড়িয়া ভূরিভোজনের আয়োজন, তারপরে অপরাহ্ণে দল বাঁধিয়া

'লেকে' বেড়াইতে যাইবে। কেহ কেহ তাহাতে রাজি নয়, তাহারা পৃথকভাবে নিজ নিজ ভাইপো, বোনপো, সেজদা, মেজদা, অমুক-দার সঙ্গে বায়স্কোপে বা অন্য কোথাও যাইবার জন্য বেশী উদ্গ্রীব। বিভা রহিল প্রথম দলেই।

সমস্তদিন নাচানাচি হুড়াহুড়ির মধ্যেই কাটিয়া গেল। অফুরন্ত কাজের উদ্যম লাগিয়াই আছে। বিভা আর তিনটি মেয়ের সঙ্গে মিলিয়া বেলা দশটা হইতে একটা পর্য্যন্ত উনানের কাছেই কাটাইয়া দিয়া অবশেষে আসিয়া ভোজনান্তে যখন বিছানায় গা দিল, চোখের পাতা ঢলিয়া আসিতে আর তিলেক বিলম্ব সহিল না।

বিকালবেলা ঘুম ভাঙিতে তাই আজ দেরী হইয়াছে। চারটার সময় বেড়াইতে বাহির হইবার কথা। অথচ সাড়ে তিনটায় বীণা আসিয়া যখন ধাক্কা দিয়া তাহার ঘুম ভাঙাইয়া দিল, তখন বিরক্ত হইয়া বহুকষ্টে চোখ রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে সে বলিল, "আঃ, কি করিস্?"

"কাপড়-চোপড় পরতে হবে না? ওঠ্ শীগ্‌গিব। এদিকে আবার ভিজিটার এসে বসে বয়েছে যে তোব!"

তড়াক্ করিয়া বিভা খাটের উপর উঠিয়া বসিল।

বীণা বলিল, "চট্ করে দেখাশুনো সেবে আয়। দেবী করিস্‌নে ভাই। আমরা ততক্ষণে রেডি হয়ে নিচ্ছি।"

"কটা বাজ্‌ল রে?" শুধাইয়া বিভা উত্তরেব অপেক্ষা না রাখিয়াই মুখ ধুইতে চলিয়া গেল।

ব্রতীন্দ্র এত শীঘ্রই আবার দেখা করিতে আসিয়াছে বিশ্বাস হয়

না। দুইমাস অন্তর একটিদিন আসিলেই যথেষ্ট। কিন্তু বিভা নীচে গিয়া দেখিল, আসিয়াছে সে-ই বটে! খুসী ঢাকিতে না পারিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ?"

"সুখবর আছে। তোমার টিউশানি একটা যোগাড় করেছি।"

"সেইজন্যে ?"

"হুঁ। অবশ্যি মাস ছয়েকের জন্যে আপাততঃ।"

বিভার মুখের হাসি ইতিমধ্যে অস্পষ্ট হইয়া মিলাইয়া আসিয়াছে। নিতান্ত সাধারণভাবে বলিল, "তা বেশ তো! তাই বা মন্দ কি ?"

"না, মন্দ নয়। অনেক দিক্ দিয়ে কাজটা ভালোই। আস্‌ছে সপ্তাহ থেকেই আরম্ভ কর্ত্তে পার।" বলিয়া ব্রতী সবিস্তারে কাজের স্থান কাল পাত্র এবং বেতন ইত্যাদির বিবরণ জানাইয়া দিল।

বিভার আপত্তি করিবার কিছুই নাই। সে-ই এবিষয়ে ব্রতীন্দ্রকে অনুরোধ করিয়াছিল এবং সে মনে কবিয়া যত শীঘ্র সম্ভব তাহা পূরণ করিয়া দিল। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই মনে আসিতে পারে না। কিন্তু তবু বিভা উৎফুল্ল হইতে পারিল না। ব্রতীদার এই যত্নশীল কর্ত্তব্যপরায়ণতাই তাহাকে কেমন একটু আঘাত করে। তাহার ছোটবড় সমস্ত প্রয়োজনের দিকেই ব্রতীদার দৃষ্টি সজাগ এবং এত বেশী সজাগ যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত আর সব কিছুই যেন ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। প্রয়োজন না হইলে সে আসে না, প্রয়োজন না মনে করিলে কথা বলে না। অভিভাবকের মত সর্ব্বদাই কেবল তাহার সুখসুবিধার হিসাবনিকাশ

লইয়া ব্যস্ত! এমন মুরুব্বিয়ানা করিতে তাহাকে কে বলে? ওদের সঙ্গে যেসব ছেলেরা দেখাসাক্ষাৎ করিতে আসে, তাহারা তো এরকম নয়। কত কথা বলে, কেমন হাসিগল্প করে—মেয়েদের কাছেই নিত্যই সে শোনে!—মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া বিভা উত্তর দিল, "বেশ, তাই যাব—আস্‌ছে সোমবার থেকে। তুমি নিয়ে যাবে তো প্রথমদিন?"

ব্রতী বলিল, হ্যাঁ।"

গোটাকতক বাজে ঘরোয়া কথা বলিয়া কহিয়া ব্রতীন্দ্র সাঙ্গ করিল, "এখন আসি তাহলে, কেমন?"

সংক্ষেপে বিভা জবাব দিল, "এসো।"

চলিবার উদ্যোগ করিয়াই ব্রতী আবার একটু থামিয়া দাঁড়াইয়া মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাকে আজ্‌কে কেমন দেখাচ্ছে যেন,—শরীর খারাপ করেনি তো?"

অবেলায় খাইয়া, কুম্ভকর্ণের মত ঘুমাইয়া এবং অকালে সে-ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়া চোখমুখ তাহার হয়তো অস্বাভাবিক হইয়া রহিয়াছে, ইহাই অনুমান করিয়া বিভা শাড়ীর আঁচল দিয়া কপালের কাছটা ঘসিতে ঘসিতে বলিল, "না হয়নি কিছু, এমনি। বড্ড শ্রান্ত লাগ্‌ছে।"

"সারাদিন কেবল স্কুলের কাজ নিয়ে বসে থেকো না কিন্তু। ওতে সহজে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। শরীর তো বেশী ভালো নয় তোমার। মাঝে মাছে বাইরে বেড়াতে-টেড়াতে যেও, বুঝলে?"

বিভা সূক্ষ্ম অনুযোগের সুরে বলিল, "বেড়াতে কে নিয়ে যায়, বল ?"

"নিয়ে আবার যাবে কে ?" কল্‌কাতায় তো মেয়েরা পথে ঘাটে সর্ব্বত্র নিজেরাই বেড়ায় !"

"আমি ও রকম একা একা পারিনে বাপু !"

ব্রতীন্দ্র হাসিয়া বলিল, "কেন ? ভয় করে ?"

"করেই তো ! আমি কি পথ ঘাট চিনি সব ? স্কুলে যাই আর আসি, এই পর্য্যন্ত।"

ব্রতী মাথা দোলাইয়া বলিল, "এদ্দিন বসে সহরটা চিনে নিতে পারলে না ? ছি—ছি !"

বিভা রাগ করিয়া বলিল, "আচ্ছা বেশ !"

মিনিটখানেক চুপ করিয়া থাকিয়া ব্রতীন্দ্র সোজা ফিরিয়া দাঁড়াইল, "যাবে ? চল তাহলে, আমার সঙ্গে চল, বেড়িয়ে নিয়ে আসি।"

বিভা একেবারেই অবাক্ হইল। সত্যসত্যই ব্রতীদা তাহাকে বেড়াইতে লইয়া যাইবে ? ইস্, তাহার সময় কই ? বুকটা আনন্দে নাচিয়া উঠিতে না উঠিতেই কোথা হইতে একটা অভিমান আসিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। ঠোঁট দুইটি একবার একটু চাপিয়া বলিল, "না, দরকার নেই।"

"দরকার নেই মানে ?"

বিভা শুধুই দাঁড়াইয়া রহিল, কিছুই বলিল না।

ব্রতী জিজ্ঞাসা করিল, "শরীর যদি খারাপ না থাকে তো যাবে

না কেন ? আমি তো সময় পাই না জানই, আজ তবু নিয়ে যেতে পারি। চল।"

ভাববৈচিত্র্যহীন এই সাদাসিধা কথাগুলির উপরে আর রাগ করিবে কি বলিয়া, বিভা ভাবিয়া পাইল না। অভিমান যে বোঝে না, তাহাব উপরে অভিমান করিয়া ঠকিতে যায় পাগলে। তবু মনটা তাহার একান্ত অবাধ্য ও অবোধ, তবু অকাবণে খোঁচা খায়।

বিভা অনায়াসে আজ বলিতে পারিত, আজ তাহার এখনই মেয়েদের সঙ্গে 'লেকে' যাইবার কথা, সুতরাং আজ আর ব্রতীন্দ্রকে কষ্ট স্বীকার করিতে হইবেনা, আর একদিন যেন সে আসিয়া বেড়াইতে লইয়া যায়। কিন্তু এই সোজাকথায় বুঝাইয়া দিতে কিছুতেই তাহার মন সরিলনা। মনে মনে খসড়া করিয়া সে বলিল, "তুমি না নিয়ে গেলে আমি যেতে পারিনা বুঝি ?"

"তাহলে তো ভালো কথাই।"

এত সহজে অনুমতি পাইয়া বিভা মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিল। নিমেষ মধ্যে অভিমান সরাইয়া ফেলিয়া ছেলেমানুষের মত আদর ও আবদার মিশাইয়া ব্রতীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "সত্যি নিয়ে যাবে ব্রতীদা ? সময় হবে তোমার ?"

"কিছু সময় আছে আপাততঃ।"

"তাহলে—"

"যাবে ?"

"হুঁ।"

ব্রতী উঁচু বেঞ্চিটার একপ্রান্তে অর্দ্ধেক আসন লইয়া বলিল, "এই বস্‌লাম আমি, তুমি তাহলে তৈরী হয়ে এসো।"

"আচ্ছা" বলিয়া বিভা দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। চঞ্চলপায়ে উপরে উঠিতে উঠিতে কেবলই সে মনে আনিতে চেষ্টা করিল, আজ নূতন বৎসরের ভোরবেলাতে চোখ মেলিয়া কোন্ মেয়েটির মুখ সে প্রথম দেখিয়াছিল।

বীণা ও রেণু তাহাকে দেখিয়াই তাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "এখনও হলনা তোর? তোর জন্যে দেরী হয়ে যাচ্ছে সক্কলের। আমরা অনেকক্ষণ থেকে সবাই তৈরী।"

"আমার জন্যে দেরী কোরোনা ভাই। তোমরা বেরিয়ে পড়। আমি আজ যাবনা।" বলিয়াই বিভা ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

আশ্চর্য্য হইয়া বন্ধুযুগল পিছন পিছন ঘরে আসিয়া বলিল, "যাবিনা! হল কি? তোরঙ্গ হইতে পাৎলা নীল রঙের একখানা শাড়ী টানিয়া বাহির করিতে করিতে বিভা পিছনে না তাকাইয়াই উত্তর করিল, আমি অন্যদিকে যাচ্ছি।"

হঠাৎ দিক্‌পরিবর্ত্তন?"

বিভা কথা না বলিয়া তাড়াতাড়ি গায়ে ব্লাউজ আঁটিতে ব্যাপৃত হইয়া পড়িল। রেণু সহসা জিজ্ঞাসা করিল, "তোর সেই দাদা এসেছেন বুঝি?

মুখ নীচু করিয়া বোতাম লাগাইতে লাগাইতে বিভা সংক্ষেপে বলিল, "হাঁ।"

খিল্ খিল্ করিয়া রেণু হাসিয়া উঠিল।

বিভা বলিয়া উঠিল, "হাসবার কি হ'ল ?"

সেকথার উত্তর না দিয়া রেণু বলিল, "তাঁর সঙ্গেই এখন বেরুনো হচ্ছে বুঝি ?"

বিভা রাগিয়া উত্তর দিল, "হুঁ।"

সঙ্গিনীর হাতটা টিপিয়া রেণু হাসিতে হাসিতে বলিল, "তাহলে বুঝেচি।" কৃত্রিম দীর্ঘনিঃশ্বাস টানিয়া, "চল্ বীণা চল্, আমরা সরে পড়ি।

রাগ দমাইতে না পারিয়া বিভা বলিল, "কেন, হয়েচে কি ? তোমরা যাওনা তোমাদের দাদাদের সঙ্গে বেড়াতে ?"

"তা—তো যাই।" বলিয়া পরস্পর হাসিয়া মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে করিতে রেণু ও বীণা অন্তর্ধান করিল; বলিয়া গেল, "তাহলে আমরা বেরিয়ে পড়তে পারি তো ?

বিভা মনে মনে ভাবিল—স্বচ্ছন্দে! মুখে বলিল, "হ্যাঁ।"

মেয়ের দল যখন বাড়ী হইতে রাস্তায় নামিয়াছে, ব্রতীন্দ্রও বিভাকে লইয়া তখনই নামিল। সরু গলিটার এক পাশ ঘেঁসিয়া ব্রতীন্দ্র কোনরকমে লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিল। কুতূহলী মেয়েগুলি, বিশেষতঃ রেণু, একবার অপাঙ্গে চাহিয়া দেখিল তাহার সুগৌর এবং সুগম্ভীর দীর্ঘ দেহকান্তির দিকে, আর তাহার পাশেই কাঁধ অবধি লম্বা তাহাদের তরুণীসঙ্গিনী তন্বী নীলাম্বরা বিভাকে। বিভা ভুলেও তাহাদের দিকে চোখ ফিরাইলনা, কিরকম এক লজ্জায় মরিয়া গিয়া ভাবিল, মাগোঃ, মেয়েগুলি যেন কি!

খানিকটা সামনে আসিয়া ব্রতীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাবে ?"

বিভা বলিল, "যেখানে তোমার খুসী !"

"তাহলে 'লেকে' চল।"

অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া বিভা বলিয়া উঠিল, "না না, ওখানে নয়।"

"কেন ?"

"উঁহু, আমাদের মেয়েরাও 'লেকে' যাচ্ছে যে !"

"তাতে কি ?"

"না না, ওরা আমায় ঠাট্টা করবে ?"

ব্রতী হাসিয়া বলিল, "বাঃ ! একজনরা গেলে আর একজনদের যেতে নেই ? ঠাট্টার কথা কি আছে এতে ?"

বিভা শঙ্কিত হইয়া জিদ্ ধরিল, "না ব্রতীদা, ওখানে নয় কিছুতেই !"

অগত্যা ব্রতী বলিল, "আচ্ছা থাক্।"

বড় রাস্তায় পড়িয়া ব্রতী এস্প্ল্যানেডের ট্রাম ধরিল।

হু হু করিয়া ঘাসের লাইনের উপর দিয়া ট্রামগাড়ী ছুটিয়া চলে ; দুই পাশে সারি বাঁধা ঝাউগাছগুলির সরুপাতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাতাস শিহরণ তোলে, আলোড়ন তোলে, আর আকুল মর্ম্মরধ্বনি জাগায় —শন্ শন্, শোঁ শোঁ। সেই বনের গন্ধে মেশা শীতল হাওয়া তীব্র হইয়া ছুটিয়া আসে বিভার চোখে, মুখে, গালে আর চুলে। ব্রতীর পাশে বসিয়া জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া সে সব ভুলিয়া গিয়া

শুধুই অনুভব করিতে লাগিল—বড় কোমল স্পর্শ, বড় মিষ্ট, বড় তীব্র! গায়ের ছোট্ট শালখানা আরও টানিয়া গায়ে জড়াইল।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের শাদা চূড়া অস্পষ্ট কুয়াসায় ঢাকা, তার পরে শাদা দেয়ালে ঘেরা মস্ত পুকুরটা, তার পর খোলা মাঠে বিলাতী মেয়েরা হকি খেলা করে,—একে একে সব ছাড়াইয়া জন-বহুল এস্‌প্ল্যানেডের মধ্যখানে গাড়ী যে আসিয়া গতিরুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা তাহার খেয়াল হইল, যখন ব্রতী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "নামো।"

কর্জ্জন গার্ডেন অতিক্রম করিয়া ব্রতীন্দ্র সোজা রাস্তায় পড়িয়া ফুটপাথ ধরিয়া বরাবর হাঁটিয়া চলিল পশ্চিমে রেড্ রোডের দিকে।

"হাঁট্‌তে কষ্ট হচ্ছেনা তো, বিভা?" খানিক পরে ব্রতী জিজ্ঞাসা করিল।

"না।"

সন্ধ্যার নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে গড়ের মাঠের বুকের মধ্য দিয়া কতক্ষণ দুইজনে কতদূর অবধি যে হাঁটিযা চলিয়াছে, একজনেও পরিমাণ করিবার কথা মনে আনে নাই। ব্রতী আপনার মধ্যে তন্ময় হইয়া সুদূর সম্মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া নীরব; বিভা আপনাকে হারায় নাই, অজ্ঞাত প্রাণস্পন্দনে আরও সজীব হইয়া উঠিয়াছে, হাসিতে কথায় গানে নিজেকে এই মুহূর্ত্তে ছড়াইয়া দিতে পারিলে যেন সে বাঁচে,—কিন্তু ব্রতীদার মৌন ভাঙ্গিতে কোনমতেই সাহস হইতেছেনা। সুতরাং স্তব্ধ হইয়া আছে দুইজনেই; একমনে

চলিতেছে শুধু। ব্রতীদা আজ তাহার এত কাছে, এত নিভৃতে, এমন একান্ত আপনার,—অথচ এমন দুস্তর দূরত্ব বিভা আর কখনও বুঝিতে পারে নাই। সাগরের মর্ম্মমাঝে চাঁদ দোলা দিতে থাকে, অথচ উচ্ছলিত ঢেউগুলির মহাকাশ পার হইয়া সে চন্দ্রলোকে পৌঁছিবার উপায নাই। কেন নাই? বিভার ইচ্ছা হইতেছে ব্রতীদাকে একবার প্রশ্ন করে, কেন নাই?

কতক্ষণ পরে বিভা বলিল, "বস্‌ব একটু, ব্রতীদা।"

"পা ধরে গেছে বুঝি?"

"হুঁ।"

গড়ের মাঠের প্রায় শেষপ্রান্তে কেল্লার কাছাকাছি বড় অশ্বত্থ গাছটার তলায নিবিড়তর ঘনান্ধকারের মধ্যে বিভাকে বসিতে দিয়া ব্রতীন্দ্র বসিল।

বিভা ধীরে ধীরে ভয়ে ভয়ে বলিল, "তুমি চুপ করে থাক কেন, ব্রতীদা?"

ব্রতী হাসিয়া বলিল, "কি বলবে, বল?"

"কিচ্ছু না।"

কেল্লার সামনে দিয়া কিছুদূরে উল্লসিত স্বরে শিষের ধ্বনি শোনা গেল। নীরবে চক্ষু মেলিযা ব্রতী একবার ছায়ান্ধকার ভেদ করিয়া তাকাইয়া দেখিল। গুটি তিনচারেক লম্বা লম্বা সাহেবী ছায়ামূর্ত্তি চোখে পড়িতেই বিভা ব্রতীন্দ্রের গা ঘেঁসিয়া বসিয়া সভয়ে মৃদুস্বরে ডাকিল, "ব্রতী-দা!"

"কি হল?"

"ঐ গোরাসৈন্য আস্‌ছে !"

"ভয় কর্চ্ছে ?"

"ও বাবা, আমি ওদের যা ভয় করি !"

অল্প দূরে দূরে মাঝে মাঝে দুই চারিটি লোকজন বেড়াইতেছে। ব্রতীন্দ্র তাহাদিগকে দেখাইয়া দিয়া বলিল, "ঐ তো কতলোক ঘুরছে, ওদের তো কৈ ভয করছেনা ?"

"ওরা যে পুরুষমানুষ !"

ব্রতী বলিল, "আমিও একটা পুরুষমানুষ তোমার সঙ্গে রয়েছি তো ?"

গোরা সৈন্যগুলি এপাশ দিযাই ঘুরিয়া ফিরিতেছে দেখিয়া আরও ভয় পাইয়া বিভা বলিল, "তুমি একলা মানুষ, ওদের সঙ্গে কি করে পারবে ? ঐ দেখনা, ওরা এদিক দিয়েই আস্‌ছে !"

ব্রতী একটু হাসিয়া উত্তর দিল, "আসুক না আগে, পারি কিনা পরে দেখো।"

ব্রতীন্দ্রের বলিষ্ঠ বিশাল দেহখানার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বিভার অকস্মাৎ তাঁহার বুকের মধ্যে গিয়া লুকাইতে ইচ্ছা হইল।

গোরা সৈন্যদের অদৃশ্যমান, অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর ছায়ামূর্ত্তি-গুলির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ব্রতী বলিল, "তুমি অত ভীরু হলে কেন, বিভা ?"

"মেয়েমানুষের ভয় একটু থাকেই। থাকা ভালোও।"

ব্রতীন্দ্র বলিল, "মেয়েমানুষ মাত্রেরই ভয় থাকে না। থাকা ভালোও নয়। সন্ধ্যেবেলা একা এই গড়ের মাঠে আস্‌তে ভয় পায়

না, সন্ধ্যের পরে অনেক রাতেও গোরাসৈন্যদের পেরিয়ে ঐ শেষ মেমোরিয়ালটার ওদিক্ পর্য্যন্ত নিঃশঙ্কচিত্তে একা চলাফেরা করে, এমন মেয়েমানুষও আছে, তা জান ?”

“তা মেমসাহেবরা কর্ত্তে পারে, তাদের কথা কি ?”

“মেমসাহেব নয় বিভা, তোমারই মত বাঙ্গালী মেয়ে।”

বিভা অবিশ্বাসের সুরে বলিল, “ইস্ !”

ব্রতী জোর দিয়া বলিল, “হ্যাঁ, সত্যি।—আর দেখ, মেমসাহেবরা যা পারে, তোমরাই তা পারবে না কেন বল তো ? মেমসাহেবদের চেয়ে তোমরা কি ছোট ? কিসে ছোট ?”

“ছোট হতে যাব কেন ? কিন্তু ওরা হচ্ছে স্বাধীন জাত, রাজার জাত—ওদের কেউ কিচ্ছু বলে না।”

ব্রতী আস্তে একটু মাথা নাড়িয়া বলিল, “হুঁ।—স্বাধীন জাতের মর্য্যাদা আছে তাহলে, বল্‌তে হবে !”

“তা আবার নেই ?”

“বুঝতে পার ?” ব্রতী অন্ধকারে বিভার মুখের দিকে তাকাইল।

বিভা বলিল, “না পারব কেন ?”

“ভালো কথা।—কিন্তু আসল ব্যাপার কি জান ? ওরা রাজার জাত বলে ভয়ে কেউ ওদের গায়ে হাত দেয় না, সেটা ততটা কারণ নয়, যতটা কারণ হচ্ছে ওদের স্বাধীনতার দরুণ ওদের মনের স্বাভাবিক নির্ভীকতা। ওদের যে জাতিগত একটা সাহসিকতা আছে, তোমাদের তা নেই, কারণ তোমরা সবরকমে অধীন।

রাষ্ট্রিক অধীনতা আমাদের জাতসুদ্ধ নির্বীর্য্য করে ফেলেছে—কি ছেলে, কি মেয়ে,—তার ওপরে সামাজিক অধীনতা তোমাদের দেহমনকে রেখেছে আরও চেপে।"

বিভা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া উত্তর করিল, "তা হতে পারে। কিন্তু যে কারণেই হয়ে থাক্, এখন মোট কথা আমাদের ওরকম সাহস দেখানো সাজে না। ওটা দুঃসাহস। দেখছ না, পথে ঘাটে নিত্যই কত কি সব কাণ্ড ঘট্‌ছে? বাবাঃ!"

ব্রতী একটু হাসিয়া বলিল, "জোঁকের একটা ধর্ম্ম আছে কি জানো—যে ওকে বেশী ভয় করে, গন্ধ শুঁকে শুঁকে ও ঠিক তাকেই গিয়ে কামড়ে ধরে। ভয় তোমরা যতই করবে, বিপদ ততই বেশী হানা দেবে। বুঝলে?"

"সে তুমি যতই বল, ব্রতীদা, অত সাহস আমি কোনদিন ক'রতে পারব না।"

"কোনদিন্ না?"

"উঁ—হুঁ।" বলিয়া বিভা একটা ঝরা পাতা পায়ের কাছ হইতে কুড়াইয়া লইয়া ছিঁড়িতে লাগিল।

ব্রতী বলিল, "এত ভয় নিয়ে তোমার উপায় হবে কি বল তো? এযে মানুষের জীবনের সবচেয়ে উৎকট ব্যাধি।"

"তোমার কাছে থাকলে আমার একটুও ভয় করে না।" বলিযা ফেলিয়াই বিভা ভয়ানক লাল হইযা আনত মুখখানা আরও মাটির কাছে নামাইয়া আনিয়া পাতার ছেঁড়া টুক্‌রাগুলি ঝাড়িয়া

ফেলিতে ব্যস্ত হইল। ভাগ্যিস্ অন্ধকার! ব্রতীদা দেখিতে পায় নাই!

ব্রতীন্দ্র আর কোনও কথা বলিল না। বুঝিল, বিভা প্রায় আরোগ্যের বাহিরে।

১৭

পাঁচটার সময় ইস্কুল হইতে বাড়ী ফিরিয়াই টেলিফোনযোগে জরুরী আহ্বান পাইয়া শিবানী মিসেস্ আগরওয়ালের বাড়ী গিয়াছিল, ফিরিল এইমাত্র। আজ আর বিকালবেলা খাইবারও অবসর পায় নাই। এতক্ষণে বিশ্রাম পাইয়া শিবানী আসিয়া বারান্দায় বেতের টেবিলটার সামনে চেয়ারে বসিল। হেমপ্রভা সযত্নে তাহার খাবার আনিয়া সাজাইয়া দিলেন।

কতগুলি চিঠিপত্র আসিয়া জমিয়াছিল, শিবানী এক একখানা করিযা খুলিয়া পড়িতে লাগিল। মা বলিলেন, "খেয়ে নে আগে, ও পরে হবে।"

সুখেন্দু সান্ধ্যভ্রমণ সারিযা সকাল সকাল বাড়ী ফিরিল— পরীক্ষা আসিয়া পড়িয়াছে, এখন না পড়িলেই নয়। সিঁড়ির মুখে উঠিয়াই বলিতে বলিতে আসিল, "নীচে যাও দিদি, তোমার কাছে লোক এসেছে।"

মা বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "একি জ্বালা বাপু? রাতদিন কেবল লোক, লোক, লোক! একটু খেতে শুতেও দেবে না নাকি? বল্ গে' যা—এখন ওর সময় নেই।"

শিবানী বলিল, "বল, যাচ্ছি।"

"এত কারা আসে বাবা বুঝি না!" মা নিজের মনেই বলিলেন।

কমলালেবুর সরবতেব গ্লাসটায় চুমুক দিতে দিতে শিবানী হাসিয়া বলিল, "রাগ কর কেন, মা? বোঝ না, ইস্কুলে মেয়ে ভর্ত্তির হিড়িক লেগে গেছে যে আজকাল! কত লোক উমেদারীতে আস্‌বে! ফেব্রুযারী অবধি এই রকমই চল্‌বে।"

মা বলিলেন, "আ—র ফেব্রুয়ারী, জানুয়ারী! মানুষ আসার বিরাম তো কোনকালেই দেখি না বাপু!"

শিবানী একটু হাসিয়া উত্তর দিল, "এত আসে না।"

"চাকরীটা ছেড়ে দিতে পারিস্, শিবু? দরকার কি সখের চাকরী করে অত পরিশ্রমে? এতে তো শরীর টিঁকবে না দেখছি!"

শিবানী কথা না বলিয়া একমনে খাওয়া শেষ করিযা উঠিল।

ভেজানো কবাটখানা মৃদুহাতে খুলিয়া ফেলিয়া শিবানী বসিবার ঘরে আসিযা দাঁড়াইল। দেখিল, ব্রতীন্দ্রবাবু আনতমুখে বসিয়া আছেন।

"ও, আপনি!"

ব্রতীন্দ্র মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে ডেকেছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

আস্তে আসন গ্রহণ করিযা শিবানী গম্ভীরমুখে বলিল, "ভেবেছিলাম—আপনাকে একটা বিষয়ে অনুযোগ করব। কিছু মনে করবেন না।"

ব্রতীন্দ্র সঠিক কারণটি না বুঝিয়া ঠোঁটের প্রান্তে একটু হাসিয়া বলিল, "করুন!"

শিবানীর প্রশান্ত চক্ষু দুইটির নিবিড় উজ্জ্বলতার দিকে চাহিয়া থাকিয়া ব্রতীন্দ্র বুঝিতে চেষ্টা করিল ইহার অর্থ কি?

শিবানী বলিল, "সেদিনের ওই ঘটনাটির প্রচেষ্টা কারা করেছে, জানেন?"

ব্রতী সম্পূর্ণ সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া ধীরভাবে চাহিয়া বলিল, "সেকথা জান্তে চাইবার অধিকার আপনার আছে কি?"

"আমি মনে করি—আছে।"

"আমি মনে করি—নেই।"

শিবানী এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল। কপালের ঘনায়মান কুঞ্চনরেখাগুলিকে ভ্রূর একটি অদ্ভুত ইঙ্গিতে মুছিয়া ফেলিয়া সোজা তাহার চোখের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমি যদি বলি—ঐ প্রচেষ্টা বাংলাদেশ থেকে, তাহলে অস্বীকার করবেন?"

ব্রতীন্দ্র একেবারে অবাক্ হইল। জিজ্ঞাসুচোখে মুখের পানে চাহিয়া গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "একথা আ[illegible]র কেন মনে হল?"

"অস্বীকার করেন?"

মনে মনে স্থির হইয়া ব্রতী এবার পরিষ্কার জবাব দিল, "না।"

ব্রতীন্দ্র মনে মনে একান্ত বিস্মিত ও অপ্রতিভ হইয়া ঠোঁট দুইটি পরস্পর সম্বদ্ধ করিয়া মুখ একটু নামাইয়া ভাবিতে লাগিল।

"ব্রতীবাবু, সংযোগ যখন একবার আমাদের দু'য়ের মধ্যে

হয়েছে, তখন পরস্পরের অগোচরে বড় একটা কাজের দায়িত্ব একা কেউ নিতে পাবে না, নেবার অধিকার নেই।”

ব্রতীন্দ্র প্রতিবাদ করিল। তর্কবিতর্ক চলিল অনেকক্ষণ, কিন্তু কেহ কাহাকেও ভুল স্বীকার করাইতে পারিল কিনা সন্দেহ। শিবানী অবশেষে বলিল, “আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না।”

ব্রতী বলিল, “পারবেন। ভেবে দেখুন।”

শিবানী খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, “তা দেখব।—কিন্তু আরও কথা আছে। সেইটেই বেশী প্রয়োজনীয়।”

ব্রতী কথা না বলিয়া প্রতীক্ষমাণ হইযা মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

শিবানী বলিল, “কথাটা হচ্ছে মত ও কর্ম্মপদ্ধতি নিয়ে। যে কাজটা আপনারা করালেন, তার যথাযোগ্যতা সম্বন্ধে আমার সংশয় আছে। আপনি তো জানেন, লোকে আমাদের সন্ত্রাসবাদী বল্লেও আমরা সন্ত্রাসবাদী নই!” আর অগ্রসর না হইযা শিবানী ব্রতীন্দ্রের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ব্রতীন্দ্র একটু হাসিয়া জবাব দিল, “আপনিও জানেন নিশ্চয়, আমরাও তা নই?—অর্থাৎ একটি দুটি লাট-বেলাটের ওপর বোমা ছুঁড়ে ভারত স্বাধীন হবে, সে ভরসা আমরা রাখি না। কিন্তু এই যে ট্রেনের বোমা, এর কারণ ও উদ্দেশ্য বোধহয় অন্য রকম।”

“বলুন, শুনি।”

“এর উদ্দেশ্য ছিল বোধহয় শুধু কংগ্রেসের প্রাক্কালে একটা ভারতব্যাপী sensation তৈরী কর্ত্তে, যাতে কংগ্রেসের সভায়

অহিংসার ক্রীড্ বদ্‌লাবার একটা সুযোগ পাওয়া যায়। কংগ্রেস-ওয়ালারা এবং অন্যান্য অনেকে মিলে যে এই উপলক্ষ্যে একটা বড় রকমের নাড়া দিয়েছিল, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। শেষ পর্য্যন্ত সবাই চুপ করে গেল বটে, কিন্তু যেটুকু সাড়া কংগ্রেসমহলে পড়েছে এ ব্যাপারে, সেটুকুও আনাদের কম লাভ নয়। দেশকে এবং দেশের মুখপাত্র কংগ্রেসকে এমনি করে বারবার ধাক্কা দিয়েই মতি ফেরাতে হবে।"

কপাল-ছোঁওয়া চুলগুলির উপর বামহাতখানি ঠেকাইয়া শিবানী মেঝের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এরূপ অনুমান সে করে নাই।

একটু পরে গম্ভীরভাবে বলিল, "হু।"

"আপনি ভেবে দেখবেন—এই প্রচেষ্টাটি আপনাদের মত-পথের অনুযায়ী হয়েছে।"

শিবানী উত্তর দিল না।

"আর কিছু বল্‌বার আছে?"

শিবানী বলিল, "আপাততঃ নেই।"

"আর কোনও অনুযোগ নেই তো আমার ওপর?"

শিবানী একটু হাসিয়া বলিল, "না।"

ব্রতীন্দ্র নমস্কার করিয়া উঠিয়া পড়িল।

বাহির হইয়া ব্রতী বরাবর মেসে ফিরিয়া গেল না। কাজ ছিল ডালহৌসী স্কোয়ারে। সোজাসুজি সেইদিকে রওনা হইল। ইডেন গার্ডেনের কাছে আসিয়া ট্রাম হইতে নামিয়া পড়িয়া কি ভাবিয়া

পদব্রজে চলিল রাস্তার জনকোলাহল এড়াইযা অন্ধকার বনপথের মধ্য দিয়া। নিকষকালো আকাশের সহস্র নক্ষত্রচক্ষু হইতে ক্ষীণ জ্যোতি অস্পষ্ট আলো ফেলিয়াছে, আর চারি পাশের বিলাতী ফুলের রাশির মাঝে তুই চাবি গুচ্ছ গন্ধপুষ্পের ক্ষীণতর সৌরভ ভাসিয়া আসিতেছে। আসন্ন কাজের ভাবনায় মনটা আচ্ছন্ন হইযা থাকিলেও ব্রতীন্দ্রের কেমন ভালো লাগিল। শিবানীর অনুযোগ ও অভিযোগগুলিকে যথাযথ ভাবে খণ্ডিত করিতে পারিয়া মন তাহার তৃপ্তিতে হাল্‌কা লাগিতেছে। শিবানী মেয়ে সহজ নয়। ব্রতী আশ্চর্য্য হইযা মনে মনে ভাবিল, নারী দূরের কথা, পুরুষ সহকর্মীদের মধ্যেও এমন পরিষ্কার চিন্তাশক্তি ও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার ক্ষমতা সে কমই দেখিয়াছে। মধ্যে তাহার সমকক্ষতা দাবী করিবার সাহস এ পর্য্যন্ত বড় কাহারও একটা হয় নাই, কিন্তু শিবানীর কাছে প্রথম হইতেই তাহাকে অতিমাত্রায় সতর্ক থাকিতে হইতেছে। আকাশের দিকে চাহিতে নক্ষত্রের দ্যুতি দেখিয়া ব্রতীর চোখেব সামনে শিবানীর অত্যুজ্জ্বল চোখের তারা ফুটিয়া উঠিল। কী যে অসাধারণ একটি দীপ্তি! হাসির স্নিগ্ধতা, গতিব গৌরব-ভঙ্গিমা, সব কিছু অতিক্রম করিয়া দর্শকের মস্তিষ্কেব মধ্যে জাগিযা থাকে কেবল ঐ আযত চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি। আশ্চর্য্য!—ব্রতী ভাবিতে ভাবিতে চলিল।

১৮

দেখিতে দেখিতে গোটা দুই মাস কাটিয়া গেল। এ কয়দিন চক্ষুকর্ণ বন্ধ করিয়া যথাসম্ভব নিবিষ্টচিত্তে পাঠাগারে নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়া সুখেন্দু কোনও রকমে পরীক্ষা-পর্ব্ব সাঙ্গ করিয়া বাঁচিয়াছে। এবার আর তাহার নাগাল পায় কে? পড়ায় অবহেলা লইয়া দিনরাত কেবল গঞ্জনা করিয়া ফিরিবার সুযোগ হইতে এবার মাকে কিছুদিনের মত বঞ্চিত করা গেল। পরীক্ষার শেষদিন বাড়ী ফিরিয়াই বইএর রাশি কোণ-ঠেসা করিয়া রাখিয়া প্রথম সম্ভাষণেই মাকে গিয়া যে বলিয়া রাখিয়াছে, "এবার কিন্তু আমি একবার কলকাতার বাইরে বেড়াতে বেরুবো, মা! না বল্‌তে পাবে না।"

মাসখানেক যাইতে-না-যাইতেই সুখেন্দুর মাথার মধ্যে আবার ভ্রমণের সাধ মাথা জাগাইয়াছে। হেমপ্রভা ভাবিয়াছিলেন, খেয়ালের ঝোঁকে ছেলে যে প্রস্তাবটা করিয়াছিল, তাহা নিশ্চয় এতদিনে ভুলিয়া চাপা পড়িয়া গিয়াছে। কারণ এ কয়দিনে আর সে বিষয়ে উচ্চবাচ্য কিছুই শোনা যায় নাই। বন্ধুবান্ধবদের সাথে মিলিয়া মহাস্ফূর্ত্তিতে এ কয়দিন চলিয়াছে কেবল গড়ের মাঠ, পিক্‌নিক্ আর বায়োস্কোপ—অন্ততঃ বাড়ী আসিয়া সুখু মহাসমারোহে মার কাছে এই ত্রিবিধ গল্পই করিয়াছে। কিন্তু আসল কথাটি সে কিছুতেই ভোলে নাই। মার নিশ্চিন্ততার ব্যাঘাত জন্মাইয়া আজ আবার ঠিক সময়মত বেড়াইবার প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়া বসিল।

হেমপ্রভা দুপুরবেলা একটি ব্লাউজ তৈরী করিতে বসিযাছিলেন। সুখেন্দু নিরুদ্দেশ্যভাবে ঘরে আসিয়া ঢুকিল। মার পিছনে ইজিচেযারটার উপরে হাত পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি করছ, মা ?"

মা বলিলেন, "দেখতেই তো পাচ্ছিস্।"

সুখু কাঁধের উপর দিযা একটু ঝুঁকিয়া দেখিয়া বলিল, "হুঁ, ব্লাউজ হচ্ছে বুঝি ? কলির জন্যে—না ? সে আমি বুঝতে পেরেছি আগেই। তুমি কলিকে বড্ড বেশী আবদেরে করে তুলেছ, মা ! লেখাপড়া ওটার কিছু হবে না,—কেবল ফ্যাশানের দিকে ঝোঁক !"

"হয়েচে, হয়েচে ! তোর আর সর্দ্দারী কর্ত্তে হবে না। নিজে আগে পাশ করে বেরোও তো দেখি,—কলির কথা আমি বুঝ্ব।"

"ইঃ, আমি পাশ করব না ? করবে কে শুনি ?"

মা কথা বলিলেন না, সেলাইয়ের কলটা ঘুরাইয়া চলিলেন।

সুখু আবার বলিল, "আমি যে তোমাকে চারখানা রুমাল তৈরী করে দিতে বলেছিলাম ?"

"ক' ডজন রুমাল লাগবে বাবুর, শুনি ? এই তো সেদিন আধ ডজন কিনে আনা হল ! বেটাছেলের আবার অত কি ?"

সুখেন্দু রাগিয়া উঠিল ; বিলাসিতা সে কোনকালে করে না, তবু মা রোজ রোজ তাহাকে অপবাদ দেয় ! বলিয়া উঠিল, "সেকি আমার জন্যে কিনেছি নাকি ?"

"তবে আবার কার জন্যে ?"

সেকথার উত্তর না দিয়া সুখু বলিল, "তুমি দিনরাত কেবল

আমার সঙ্গে বকাবকি কর মা! তাই তো আমি তোমাকে মোটে ভালবাসি না!"

মা হাসিয়া ফেলিলেন, "বকাবকি কি আর সাধে করি? করি তোর চরিত্তির দেখে!"

সুযোগ বুঝিয়া সুখেন্দু অভিমান দেখাইয়া বলিল, "কলির চেয়ে আমার চরিত্তির খারাপ হল কিসে? আসল কথা, তুমি আমায় দেখ্‌তে পার না, আমি না থাক্‌লেই বাঁচ।"

"ষাট্, বালাই! ওকি কথা? ত্থাখ, তুই একটু শান্তশিষ্ট হতে শেখ্ দেখি? বড়-সড় হয়েছিস্, এখনও ছেলেমি যায় না কেন?"

সুখেন্দু চট্ করিয়া ইজিচেয়ারের উপর পা দুইটি তুলিয়া আসন করিয়া গুড়ি-সুড়ি বসিয়া বলিল, "এই যে, দেখ মা—শান্তশিষ্ট হয়ে বসেছি, ফিরে দেখ!"

হেমপ্রভা ছেলের ভঙ্গী দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

সুখেন্দু বুঝিল, মায়ের মেজাজটা কিছু হাল্‌কা হইয়াছে। খানিকক্ষণ পরে ডান হাতটা বাড়াইয়া মার স্কন্ধ-বিলম্বিত অঞ্চল-প্রান্তের চাবীর গোছাটা নাচাইতে নাচাইতে বলিল, "বাবাকে বলেছিলে, মা?"

"কি?"

"ঐ-যে!"

"কি আবার?"

"সেই যে বলেছিলাম তোমাকে বেড়াতে যাবার কথা!"

হঠাৎ আবার বেড়াইতে যাওয়ার প্রস্তাবে মা মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। সামনে থাকিলে দিনের মধ্যে হাজার বার ছেলেকে তিরস্কার গঞ্জনা করিবার বাধা না হইলেও চোখের বাহিরে দিনেকের জন্যও ছাড়িয়া দিতে তাঁহার মন উঠে না। একটিমাত্র ছেলে ঐ আদরের দুলাল; সময়ে অসময়ে তাহার উদ্ধত অবাধ্যতায় ত্যক্ত হইয়া 'পেটের শত্তুর' বলিয়া গালি দিলেও মনে মনে মা জানেন—ও বুকের মাণিক। বুকের মধ্যে লুকাইয়া অতি সাবধানে পাহারা না দিলে পাছে কে কাড়িয়া লইয়া যায়, এই ভয়ে আজ পর্য্যন্ত একাকী একদিনের তরেও বিদেশে পা ফেলিতে দেন নাই। বাবার কার্য্যোপলক্ষে বাংলাদেশের অনেকগুলি সহরেই সপরিবার বসবাস করিবার সুযোগ ঘটিয়াছে, এই পর্য্যন্তই সুখেন্দুর আঠারো বছরের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। কিন্তু ইহাতে সুখেন্দুর মন তৃপ্তি মানে না। ইহা লইয়া অনেকদিন মার সঙ্গে তাহার বচসা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মা কথা শোনেন না। তদুপরি পিতার কড়াশাসন; তাঁহার সঙ্গে বাক্যবিনিময় করিতে তো সাহসেই কুলায় না। কিন্তু এবার সুখেন্দু জিদ্ ধরিযাছে, যাইবেই।

হেমপ্রভা বলিলেন, "ও আমার মনেও নেই!"

সুখেন্দু বলিল, "এই তো মনে করিয়ে দিলাম। এখন বল গে'।"

"গরজ থাকে তুই বল না গিয়ে?"

"ও বাবা, আমি পারব না!"

মা বলিলেন, "আমিও পারব না।"

"খুব পারবে তুমি!"

একটুক্ষণ চুপ কবিয়া থাকিয়া মা বলিলেন, "কোথায় যাওয়া হবে শুনি ?"

"কক্সবাজার।"

"সেখানে আবার কি ?"

সুখেন্দু বলিয়া উঠিল, "কি আবার ? আমার এক বন্ধুর বাড়ী। তার সঙ্গে বেড়াতে যাব।"

"বাড়ীতে মন টেকে না ! কেবল এখানে আর ওখানে !"

"এখানে আর ওখানে কই যাচ্ছি ? তোমার জ্বালায় সে কি আর পারবার জো আছে নাকি ?"

হেমপ্রভা উত্তর দেওয়া প্রযোজন বিবেচনা করিলেন না।

সুখেন্দু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিযা আবার বলিল, "এবার আমি মোট কথা যাবই, মা। তুমি ঠেকাতে পারবে না।"

মা উপদেশ দিলেন, "দ্যাখ্, তুই এখনও ছেলেমানুষ তো! একা একা বিদেশে বিঁভূয়ে কোথায় গিযে কি বিপদ্ ঘটাবি, কে জানে! ওসব আপাততঃ থাক্। বেড়াবার দিন তো ভবিষ্যতে পড়েই রযেছে।"

সুখেন্দু হাসিয়া বলিল, "এই না এক্ষুনি তুমি বল্লে—আমি এখন বড় হযেছি, ছেলেমানুষী করা আর ঠিক নয ?"

"রেখে দে ফাজলামো !"

সুখেন্দু গোঁ ধরিয়া বলিল "তুমি বাবাকে বলবে কিনা বল।"

"না !"

বেজায় অশান্ত হইয়া সুখু মায়ের আঁচল ধরিয়া কি যেন একটা

করিতে যাইবে, এমন সময় শিবানী ঘরে ঢুকিল। মা ও সুখেন্দুকে তদবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি মা ?"

হেমপ্রভা রাগতভাবে বলিলেন, "ছেলের বায়নার আর অভাব কি ?"

সুখেন্দু চাবীর গোছাসুদ্ধ আঁচলটা ধপ্ করিয়া তাঁহার পিঠের উপর ফেলিয়া দিদির দিকে চাহিয়া কৌতুকে হাসিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

শিবানী মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের বায়না ?"

"উনি বিদেশে বেড়াতে যাবেন—সখ হয়েছে !"

হাসিয়া শিবানী বলিল, "কোথায় ?"

"কে জানে, কক্সবাজার না কোথায় !"

"ও, হ্যাঁ, আমাকেও বলছিল বটে সেদিন। কোন্ বন্ধুর বাড়ীতে, না ?"

মা বলিলেন, "বন্ধুবান্ধবেরও আর অভাব নেই !"

শিবানী শান্তভাবে বলিল, "তা বেশ তো। যাক্ না ? তুমি বুঝি যেতে দিতে চাইছনা ?"

মেয়ের নিকট হইতে এই অপ্রত্যাশিত সমর্থন পাইয়া হেমপ্রভা মোটেই খুসী হইলেননা। সুখেন্দুকে থামাইযা রাখিতে যদি কেহ পারে তো শিবানী। সে যদি ইন্ধন যোগায়, তবে তো আর রক্ষা নাই। উদ্বিগ্ন হইয়া তিনি বলিলেন, "বলিস্ কি ? ছেলেমানুষ—ওকে কি একা যেখানে সেখানে ছেড়ে দিতে পারি ?"

শিবানী হাসিয়া উত্তর করিল, "তুমি মনে কর, ও ছেলেমানুষ। ও তো নিজে মনে করে, ও রাজ্যজয় করে আস্‌তে পারে!"

"ও তো কতই মনে করে! ওর কথার অর্থ আছে কিছু?"

"তা হোক্। কিন্তু একবার একটু ছেড়ে দিয়ে দেখতে পারো, মা। বড় হচ্ছে তো, একটু একটু নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখা ভালো।

সুখেন্দুকে ছেলেমানুষ বলিয়া উড়াইয়া দিলেও শিবানী যে ছেলে-মানুষ নয়, এ বিশ্বাস মার মনেও কিছু কিছু আছে। বাহিরের ছোটবড় অনেক লোকের কাছেই তাহার যে প্রতিপত্তি, মার কাণেও সে সংবাদ মাঝে মাঝে পৌছায়। সুতরাং মেয়ে হইলেও সবসময় তাহার কথা একেবারে অবহেলা করিতে পারেন না। তিনি কতক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, "উনি তা কিছুতেই রাজি হবেন না।"

শিবানী বলিল, "বাবা?—তা কেন হবেন না? কোনোদিন তো সুখু চায়নি যেতে! এবার পরীক্ষা-টরীক্ষা দিয়ে খালাস আছে, দিনকতক ঘুরে এলে শরীরও ভালো হবে। ক্ষতি কি? বাবা অমত করবেন বলে মনে হয় না।"

হেমপ্রভা অগত্যা বলিলেন, "উনি মানা না করলে আর আমার কি?

শিবানী উদাসীন সুরে বলিল, "দেখো একবার বলে।" বলিয়া যে কাজে আসিয়াছিল, সেই কাজে আলমারীটার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

সুখেন্দু আসলে চলিয়া যায় নাই, দরজার ওপাশে কবাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। অর্দ্ধেক কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে বুঝিয়া ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া হাসিয়া বলিল, "আজকেই বোলো কিন্তু, মা। আমি পরশুই যাবো।"

১৯

রমেশবাবুর কাছে পরদিন মিনিট পনেরো জবাবদিহি দিয়া সুখেন্দু কাজ হাঁসিল করিয়াছে। আজ সে যাইবে।

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছেলের বায়নায় রাজি যখন হইতেই হইল, তখন হেমপ্রভা যাওয়ার আয়োজনটি পরিপাটি করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। দিন দশেকের জন্য বেড়াইতে যাওয়া, তথাপি জিনিষপত্র সরঞ্জামের অবধি নাই। নগণ্য খুঁটিনাটি, এমন কি, মুখশুদ্ধির মশলাটি পর্য্যন্ত বাদ পড়িল না। সন্ধ্যাবেলা সুখেন্দু যাইবে, সকাল হইতেই হেমপ্রভা গোছগাছের কাজে ব্যস্ত।

সুখু সারা সকাল বাড়ী ছিলনা, খাওয়াদাওয়া করিয়া আবার কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছে। ফিরিয়া যখন আসিল গোটা তিনেকের সময় তখন হেমপ্রভা একটু গড়াগড়ি দিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। খট্ করিয়া বৈদ্যুতিক পাখার সুইচ্ টিপিয়া দিয়া সুখেন্দু মায়ের পাশে আসিয়া শুইয়া পড়িল।

"ভারি গরম পড়তে সুরু করেছে!"

মা বলিলেন, "রোদে রোদে এমন করে ঘুরে বেড়ালে গরম না

লেগে পারে কখনও? দু'দণ্ড ঘরে বসে একটু বিশ্রাম কর দেখি?"

সুখেন্দু জামার বোতামটা খুলিয়া ফেলিল। মায়ের কাঁধের কাছে মাথাটা সরাইয়া আনিয়া বলিয়া উঠিল, "তোমার গা-টা কি সুন্দর ঠাণ্ডা মা।"

হেমপ্রভা নিঃশব্দে সুখেন্দুর মাথার চুলগুলির মধ্যে অঙ্গুলিচালনা করিতে লাগিলেন।

সুখেন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "কালটা এখনও ইস্কুল থেকে ফেরেনি বুঝি?"

ভৃত্য আসিয়া খবর জানাইল, দাদাবাবুকে এক বাবু নীচে ডাকিতেছেন। সুখেন্দু চট্ করিয়া উঠিয়া বসিল।

মা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আবার কে এল বাপু দুপুর রোদে জ্বালাতন কর্ত্তে?"

উত্তর দিবার অবকাশ না লইয়াই সুখেন্দু হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

বিকালবেলা পাঁচটা বাজিয়া যায়, ছয়টা বাজিতে চলে, শিবানী স্কুলের কাজ শেষ করিয়া অনেকক্ষণ হয় বাড়ী চলিয়া আসিয়াছে, কিন্তু সুখেন্দুর দেখা নাই। হেমপ্রভা প্রথমে অধৈর্য্য পরে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। কোথায় আজ একটু ভালো করিয়া ছেলেকে খাওয়াইয়া লওয়াইয়া দিবেন, তা নয় তাহার একেবারে দেখাই নাই। ঘণ্টা দেড়েক পরে ট্রেণ,—আসিবেই বা কখন্, খাইবেই বা কখন্, যাইবেইবা কখন্?

ঠিক এমন সময়ে সুখেন্দু আসিয়া উপস্থিত হইল। মা ঝাঁকিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বাড়ীর কথা মনে পড়েছে এতক্ষণে ?"

সুখেন্দু হাসিয়া উত্তর দিল, "মনে পড়বেনা আবার ? ক্ষিদেয় যে পেট চোঁ চোঁ করছে !"

"আজ সারাটা দিন করলি কি বল দেখি ? একমিনিট্‌ও তো চোখে দেখলামনা ! খাবার দিনটায় অন্ততঃ একটু ঘরে থাক্‌তে হয়তো ? ক'টা বাজে হিসেব আছে ? গাড়ী তো ছেড়ে দিল বলে ! আজকে আর খাওয়া হচ্ছেনা বাছাধনের !"

শিবানীর দিকে চাহিয়া সুখু হাসিয়া বলিল, "মা কি বলে শোন দিদি ! এখনও ঘণ্টা দুই বাকী, আব আমার নাকি যাওয়া হবেনা ! দ'শ মিনিট্‌ খেতে, পাচ মিনিট্‌ কাপড় ছাড়তে, আর দশ মিনিট্‌ শেয়ালদা পৌছুতে, বাস্‌ ! হয়ে গেল !—আমার সুট্‌কেস্‌ গুছিয়ে রেখেছ তো মা ?"

"রেখেছি, রেখেছি ! এখন খেয়ে দেয়ে রওনা হতে পার কিনা দেখ !"

সুখেন্দু উত্তর না দিয়া শিবানীর পিছন পিছন তাহার ঘরে গিয়া কি বুঝাইয়া বলিতে যাইতেছে, এমন সময় হেমপ্রভা দরজার কাছে আসিয়া ডাকিলেন, "আবার কি করছিস্‌, সুখু ? শীগ্‌গির খাবি আয়।"

"যাচ্ছি, যাচ্ছি, তুমি যাও তো এখান থেকে দেখি !" বলিয়া মাকে ধমক্‌ দিয়া সুখেন্দু একেবারে দরজার দিকে পিছন ফিবিয়া দাঁড়াইল।

"বাগ্-রে-বাপ! ছেলের মেজাজ দেখ একবার!" হেমপ্রভা আপনমনে গন্ গন্ করিতে করিতে রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

শিবানী বলিল, "ছিঃ সুখু, যাবার বেলায় কি মার সঙ্গে অমন কর্ত্তে আছে?"

সুখেন্দু রাগিয়া বলিল, "দেখনা, মা রাতদিন কেবল শুধু শুধু আমার সঙ্গে খ্যাঁচ্ খ্যাঁচ্ করে!"

"তা হোক। মা বোঝেননা তাই বলেন। তুই চুপ করে থাক্।"

যাহা হউক, অবশেষে সুস্থ হইয়া খাইয়া সুখেন্দু পেট ঠাণ্ডা করিল, মায়ের মেজাজকেও কথঞ্চিৎ। যতক্ষণ সময় বাকী আছে, বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুইয়া শুইয়া কল্যাণীকে পাশে টানিয়া অনর্থক ক্ষেপাইতে সুরু করিল। মা বলিলেন, শীগ্গির শীগ্গির ফিরিস কিন্তু, সুখু। বেশী দেরী করবিনে বুঝলি?'

"বাবা—বাবাঃ! না পা বাড়াতেই ফিরবার তাড়া!"

ঘড়ির দিকে তাকাইয়া শিবানী বলিল, "সুখু, সময় হল এবার।"

নীচে দরজার সামনে মোটরগাড়ী প্রস্তুত হইয়া আছে। সুটকেস্ বিছানাসমেত সুখেন্দু গিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। ভোঁপ্ করিয়া সশব্দে বিপুল দেহখানাকে নাড়া দিয়া গাড়ী ছুটিল শিয়ালদা অভিমুখে।

মুখ বাড়াইয়া হাসিমুখে সুখেন্দু বলিল, "চল্লাম দিদি,—যাই মা!"

২০

টিফিনের ঘণ্টা পড়িয়া গিয়াছে। ইস্কুলে মেয়েরা খোলা মাঠটুকুর মধ্যে ছুটাছুটি করিতেছে, কেহ দোল্‌নায দোলে, কেহ কুলগাছের আড়ালে বসিয়া দল ভিড়াইয়া গল্প করে। দালানের একটা কামরায শিক্ষযিত্রীমহলে বসিযা গল্প করিতে করিতে বিভার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, ওঃ শিবানীদির কাছ থেকে রুটিনের অদল-বদলটা মীমাংসা করিযা আসিতে হইবে তো!

শিবানীদেবী থাকেন একটু দূবে তাঁহার নিজের অফিসে। কাঠের পার্টিশনটির এপাশে আসিয়া বিভা দাঁড়াইল। "আসব?" বলিয়া দরজার কালো ভারী পর্দ্দাটা হাত দিয়া একটুখানি ফাঁক করিতেই সসঙ্কোচে আবার এপাশে সরিয়া আসিতে হইল। হেড্‌ মিস্‌ট্রেসের কাছে কে যেন এক ভদ্রলোক আসিয়াছেন। মানুষটিকে সম্পূর্ণ দেখা যায় নাই, শুধু হাঁটুর কাছ হইতে পা পর্য্যন্ত সাদা ধুতি আর পাঞ্জাবীর একটু অংশ কবাটের আড়াল এড়াইয়া নজরে পড়ে। এই মুহূর্ত্তে কেহই কোনও কথা বলিতেছেনা, শিবানীদি গালেব কাছে ফাউণ্টেন পেনটি ঠেকাইয়া শুধু মৌনভাবে সামনের দিকে চাহিয়া আছেন, কাজেই ঘরখানি নিস্তব্ধ; ঘরে যে কেহ আছে বিভা তাহা বুঝিতে পারে নাই। ভাগ্যিস্‌ সরাসরি ঘবেব মধ্যে গিয়া ঢুকিয়া পড়ে নাই, মনে মনে স্বস্তির সহিত এই কথাটুকু ভাবিযা সে ফিরিবার উপক্রম করিল।

পর্দ্দার আড়াল হইতে কথা কাণে আসিল, "আর কিছু চাইনে, শুধু একবার বলবেন।"

কণ্ঠস্বরে চমকিয়া গিয়া বিভা হঠাৎ অদম্য কৌতূহলে থামিয়া দাঁড়াইল। ইচ্ছা হইল একবার উঁকি মারিয়া দেখে! কিন্তু তেমনি হঠাৎ মনের মধ্যে নিষেধবাণী জাগিল, ছিঃ!—অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে বিভা আবার শিক্ষয়িত্রী মহলে গিয়া ভিড়িল।

টিফিনের অর্দ্ধ ঘণ্টার অবকাশ দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া গেল। ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। বিভা ব্যস্ত হইয়া নিজের মনে বলিল, কোন্ ক্লাস্‌টা যে এখন নেব, কিছু বুঝতে পারলামনা, ছাই! দেখি আবার যাই।"

আবার বিভা গেল। পার্টিশনের কাছে দাঁড়াইয়া শোনে, আগন্তুক এখনও যান নাই। অত্যন্ত অস্বস্তিভরে বিভা ভাবিল, "কে বাপু এই ঘণ্টাখানেক বসে দরবার করছে? একটা আক্কেলও নেই!"

ইস্কুল প্রাঙ্গণের চারিদিক্ এতক্ষণে একেবারে শান্ত হইয়া গিয়াছে, তবু ঘরের মধ্যেকার নীচু গলার কথাবার্ত্তা বিশেষ কিছু পরিষ্কার শোনা যায়না। দক্ষিণের একটা বাতাসে পর্দ্দার প্রান্তটা মাঝে মাঝে একটু উড়িয়া আসিতেছে। বিভা চাহিয়া দেখিতে পাইল শিবানীদির মুখখানা—উজ্জ্বল চোখে সামনের দিকে চাহিয়া তিনি একটু হাসিলেন।

ভদ্রলোকটির সুস্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "আসি তাহলে, নমস্কার।"

বিভা আবার চম্‌কাইল।

ওধারের দুয়ার দিয়া জুতার শব্দ মিলাইয়া যাইতেই পর মুহূর্ত্তে বিভা তাড়াতাড়ি পর্দ্দা ঠেলিয়া ঢুকিয়া পড়িল, "আসছি একটু, শিবানীদি!"

শিবানী ফিরিয়া তাকাইল।

বিনতস্বরে হেড্‌মিসট্রেসকে তাহার সমস্যা ও আপত্তির বিষয়টি বুঝাইয়া দিতে দিতে বিভা ঘাড় ফিরাইয়া একবার বাহির পথের দিকে না তাকাইযা পারিলনা! সরু একটুখানি পথ মাঠের মধ্যে খানিক দূর সোজা গিযা যেখানে বামদিকে বড় রাস্তার গেটের মুখে মোড় ফিরিয়াছে, আগন্তুক সেইখান দিযা ততক্ষণে বাহির হইয়া যাইতে-ছিলেন, বিভার দৃষ্টির গতি পলকে ছুটিয়া গিযা পড়িল সেইখানেই। বিস্ময়ে থমকিযা দেখিল,—এ যে ব্রতীদা!

বিকালবেলা হোষ্টেলে ফিরিয়া গিযা বিভা কোণের ছাদটুকুতে আর কয়টি মেয়ের সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে, গল্প করিতেছিল তাহারাই, শুনিতেছিল বিভা। বীণা প্রস্তাব করিল, "আয় না ভাই, তাস খেলি?"

রেণু বলিল, "দূর!"

"হ্যাঁ ভাই, বেশ হবে, আয়।"

কম্‌লি উৎসাহিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "নিয়ে আসি, বীণাদি?"

"এসো। কি বলিস্‌ বিভা?"

বিভা বলিল, "তোমরা খেলো—আমি দেখি।"

"না, না, তা হবেনা—সবাই মিলে।"

বিভা একটু হাসিয়া মাথা নাড়িল।

রেণু বলিয়া উঠিল, "তার চাইতে ক্যারম্ খেলি আয়। কেমন বিভা?"

একটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে টানিয়া দীর্ঘস্বরে বিভা বলিল, "যা তোমাদের খুসী—! আমি তো দেখব শুধু!"

"কেন, খেলতে হবে!"

"ইচ্ছে করছেনা ভাই।"

"কেন?"

কেন যে, তাহা বিভা নিজেই জানে না। শরীর ভালোই আছে, অথচ কেমন যেন পরিশ্রান্ত লাগে। কোনও কিছুই ভালো লাগিতেছে না। একটা অকারণ বিরক্তি সমস্ত মনকে সূক্ষ্মভাবে আচ্ছন্ন করিয়া আশেপাশের সব ছোটখাটো ব্যাপারের স্ফূর্ত্তির মধ্য হইতে যেন আজ রস টানিয়া লইয়াছে। মার চিঠি বাড়ী হইতে কালই পাইয়াছে, স্কুলে বা হোষ্টেলে কাহারও সঙ্গে মন কষাকষিও হয় নাই, পড়াইয়াছেও ক্লাসে ভালোই, অথচ কেন যে তবু মন আকস্মিকভাবে এমন একটি অস্বস্তিকর অনুভূতি মনের উপর আসিয়া চাপিয়াছে—অনেক খুঁজিয়া খুঁজিয়াও বিভা তাহার কারণ, কিনারা কিছুই পাইল না এবং না পাইবার দরুণ আরও বিরক্ত হইয়া নিজের উপর এবং সব কিছুর উপর রাগ করিয়া বসিয়া আছে। মেয়েরা পাশে বসিয়া হাসি কৌতুক গল্প করিতেছে, সে ততক্ষণ অন্যমনা হইয়া ও-বাড়ীর ছাদের উপর দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া

ছিল। আকাশের এক কোণে খণ্ড খণ্ড মেঘ একত্র জুড়িয়া গিয়া লালে-নীলে-শাদায় মিশিয়া কেমন যেন এক সাগর পারে সোণার বালুতটে স্বপ্নভূমি রচনা করিয়া ফেলিল, বিভার বুকের মধ্যে অকস্মাৎ কিসের টান পড়িয়া টন্ টন্ করিয়া ওঠে, আর না বুঝিয়া হতবুদ্ধির মত বিভা মেঘলোক হইতে চক্ষু ফিরাইয়া আনিয়া বিরক্ত হইয়া ভাবে,—ধ্যেৎ, ছাই সুন্দর! বিশ্রী!

রেণু ও বীণার পীড়াপীড়ি এড়াইবার জন্য সে উত্তর করিল, "না ভাই, ভালো লাগছে না।"

রেণু কৌতুক করিয়া বলিল, "মন খারাপ নাকি?"

"হুঁ।"

রেণু খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বিভা বলিল, "ওকি ভাই, হাসছ কেন? সত্যি জান না, আমার মনটা আজ ভারি বিশ্রী হয়ে আছে।"

"কি হয়েছে?"

"জানিনে।"

রেণু হাসিয়া বলিল, "আমি কিন্তু জানি!"

তাহার রহস্যভরা চাহনীর দিকে তাকাইয়া বিভা বলিল, "কি জানো?"

আসলে সে যে কিছুই জানে না, তাহা তাহার প্রকাশের ভঙ্গী দেখিয়া বুঝিবে সাধ্য কার? বিভাকে ক্ষেপাইতে তাহার ভালো লাগে, কারণ সে ক্ষেপে সহজেই। সুতরাং বচনবিন্যাস এবং অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে সে যখন পরিপাটি করিয়া খোঁচা দিতে থাকে, তখন

সঙ্গিনীবৃন্দের কৌতুকের ও কৌতূহলের আর অবধি থাকে না। বীণা উৎসুক হইয়া উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি রে রেণু ?"

"বলব বিভা ? বলি ?"

বিভা সন্ত্রস্ত হইয়া নিজের মনের দিকে আর একবার খুঁজিয়া দেখিয়া ভাবিল, কি জানি সর্ব্বনাশ, রেণু আবার কোন রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া ফেলে, কে জানে ? সশঙ্ক ও সতর্ক হইয়া বলিল, "কি বল্‌বে শুনি ?"

"আয় তোর কাণে কাণে বলি।" বলিয়া রেণু টানিয়া বিভার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া যাহা মনে আসিল তাহাই বলিয়া ঠাট্টা করিল।

কিন্তু বিভার মুখখানা হঠাৎ গোলাপী হইয়া উঠিল। ঘরের মধ্যে চোর আসিয়াছে শুনিলে অনেকে যেমন অন্ধকারে চক্ষু বুঁজিয়া নিজেকে ভুলাইতে চায়—চোর সত্যই আসে নাই, ঠিক তেমনিভাবে একটা অপ্রত্যাশিত সন্দেহ জাগিয়া উঠিতেই তৎক্ষণাৎ প্রাণপণে অস্বীকার করিয়া বিভা রেণুর মাথাটা ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "যাঃ, ফাজিল ! মিথ্যেবাদী !"

রেণু হাততালি দিয়া উঠিল, "আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ে দিলাম, তাতেই ধরা পড়ে গেলি ? হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ !"

বিভা মুখ ফিরাইয়া প্রতিবাদ করিল, "কক্ষণো না।"

মনে মনে স্তব্ধ হইয়া বিভা ভাবিতে লাগিল, রেণুটা ভোজবাজি জানে নাকি ? সারা বিকাল ধরিয়া সে নিজে যাহা ভাবিয়া ভাবিয়া

সারা হইয়াছে, অথচ সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পায় নাই, রেণু তাহা টক্ করিয়া ধরিয়া ফেলিল কেমন করিয়া? রেণুর উদ্যত টর্চ্চলাইটের আলোটা ঠিক তাহার আহত বিন্দুর উপরে যেন কেন্দ্রগত হইয়া পড়িয়াছে।

মেয়েরা উদ্‌গ্রীব হইয়া বলিয়া উঠিল, "কি রে কি?"

মুখ টিপিয়া হাসিয়া বিভার মুখের দিকে চাহিয়া রেণু বলিল, "থাক্ না বাপু, তোদের অত খবরে কাজ কি? যার গোপন কথা তার বুকেই লুকোন থাক্!"

বিভা অসহায় হইয়া ভয় দেখাইল, "যা-তা বল যদি রেণু, ভালো হবে না কিন্তু বলে দিচ্ছি!"

পরদিন গুডফ্রাইডের ছুটি। বিভা দুপুরবেলা কতক্ষণ বসিয়া মার কাছে চিঠি লিখিয়া এইমাত্র বীণার পাশে শুইয়া পড়িল। বীণা বুকের উপর খুলিয়া ধরিয়া একখানা উপন্যাস পড়িতেছিল; বিভা মধ্যখান দিয়া যেখানে চোখ পড়িল, সেইখান দিয়াই তাহার সঙ্গে সঙ্গে সুরু করিল।

তিনটা বাজিতেই ঘরে ঢুকিয়া একটি ছোট মেয়ে আসিয়া খবর দিল, "বিভাদি, তোমার ভিজিটার।"

কোনও কথা ভাবিবার আগে বিভা একবার ঘরের চারিদিকে সত্রাসে চাহিয়া দেখিয়া লইল, রেণু কোথাও আছে নাকি?

রেণু তখন অঘোরে ঘুমাইতেছে।

নিশ্চিন্ত হইয়া বিভা লঘুগতিতে তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ব্রতীন্দ্র টেবিলের উপর হাতটা রাখিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। হাসিয়া বলিল, "কি করছিলে ?"

"কিচ্ছু না—শুয়ে ছিলাম।"

"ছুটির দিনে কেবল শুয়ে শুয়েই কাটাও বুঝি ?"

বিভা হাসিয়া উত্তর দিল, "বা রে বাঃ! ছ'দিন অহোরাত্র গাধার খাটুনি! মোটে একটা দিন হাতে পাই, তাও একটু জিরোব না ?"

"ইস্কুলের চাকরী তো সুখের চাকরী, এতেই তোমার গাধার খাটুনি হল ?"

বিভা বলিল, "সুখের চাকরী ঐ বাইরে থেকেই শুন্‌তে! তুমি একবার করে দেখো তো ?—তার ওপরে আবার এসেই সন্ধ্যেবেলা ছুট্‌তে হয়না টিউশানি কর্ত্তে ?"

ব্রতীন্দ্র করুণ স্নেহে বিভার দেহলতার দিকে একবার চাহিয়া ভাবিল, বেচারী! জিজ্ঞাসা করিল, "পরিশ্রম বড্ড বেশী মনে হয় কি ? তাহলে টিউশানিটা না হয় ছেড়ে দাও !"

বিভা তাড়াতাড়ি বলিল, "না, না, ও এমনি বল্লাম! তেমন কিছু নয় !"

"দেখো, শেষকালে অসুখ করে বোসো না।"

বিভা নিঃশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে ভাবিল, অসুখ করিলেই বা শোনে কে ? যেমন করিয়াই হউক, উপার্জ্জন যে তাহাকে করিতেই হইবে! তাহার ভার মাথায় তুলিয়া লইয়া তাহাকে একটু বিশ্রাম দিবে, এমন দরদ তাহার জন্য তো কাহারও নাই! দূর পল্লীপ্রান্তে

মা বসিয়া তাহার জন্য নিশিদিন প্রার্থনা করিতেছেন, এইটুকু সে নিশ্চিতই জানে ; তাহা ছাড়া এই বিপুল সংসারে আর কেহ দিনান্তে মাসান্তেও তাহাকে স্মরণ করিবার অবকাশ পায় না ! অভিমান-ভরে বিভা ঠোট্ চাপিয়া চুপ করিয়া রহিল।

মিনিট্ খানেক পরে আবার একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া মনের ভিতরটা যেন হাল্কা করিয়া দিয়া সে মুখ খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কাল্‌কে আমাদের স্কুলে গিয়েছিলে নাকি, ব্রতীদা ?"

"কে বল্লে ?"

"আমি দেখ্‌লাম যে ?"

"ও।"

"গিয়েছিলে সত্যি, না ?"

ব্রতী হাসিয়া বলিল, "দেখ্‌লে—তবু বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ?"

"কেন গিয়েছিলে ?"

"কাজ ছিল তোমাদের হেড্‌মিস্‌ট্রেসের কাছে।"

বিভা কুতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিল, "তাঁর কাছে তোমার আবার কি কাজ ?"

ব্রতীন্দ্র একটু হাসিয়া বলিল, "কেন, কাজ থাকৃতে পারে না ?"

বিভা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ব্রতী টেবিলের গায়ে ঠেস্ দিয়া বলিল, "অবসর যখন পাও, তখন বই-টই কিছু পড় না বিভা ?"

বিভা বলিল, "পড়ি মাঝে মাঝে।"

"কি বই ?"

"কি বই তার কি ঠিক আছে কিছু? যখন যা হাতের কাছে পাই—গল্প, উপন্যাস।"

"গল্প আর উপন্যাস?"

"তা ছাড়া আবার কি পড়ব?"

ব্রতী বলিল, "এ ছাড়া আর কোনও বই দুনিয়ায় মেলে না? এর চেয়ে ভালো, এর চেয়ে উঁচু?"

বিভা বলিল, "তা মিলুক গে'। অত উঁচু-টুঁচু জিনিষে আমার দরকাব নেই, আমার মাথায় ঢুকবে না। ভালোও লাগে না আমার।"

ব্রতী বলিল, "হ্যাঁ লাগ্‌বে। ভালো বই আমি এনে দেব, তুমি পড়বে।"

ব্রতীদাব আদেশের উপর আপত্তি কবা চলে না। সুতরাং বিভা উদাসীনভাবে মানিযা লইয়া বলিল, "আচ্ছা, দিও।"

মনটা তাহার বইএর মধ্যে ছিল না, সে ভাবিতেছিল অন্য কথা। অপ্রাসঙ্গিকভাবে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "শিবানীদিকে তুমি চেন, ব্রতীদা?"

ব্রতী একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "না চিন্‌লে তোমার চাকরী জুটল কোত্থেকে?"

কোথা হইতে অলক্ষিতে একটা খোঁচা বিভার মনে লাগিল। সে একটু থামিয়া বলিল, "তা বল্‌ছিনে।—বেশ আলাপ আছে?"

"আছে বৈ কি?"

বিভা জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "কি করে আলাপ হল?"

ব্রতী বলিল, “কেন ?”

“এম্‌নি।”

ব্রতী উত্তর দিল না। বিভা আবদার করিল, “বল না !”

একটু হাসিয়া ব্রতীন্দ্র বলিল, “সেকথা তো বলা শক্ত ! আলাপ কবে কার সঙ্গে কি করে হয়, মানুষের কি তা মনে থাকে ?”

“আমার তো থাকে !”

“তা ভালো।”

ব্রতীন্দ্রের তরফ হইতে আর কোনও জবাব বাহিব হইল না। একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি বিভার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিবার স্থচনা করিল যেন। ব্রতীদা যাহা বলিবে না, তাহা কৌশলে টানিয়া বাহির করিবার সাধ্য কাহারও নাই, তাহা সে জানে ; তবু প্রবল কৌতূহল ও সংশয় না থামাইতে পারিয়া বলিল, “কবে থেকে আলাপ ?”

ব্রতী বলিল, “শিবানীদি’কে নিয়ে তোমার আজ হঠাৎ এত কৌতূহল কেন ?”

সে কথার জবাব না দিয়া বিভা কতক্ষণ তাহার চোখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, “বল্‌বে না ?”

হাসিয়া ব্রতীন্দ্র বলিল, “না।”

শপ্‌ করিয়া বিভার বুকের মধ্যে কে যেন ঘা মারিল। ব্রতীন্দ্রের কৌতুকভরা মুখচ্ছবি তাহার লক্ষ্য এড়াইল, মুহূর্ত্তে সে তাহাব মুখ হইতে চোখ সরাইয়া আনিয়া বলিল, “থাক্।”

বিভার কচিমুখের কোমল রেখাগুলি কেমন করিয়া নিমেষ মধ্যে

শক্ত হইয়া উঠিল, ব্রতীন্দ্র দেখিয়া অকস্মাৎ অবাক্‌। মসৃণ কালো মুখখানির উজ্জ্বলতা নিবিয়া আষাঢ়ের আকাশের মত আঁধার হইয়া আসিয়াছে। ব্রতী ক্ষণেক থমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হল কি ?"

বিভা যথাসাধ্য সহজস্বরে বলিতে চেষ্টা করিল, "কিছু হয়নি তো !"

ব্রতীন্দ্র পরিপূর্ণভাবে চক্ষু মেলিয়া তাহার মুখের প্রত্যেকটি রেখা, প্রত্যেকটি আলোছায়ার খেলা নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল—চোখের মধ্যে তলাইয়া দেখা যায় না, বিভা তাহার দীর্ঘ পক্ষ্মচ্ছায়ায় আনত চক্ষুর দৃষ্টি আড়াল করিয়া দিয়াছে। মুহূর্ত্ত কয়েকের নীরবতা ভাঙ্গিয়া দিয়া ব্রতী বলিল, "সব কথাই কি জান্তে হয় বিভা ?"

"জানতে তো চাইনে আর !"

সস্নেহে আদর করিয়া ব্রতীন্দ্র বলিল, "তুমি বড্ড বেশী অভিমানী। ছিঃ !"

নিজের উপর ধিক্কারে, ক্ষোভে ও বেদনায় বিভার কান্না আসিল। অথচ কেন যে, তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতেও পারিল না। বুঝিল শুধু এইটুকু যে, অভিমান সে করে নাই,—কারণ, ব্রতীর প্রতি অভিমান করিবার অধিকার তাহার কিছুই নাই। অগোচরে হঠাৎ চোখের সাম্নে শিবানীদির অফিসঘরের ছবিটি ভাসিয়া উঠিল, আর শিবানীদির হাস্যোজ্জ্বল সেই মুখখানা, সেই চোখ। বিভা কেমন যেন তীব্রভাবে হঠাৎ অনুভব করিল, তাহার চোখে শিবানীদির মত দীপ্তি নাই, সম্রাজ্ঞীর মত সর্ব্বজয়ী সে হাসি তাহার অধরে ফোটে

না। বুকের ভিতরটা শক্ত করিয়া সে ভাবিল,—আচ্ছা, না আছে নাই থাক্। কিন্তু নিজের দীনতা ও অক্ষমতার লজ্জায় মন যেন এতটুকু হইয়া আসে।

বিভার তরফ হইতে কোনও উত্তর অথবা প্রতিবাদ, অথবা কোনও কিছুই না পাইয়া ব্রতী গম্ভীরভাবে স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাকিল, "বিভা!"

বিভা মুখ তুলিয়া তাকাইল।

"একটা কথা জিজ্ঞেস করি।"

"কি?"

"আমি যা বল্‌ব, তাই শুন্‌বে?—"

বুকটা কাঁপে কেন? ব্রতীদার মুখের দিকে চাহিয়া বিভা বিপন্ন হইয়া নিজের কাছেই নিজে প্রশ্ন করিল, এমন করিয়া কেন ব্রতীর ঐ চোখ, ঐ মুখ, ঐ কণ্ঠস্বর তাহাকে টানে? ব্রতী উপেক্ষা করিলে সে-ও কেন উপেক্ষা করিতে পারে না? বিব্রত ব্যথিত হইয়া সে বলিল, "না শুনেছি কবে?"

"না, ওরকম নয়। রাগ অভিমান ঝেড়ে ঝুড়ে ফেলে দিতে পার যদি, তা'হলে—"

উদ্‌গত একটা বেদনাদায়ক নিঃশ্বাস চাপিয়া ফেলিয়া বিভা সহজভাবে বলিল, "রাগ তো করিনি।"

ব্রতীন্দ্র খুসী হইয়া বলিল, "লক্ষ্মী মেয়ে! এবার তাহলে তোমায় একটা নূতন কথা শোনাব।"

আগ্রহে ও কৌতূহলে বিভা উদ্‌গ্রীব হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "কি কথা?"

মুখখানা একটু নামাইয়া স্মিতহাস্যে তাহার মুখের পানে চাহিয়া ব্রতীন্দ্র বলিল, "আজ নয়,—পরে।"

বিভা ক্ষুব্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পরে—আবার ক'মাস পরে আস্‌বে ?"

"শীগ্‌গিরই।"

বিশ্বাস করিতে মন সরিল না—কারণ, ব্রতীদার সান্নিধ্যটুকু তাহার কাছে এত মিষ্ট যে একান্তই দুর্ল্লভ। উঃ, এত মিষ্ট ব্রতী কেন হইল, এত সুন্দর ? তাহার মাথার অবিন্যস্ত চুলগুলি হইতে পায়ের ধূলিধূসর আঙ্গুলগুলি পর্য্যন্ত প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যে মোহন ভঙ্গিমা, এমনটি আর কোথাও সে দেখে নাই। কোথাও নাই-ই। বুকের রক্ত দুলিয়া উঠিতেই নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিভা ভাবিল,—কিন্তু ঐ প্রশস্ত বুকের আড়ালে হৃদয় বলিয়া কিছু যে নাই !

অস্পষ্টচ্ছটায় শিবানীদির মুখখানা আবার চোখের উপর দিয়া খেলিয়া গেল।

২১

ভোরের আলো অর্দ্ধোন্মুক্ত জানালার সার্সির উপর পড়িয়া ঝক্ ঝক্ করিতেছে, শিবানী ঘুম ভাঙ্গিয়া বিছানায় শুইয়া শুইয়া সেইদিকে চাহিয়া রহিল। গতরাত্রে কেমন একটা উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগে ভালো করিয়া ঘুম হয় নাই—এত বেলাতেও মাথাটা তাই যেন তন্দ্রালস ও অবশ।

কিন্তু দেরী করা আর চলে না। সজোরে অবসাদ ঝাড়িয়া ফেলিয়া সে উঠিয়া পড়িল।

সুরেশবাবু ঈস্‌টারের ছুটিতে কলিকাতা আসিয়াছেন, এবারে সস্ত্রীক। হেমপ্রভা আজ দুইদিন তাই ভারি ব্যস্ত। কোন্ সকালে উঠিয়া তিনি গৃহকর্ম্মের তত্ত্বাবধানে লাগিয়াছেন। শিবানী উঠিয়া দেখিল, কাকীমাও জাগিয়া গিয়াছেন অনেকক্ষণ। মনে মনে একটু অপ্রতিভ হইয়া ক্ষিপ্রহস্তে দাঁতে ব্রাস্ ঘসিতে ঘসিতে বলিল, "কাল রাতে গরম পড়েছে খুব, না কাকীমা ?"

জলখাবার তৈরী হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু শিবানীর মন খবরের কাগজটা দেখিবার জন্য চঞ্চল। কাকীমা ও কল্যাণীকে টেবিলে বসাইয়া দিয়া সে বলিল, "দাঁড়াও, আমি কাগজটা নিয়ে আসি।"

পাশের ঘরে রমেশবাবু ততক্ষণে সেখানা দখল করিয়া বসিয়া আছেন। শিবানী দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া দেখিল, চোখের চশমাটা নাকের কাছে আনিয়া তিনি ঝুঁকিয়া বসিয়া গোগ্রাসে খবর গিলিতেছেন। পায়ের শব্দে রমেশবাবু বিপুল উত্তেজনায় মুখ তুলিলেন, মনে করিয়াছিলেন—সুরেশ। কিন্তু সুরেশবাবু সেই যে ভোরে বেড়াইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন,—এখনও ফেরেন নাই। উত্তেজনার প্রাবল্যে রমেশ অগত্যা শিবানীকেই ডাকিয়া বলিয়া উঠিলেন, "চাটগাঁয়ে একটা বেজায় কাণ্ড হয়ে গেছে, শিবু!"

শিবানী একটি মুহূর্ত্ত চোখের পলক ফেলিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, "কি কাণ্ড, বাবা ?"

"একেবারে অভাবনীয় ব্যাপার!"

শিবানী বুকের মধ্যে নিঃশ্বাস চাপিয়া দ্রুতদৃষ্টিতে বড় হেড্‌লাইন গুলি দেখিয়া গেল।

রমেশ বলিলেন, "detailed news এখনও সব পাওয়া যাচ্ছে না,—communication এর লাইন সব একেবারে cut off! ভয়ঙ্কর কাণ্ড!"

শিবানী প্রথম পৃষ্ঠায় হাত দিয়া বলিল, "এ পাতাটা তোমার পড়া হয়ে গেছে, বাবা? তাহলে আমি নিয়ে যাই—একবার ভালো করে পড়ে দেখি।"

রমেশ কাগজখানা হাতে তুলিয়া দিলেন। মনে মনে উদ্‌গ্রীব হইয়া প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন, সুরেশ তাড়াতাড়ি আসিয়া পড়িলে হয়।

পাশের ঘরে কল্যাণীদের টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া হেমপ্রভা কেট্‌লী হইতে চা ঢালিতেছিলেন। রমেশের কণ্ঠস্বর শুনিয়া বুঝিলেন, বহির্জগতে আবার একটা কি নূতন ঘটনা ঘটিয়াছে এবং খবরের কাগজের মারফতে সম্প্রতি স্বামীর চাযের টেবিলে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহারই জের। নিত্য নিত্য দেখিতে দেখিতে এরূপ কণ্ঠস্বরের মোটামুটি কারণ আবিষ্কার করিতে তাঁহার আর এখন দেরী হয় না। শিবানী চেয়ারে আসিয়া বসিতেই মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজকে আবার খবর আছে নাকি কিছু?"

শিবানী সংক্ষেপে বলিল, "হুঁ।"

"কি খবর?"

সংবাদপত্রের ছত্রের প্রতি একাগ্র দৃষ্টি রাখিয়া শিবানী

নির্বিকারভাবে বর্ণনা করিতে লাগিল, "চাটগাঁয়ে স্বদেশী বিপ্লবীরা একটা অস্ত্রাগার লুঠ করে নিয়েছে। গুড্ ফ্রাইডের দিন রাত্তিরে—রাত দশটার সময়।"

মা ও কাকীমা আতঙ্কিত হইয়া বলিলেন, "ও বাবা! সেকি! অস্ত্রাগার লুঠ করে নিলে? সৈন্যসামন্ত পুলিশ ছিল না সেখানে?"

শিবানী একটু হাসিয়া বলিল, "তা ছিল বৈ কি? কিন্তু অতর্কিতে হঠাৎ এসে বন্দেমাতরম বলে ঘিরে ফেলেছে—আর কি? পুলিশরা তো প্রস্তুত ছিল না।"

হেমপ্রভা সবিস্ময়ে কৌতূহলে আবার প্রশ্ন করিলেন, "তারপর? ছেলেগুলো ধরা পড়ে নি?"

শিবানী ক্ষণেক থামিয়া গিয়া উত্তর করিল, "ধরা? না, এখনও ধরা কেউ পড়েছে বলে খবর পাওয়া যায় নি।

চক্ষু বিস্ফারিত করিযা মা বলিলেন, "বাবা বাবা! কি ডাকাত ছেলেগুলো!"

কাকীমা বলিলেন, "যা হোক্ সাহস কিন্তু!"

সকালবেলা দেখিতে দেখিতে কেমন করিয়া কাটিয়া গেল। গত তিনদিন যাবৎ শিবানী যে উপন্যাসখানা লিখিতে স্বরু করিয়াছিল, আজ সকালে তাহার আর একটা পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করিবে, এই ছিল মনে বন্দোবস্ত। কিন্তু টেবিলের উপরে খাতা মেলিয়া কলম হাতে করিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়াও কলমের মুখে প্রেরণা আসিল না। অগত্যা অর্দ্ধসমাপ্ত বইখানা খুলিযা চক্ষু মেলিয়া বসিয়া রহিল। গুরুভার চিন্তার দুর্গ ভেদ করিয়া

মগজের মধ্যে লেখাগুলি কতদূর পৌঁছিল, সে নিজেও তাহা নিরূপণ করিবার অবকাশ পাইল কি না, বলা শক্ত। সময় ততক্ষণে অগোচরে প্রায় দেড় প্রহরের পথ পার হইয়া চলিয়া গিয়াছে।

শিবানী, কল্যাণী, রমেশ, স্থরেশ দুপুরবেলা একত্রে যখন সকলে আহার করিতে বসিলেন, রমেশের মাথার মধ্য হইতে প্রবল উৎসাহ তখনও দমে নাই। বৃদ্ধবয়সেও তাঁহার শক্তি ও উত্তম যুবার চেয়ে বড় বিশেষ কমে নাই এবং উত্তমের বারোআনা অভিব্যক্তিই তাঁহার ক্ষুরধার রসনাগ্রে। নড়িয়া চড়িয়া উত্তোগ করিয়া যথার্থ কাজের উত্তম তাঁহার মধ্যে অতি ক্বচিৎ দেখা যায়—যৌবনের ভরাদিনেও তাঁহার ঐ-ই ছিল স্বভাব। স্থতরাং মস্তিষ্ক নিবদ্ধ শক্তির বহির্মুখী প্রকাশ একমাত্র ঐ তর্কযুদ্ধের মধ্যে ছাড়া আর পথ পায় না এবং তর্কের প্রশস্ততম ক্ষেত্র তাঁহার রাজনীতি, কারণ রাজনীতিতে তাঁহার মত আর কাহারও সঙ্গেই প্রায় মেলে না। দেশের শিক্ষিত সমাজের শতকরা নব্বইজন যদিও বিশ্বাস করিতেছে তাঁহার বিরুদ্ধ মতে, তথাপি রমেশবাবু নিশ্চয় জানেন—তাঁহার নিজের কথাগুলিই অভ্রান্ত খাঁটি; ওগুলা নির্ব্বোধ এবং এই নির্ব্বোধ মেষের পালকে তাঁহার মতে প্রত্যয় সম্পন্ন করাইতে না পারিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে উত্তরোত্তর উগ্র হইয়া উঠেন।

স্থরেশকে পাইয়া উদ্দীপ্ত মগজের বিক্ষোভ প্রকাশের পথ মিলিল। বলিলেন, "দেখেছ কাণ্ডখানা একবার?"

স্থরেশ প্রতিধ্বনি করিলেন, "সাংঘাতিক কাণ্ড!"

অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া রমেশ গম্ভীরমুখে বলিলেন, "এ তো এখন

আর ছেলেখেলা বল্লে চলে না। দিনকে-দিন একেবারে dangerous proportionএ বেড়ে চলেছে! একটা remedy চাই!"

"তাই তো! বাংলাদেশে এমনতর—শুধু বাংলাই বা বলি কেন, সারা ভারতবর্ষে এমনতর daring attempt আর কক্ষনো হয়নি। একটা রীতিমত military affair! কি প্রচণ্ড দুঃসাহস!"

স্বদেশবাসীর এই দুঃসাহসে রমেশবাবু প্রায় ক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছেন, যে কোনও একটা উপায় সরকারবাহাদুরকে বাৎলাইযা দিয়া আসিতে পারিলে তাঁহার স্বস্তি। কালই ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে একটি প্রবন্ধ প্রেরণ করিবেন বলিয়া মনে মনে সংকল্প করিয়া রাখিলেন। কিন্তু আপাততঃ এই মুহূর্ত্তে অপ্রতীকারের নিষ্ফল ক্ষোভে কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া পরক্ষণে পারিবারিক ক্ষুদ্র এই ভোজসভায গর্জ্জন করা ছাড়া উপায়ান্তর দেখিলেন না।

সুরেশ মাথা ঘামাইয়া বলিলেন, "কি উপায়টা হবে বল দেখি, দাদা? গভর্ণমেণ্ট যেন এ দিকে একেবারে নজর দিচ্ছে না।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রমেশ তর্জ্জন সহকারে বলিযা উঠিলেন, "থাকত যদি কার্জ্জন্ সাহেব তো দেখিযে দিত। পাদ্রি-টাদ্রির কর্ম্ম কি দেশ শাসন করা?"

শিবানী চুপ করিয়া একমনে খাইতেছিল এবং শুনিতেছিল পিতার মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল,—আরুইনের প্রতি অসহ্য ক্রোধে তাহা যেন প্রায় ফাটিয়া পড়ে।

রমেশ বলিয়া চলিলেন, "কংগ্রেসে দাঁড়িয়ে বেটারা নিশ্চিন্তে গলাবাজি ক'রে Independence declare কর্লে, আর

গভর্ণমেণ্ট দিব্যি চুপটি করে হজম করে বসে আছে! তখুনি কংগ্রেসকে বে-আইনী করে দাবিয়ে দিলে আর কথাটি কইতে পারতেন কেউ? সব একদম চুপ হ'য়ে যেত! কংগ্রেসের lawlessnessকে শাসন ক'রে না রাখতে পারলে টেররিজ্‌ম্ ঘুচ্‌বে কেন?" ক্ষণেক দম লইয়া—"Repression! এর নাম আবার নাকি repression! আস্কারা দিয়ে দিয়ে গভর্ণমেণ্ট স্বদেশীওয়ালাগুলোকে একেবারে মাথায় তুলে নাচ্‌ছে। ছিল ১৯২৪এর অর্ডিন্যান্স, ঠিক ছিল। ছোঁড়াগুলোকে আবার খালাস দেবার দরকার ছিল কি, শুনি? ছেড়ে দিয়ে বদান্যতা না দেখালে হত আজকের এই কেলেঙ্কারী?' আগাগোড়া এই vacillating policy হচ্ছে সব সর্ব্বনাশের গোড়ায়। একেবারে back boneless!" নিদারুণ অবজ্ঞায় তিনি কিয়ৎকাল মৌন হইয়া রহিলেন।

তরকারীর বাটিটি উপুড় করিয়া শিবানী ভাতের উপর ঢালিয়া লইতেছিল, হঠাৎ অস্বাভাবিক অপমানে সমস্ত দেহের রক্ত যেন টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। বাবাকে সে চিরকাল জানে,—কংগ্রেস অথবা বিপ্লবের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি নাই, তাই আপত্তি করিবারও কারণ নাই, যেহেতু মত মানুষের সমান থাকে না। কিন্তু দেশপ্রেমের গৌরব করিতে আর পাঁচজনের মত রমেশবাবুও ছাড়েন না। আজ তিনি যাহা বলিলেন, এই কি তাঁহার দেশপ্রেম? কংগ্রেস পূর্ণস্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে বলিয়া তাঁহার বুকে যেন শেলবিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে; এ তাঁহার

যেন একেবারে অসহ্য! লাটসাহেবের চেয়ে তাঁহারই যেন দায়িত্ব বেশী।

হেমপ্রভা কাছে বসিয়া পরিবেশনের তদারক করিতেছিলেন, ভ্রাতৃযুগলের অনর্গল উত্তেজনার মুখে কথা বলিয়া বাধার সৃষ্টি করা যুক্তি সঙ্গত বিবেচনা করেন নাই। এতক্ষণে একবার একটা নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পাইয়া বলিলেন, "আর একটু মাছ আন্‌তে বলি, ঠাকুরপো?"

২২

ছুটি ফুরাইয়া গিয়াছে। সুরেশ কাল স্বস্থানে প্রস্থান করিবেন। শিবানী স্কুল হইতে কর্ম্মক্লান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া কাকা-কাকীমার সঙ্গে একটু গল্প করিতে বসিল। হেমপ্রভাও রেলিংয়ের কাছে টুলে বসিয়া সুখেন্দুর জন্য একটা রুমালে সূতা তুলিতেছিলেন।

সুরেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুখু কবে ফিরবে বৌঠান?"

"কে—জানে? বলে তো গেছে তেরো চৌদ্দদিনের বেশী দেরী করবে না। তাহলে তো আর দিনচারেক বাদেই ফিরবার কথা।" একটু থামিয়া আপন মনেই বলিতে লাগিলেন, "গিযে যে একখানা চিঠি দেবে, তাও না! আমি যে দিনরাত ভেবে মরছি সে খেয়াল কি আর আছে ওর?"

কাকীমা বলিলেন, "এতদিন পরে এলাম, তাও দুদিনের জন্যে সুখুর সঙ্গে এবার আর দেখা হল না!"

শিবানী বলিল, "আর কদিন থেকে যাও না কাকীমা ?"

হেমপ্রভা ভাবিতেছিলেন সুখুর কথা। ছেলেটার কি আক্কেল, দেখ না! এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন ছেলে লইয়া কি যে তাঁহার হইবে! রুমালে ফোঁড় তুলিতে তুলিতে যা'য়ের উদ্দেশে বলিলেন, "তোমার খোকনের আজকাল অবস্থা কি? আমাদের বাছাধনটির মতই, না শান্তশিষ্ট হচ্ছে ?"

কাকীমা হাসিয়া বলিলেন, "আজকালকার সব ছেলেরই ঐ এক দশা দিদি! দিনের পর দিন যতই উঁচু ক্লাসে উঠছে, মা সরস্বতীর সঙ্গে সম্পর্কও চুলোয় যাচ্ছে ততই।"

"না বাবা, আমারটির মতন এমন তোমাদের কারো ঘরে জন্মায়নি, আমি ঠিক বলে দিলাম! পড়াশুনো তো একদম নেই, যা করবে তা করবেই, কাউকে তোয়াক্কা করে না একেবারে!— অমন যে বাঘের মতন বাপ, তাঁকে পর্য্যন্ত না!"

সুরেশ বলিলেন, "একেবারে বে-পরোয়া হয়ে গেলে তো মুস্কিল! বিশেষতঃ আজকাল যে রকম দিনকাল পড়েছে, বলা তো যায় না—কখন্ কোন্দিকে মাথা বিগড়ে যায়!"

হেমপ্রভা বলিলেন, "সেই তো আমার দিনরাত ভয় ঠাকুরপো! স্বদেশী ছোঁয়াচ একটু আধটু এসে লেগেছে না এরি মধ্যে? এত ভয় দেখাই, ধম্কাই, কিন্তু আমার সাধ্যি কি যে ওকে সামলাই? শিবুই তবু যাহোক্ করে ওকে বুঝিযে সুঝিযে সাম্লে রাখ্চে। ওকেই একটু মানে তবু!"

হঠাৎ নিজের অগোচরে শিবানীর মুখখানা কেমন অস্বাভাবিক

হইয়া উঠিল। মাথার উপরে ঝুলানো অর্কিডের পাৎলা বেগুনী রংএর ফুলগুলির দিকে মুখ উঁচাইযা দেখিতে লাগিল পাঁপড়ির বর্ণবৈচিত্র্য।

স্বরেশ আশ্বস্তির স্বরে বলিলেন, "তবু একজন কেউ রাশ টেনে রাখতে পারলেও তো হয়!—পরীক্ষা কেমন দিযেছে রে, শিবু?"

শিবানী বলিল, "ভালোই।"

ঝি আসিযা পিছন হইতে ডাকিল, "দিদিমণি, তোমায ডাক্‌ছেন কে বাবু।"

চকিতে সোজা হইযা ফিরিয়া শিবানী বলিল, "আচ্ছা।"

শঙ্করানন্দ নীচে অপেক্ষা করিযা দাঁড়াইয়া।

উৎকণ্ঠিত শিবানী ঘরে ঢুকিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "এসেছেন?"

শঙ্করানন্দ শুধু মাথা নাড়িল।

"তারপর—খবর?"

শঙ্কর বলিল, "খবর ভালোই। কাগজের মারফতে যা পেযেছেন, তাতেই তো অনেকটা বুঝতে পাবছেন; বাস্তবে আরও ভালো।

"গ্রেপ্তার হয়েছে এখন অবধি কজন?"

"গ্রেপ্তার তো একধার থেকে সবাই হচ্ছে—সীমাসংখ্যা নেই! তবে দু'তিনটি ছেলে গুলীতে মাবা গেছে—কেউ পুলিশের গুলীতে, কেউ আত্মহত্যা করে! আর জনকতক পালিযেছে আরাকানের পথে।"

শিবানী জিজ্ঞাসা করিল, "সুখেন্দুর খবর পেয়েছেন কিছু?"

জ্বলজ্বলে চক্ষু দুইটি নিমেষের তরে শিবানীর মুখের উপর স্থাপন করিয়া শঙ্কর সংক্ষেপে বলিল, "পেয়েছি।"

উদ্‌গ্রীব হইয়া শিবানী বলিল, "কি? কোথায় আছে?"

শঙ্কর একটু থামিয়া মাটির দিকে চক্ষু নামাইয়া ধীরে বলিল, "নেই।"

প্রবলশব্দে বজ্রনিপাত হইলে কাণে যেমন অকস্মাৎ তালি লাগিয়া যায়, কতক্ষণ আর কিছুই যেন শোনা যায় না, তেমনই আচম্‌কা শঙ্করের মৃদু কথাটি তীক্ষ্ণ শলাকার মত শিবানীর কাণে পশিয়া পটাহ যেন ছিন্ন করিয়া দিল, মগজ পর্য্যন্ত গিয়া আর কিছুই পৌছাইল না। মূঢ়ের মত শঙ্করানন্দের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "উঁ?"

টেবিলের তলার যে কাঠটার উপরে সে পা তুলিয়া দিয়াছিল, সেইদিকে চোখ চাহিয়া শঙ্কর পরিষ্কার শুষ্কস্বরে বলিল, "সুখেন্দু মারা গেছে।"

"মারা গেছে!!" অর্থহীন সুরে এই একটি কথা উচ্চারণ করিয়া শিবানী স্তব্ধ হইয়া রহিল। এক মুহূর্ত্তে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যেন স্তিমিত হইয়া আসিয়া চোখের পাতাটা অজ্ঞাতে বুঁজিয়া আসিল। শঙ্করের কথাগুলি প্রতিধ্বনি তুলিয়া কাণের মধ্যে, মাথার মধ্যে, হিমশীতল শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রিন্ রিন্ করিয়া কি বার্ত্তা যে জানাইয়া গেল, তাহার সহসা উপলব্ধি হইল না।

তাহার বিবর্ণ মুখশ্রীর দিকে একবার তাকাইয়াই শঙ্কর আস্তে চোখ ফিরাইয়া লইল।

কিন্তু একটি ক্ষণ! ক্ষণপরেই শিবানী মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মারা গেল কোথায় ?"

"জালালাবাদ পাহাড়ে।"

"ও।"

শিবানী আর কোনও কথা বলিল না, শঙ্করও চুপ করিয়া রহিল। মাথার মধ্যে দুর্ব্বারবেগে রক্তগুলি ছুটিয়া গিয়া কেমন যে ঝন্ ঝন্ করিতেছে, সেগুলিকে সংহত করিয়া স্বাভাবিক গতিতে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টায় শিবানী একবার চোখের পলক ফেলিয়া সাম্নের দরজা দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইল, একবার এদিকে, একবার ওদিকে। কপালের উপর দিয়া, চুলের উপর দিয়া বাম হাতখানা বুলাইয়া লইয়া শঙ্করের দিকে চাহিয়া বলিল, "এদিক তো এই হল। তাবপর যারা পালিয়েছে এবং আরও যাদের পালাতে হবে, তাদের নিরাপদ্ রাখবার ব্যবস্থা ঠিক আছে তো ?"

শঙ্কর অবাক্ হইয়া স্থিরভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। দেবী কি মানুষ? মেয়েমানুষ? এত বড় মর্ম্মান্তিক দুঃসংবাদ জানাইতে গিয়া তাহার নিজের অবিচল পাষাণ মনটাও একটুখানি টলিয়াছিল বুঝি! অথচ শিবানীর মুখের পাংশু বিবর্ণতা এক নিমেষে লুকাইয়া গেল কোথায় ?

শঙ্কর বলিল, "আশ্রয়ের ব্যবস্থা আগে থেকেই যা ঠিক ছিল, তাই আপাততঃ করা হচ্ছে। আপনি টাকার জোগাড় রাখবেন। দরকার বড্ড বেশী হবে। সেইজন্যেই এসেছি।"

"আচ্ছা।—কবে চান ?"

"আজ নয়। কিন্তু হয়তো শীগ্‌গিরই। সপ্তাখানেকের মধ্যেও হয়তো দরকার হ'তে পারে।"

"হুঁ।" বলিয়া শিবানী একটা নিঃশ্বাস ফেলিল।

শঙ্কর বলিল, "আসি।"

"আচ্ছা। খুব সাবধানে থাকবেন আপনি।"

উপরে উঠিয়া আসিয়া শিবানী সোজা ঘরে ঢুকিয়া দুয়ারটা পিছন হইয়া ভেজাইয়া দেয়ালের কাছে গিয়া টেলিফোন ধরিল। ডাক পড়িল মিসেস আগরওয়ালাকে।

—"আমি শিবানী—"

—"দু'হাজার টাকা চাই—"

—"দু তিনদিনের মধ্যে—"

—"আচ্ছা!"

—"হ্যাঁ, নিজে, নিজেই আসবেন—"

—"আচ্ছা।"

তারপরে চেয়ারের উপরে ধপাস্‌ করিয়া বসিয়া টেবিলে মাথা ঠেকাইয়া চক্ষু বুঁজিয়া রহিল। নিঃশব্দ, নিস্পন্দ দেহের মধ্যে হঠাৎ এক একবার হৃদযন্ত্রে মুহূর্মুহু দোলা লাগে, রক্তের ঢেউ বন্যার বেগে উর্দ্ধে ফুলিয়া উঠিয়া আকণ্ঠ যেন চাপিয়া ধরিতেছে, মাথার শিরাগুলিতে টন্‌টন্‌ করিয়া নাড়া দিয়া আবার পরমুহূর্ত্তে বিক্ষোভে ছড়াইয়া পড়িয়া অস্বাভাবিক শান্ত, নিস্তব্ধ, নিরুদ্ধ! বুক হইতে মাথায়, মাথা হইতে বুকে অনবরত ধাক্কা খাইতে খাইতে তাহার প্রাণশক্তির মধ্যে প্রচণ্ড তোলপাড় সুরু হইয়া গেল।

মিনিট কয়েক নিমীলিত চোখে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিয়া শিবানী চক্ষু মেলিয়া সামনের দেয়ালের গায়ে স্বামীজির প্রকাণ্ড চিত্রটির দিকে বিহ্বলভাবে চাহিয়া রহিল।

বাহিরে মা, কাকাবাবু এখনও গল্প করিতেছেন। শিবানী প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিল। হঠাৎ কাণে আসিল, সুরেশ ডাকিতেছেন, "শিবু ঘরে গিয়ে বস্‌লি যে? কাজ করছিস্ নাকি?"

সম্পূর্ণ সজাগ হইযা শিবানী বলিল, "না, মাথা ধরেছে বড্ড!"

মা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "রাতদিন লোকগুলো এসে যা জ্বালায, মাথা ধরবে না তো কি? তা' মাথা ধরেছে, ঘরের মধ্যে বসে রইলি কেন? বাইরে খোলা হাওয়ায এসে বোস।"

"যাচ্ছি।" বলিয়া শিবানী তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িল।

বাহিরে আসিতে কাকীমা বলিলেন, "দেখ শিবু, দিদিকে বলে রাখলাম—এবার গরমের ছুটিতে তোমরা কিন্তু আমাদের ওখানে বেড়াতে যাবে।"

শিবানী একটু হাসিয়া বলিল, "বেশ তো!"

"দিদি বল্‌ছেন, ওঁর নাকি কোথাও নড়াচড়া করা এক বিষম ব্যাপার, সারাটা জীবন গুপ্ত সাহেবের চাকরীর গতিকে ঘোরাঘুরি কর্ত্তে কর্ত্তে আর অরুচি ধরে গেছে।—তা হোক্, উনি যদি নিতান্ত না যান, তবে তোমরা দুজনে যেও কিন্তু—তুমি আর সুখু। বুঝলে?"

তেমনই একটু হাসিয়া শিবানী উত্তর করিল, "আচ্ছা, দেখা যাক্।"

রাত্রির দ্বিতীয়যামের নিঃস্পন্দ মৌন আর নিবিড় অন্ধকার। শয্যায় শুইয়া শুইয়া শিবানী অতন্দ্র, নিষ্পলক চোখে দেয়ালের দিকে চাহিয়া আছে। টিক্ টিক্ টিক্ টিক্ করিয়া ঘড়ির কাঁটার শব্দ কাণে আসিয়া বেঁধে আর মনে করাইয়া দেয়, সময় থামিয়া নাই। কিন্তু শিবানীর চোখে ঘুম যে আসে না। জানালার শিকের ফাঁক দিয়া একটা দূরের তারার আলো ঠিক তাহার চোখে আসিয়া থামিল। বুকের মধ্যটায় অকস্মাৎ মোচড় খাইয়া সে চোখ বুঁজিল,—দূর নক্ষত্রলোক হইতে আজ কি সুখু তাহাকে নূতন করিয়া ডাক দিল? ঐ উজ্জ্বল দীপ্তি, ঐ সহাস্য স্নিগ্ধতা! শিবানীর আকণ্ঠ বাষ্পে ভরিয়া উঠিয়া যে ব্যথাভার ঘনাইয়া তুলিতেছিল, আবার কেমন করিয়া পাৎলা হইতে হইতে তাহা সরিয়া উধাও হইয়া গেল। চোখ মেলিয়া গভীর দৃষ্টিতে নক্ষত্রলোকের পানে কতক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া সে যেন দেখিতে পাইল, তারার আলো মণ্ডলাকারে বিস্তৃত হইতে হইতে সারা আকাশময় আলোক ছড়াইয়া দিল,—উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল ধরণী, উঠিল ভারতবর্ষ, উঠিল জালালাবাদ পাহাড়।

উঃ! জালালাবাদ!—জালালাবাদ!—সুখু! পলকে মানস-চোখে সুখেন্দুর রক্তাক্ত ছিন্ন কলেবর শিলাতলে ধুলায় লুটায়!

২৩

টেবিলের উপর একগাদা কাগজ পত্র বইএর সঙ্গে সচিত্র একখানা মাসিকপত্রিকা পড়িয়া ছিল। সুপ্রসন্ন সকালবেলা ফেলিয়া থাকিবে হয়তো। দৈনন্দিন আফিসের কাজের পর অন্তহীন বাহিরের কাজের গুরুতর ভীড়ে ঠাসাঠাসি হইয়া ব্রতীন্দ্রের চব্বিশ-ঘণ্টার আর কিছুই বাকী থাকে না। উহারই মধ্যে কোনগতিকে দৈনিক খবরের কাগজখানার জন্য একটু সময় সংকুলান করিয়া লইতে হয়, কিন্তু বাজে অর্থাৎ সাহিত্য সমাচার পড়িবার কোনও সম্ভাবনাই জোটে না। যে দুইখানি চিঠি টাইপ্ করিবার সংকল্প ছিল আজ, এইমাত্র তাহা শেষ হইয়া গিয়াছে! ব্রতীন্দ্র টাইপরাইটারটা ঠেলিয়া একটা বিশ্রামের নিশ্বাস ফেলিয়া সোজা হইয়া বসিল। মাসিক পত্রিকাখানার প্রচ্ছদপটের দিকে অন্যমনে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে ভাবিল, আর কিছু কাজ করিবার আছে কি না।

জানালা দিয়া আচম্‌কা এক একটা হাওয়ার ঢেউ ঘরে আসিয়া ঢুকিতেছে। তাহারই একটা ধাক্কা লাগিয়া ফর্ ফর্ করিয়া পত্রিকার পাতাগুলি উল্‌টাইয়া যায়। অৰ্দ্ধোন্মুক্ত বইখানার মাঝখানে একটা পাতার শীর্ষে হঠাৎ ব্রতীন্দ্রের চোখ পড়িল। কৌতূহলভরে পত্রিকা-টানিয়া লইয়া খুলিয়া দেখে, শিবানীগুপ্তার লেখা আর লেখিকার ছবি।—চেয়ারের পিছনে ঠেস্ দিয়া পায়ের উপর পা তুলিয়া অনেকদিন পরে ব্রতী আজ একবার বাজে সাহিত্য লইয়া বসিল।

আকাশের কোণে একটু একটু করিয়া মেঘ জমিয়া গিয়াছে, দেখিতে দেখিতে নবনীলাভকান্তি ধূসর হইয়া আসিয়াছে, তাহার বুক মন্থন করিয়া ঘন ঘন নিঃশ্বাস সজোরে ছুটিয়া বাহির হয়—শন্ শন্, শোঁ শোঁ। জানালার কপাটগুলি বাতাসের বেগে ঝটাপট শব্দে একবার বন্ধ হইয়া যায়, একবার খোলে। দেখিতে না দেখিতে যেন একটা তাণ্ডবনৃত্য স্থরু হইল। একাগ্রমনে পড়িতে পড়িতে ব্রতী যখন সাঙ্গ করিয়া মাথা তুলিল, তখন বাহিরে দেখে কাল-বৈশাখীর প্রলয় ঝড়। ছবিখানির দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া শেষ পৃষ্ঠার কাছে একটা আঙুল রাখিয়া বই বন্ধ করিয়া সে অন্যমনস্কভাবে বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল। জানালার কবাট দুইটা আবার প্রবলবেগে বন্ধ হইয়া গেল। ঘরখানি থমথমে অন্ধকার। ব্রতীন্দ্র ধীরে উঠিয়া গিয়া জানালাটা সম্পূর্ণ খুলিয়া দিয়া ভালো করিয়া হুড়কা আঁটিয়া বাহিরের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইল। উদ্দাম পবনের বেগ সোজা তাহার মুখে আসিয়া লাগে, আর কোঁকড়ানো চুলগুলি আরও বিপর্য্যস্ত হইতে থাকে। গায়ে জড়ানো ধুতির খুঁট ভেদ করিয়া সে প্রচণ্ড ধাক্কা আসিয়া বুকে ঠেকে। ব্রতীর নির্নিমেষ চোখের তারা সুদূর মেঘের গায়ে নিবদ্ধ হইয়া গিয়া কখন যে নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে নিজেও জানে না। তাহার গম্ভীর মুখশ্রী গম্ভীরতর হইয়া উঠিল। পত্রিকাখানা হাতের মধ্যে তেমনই রহিল।

সুপ্রসন্ন হুড়মুড় করিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল, "একেবারে ঠিক সময়ে এসে পৌছেচি। বা—ব্বাঃ, কি দারুণ ঝড় আসছে।"

ব্রতীন্দ্র মৌনমুখে জানালার কাছ হইতে ফিরিয়া আসিয়া খাটের প্রান্তে বসিল।

পাশে বসিয়া পড়িয়া সুস্থির হইয়া সুপ্রসন্ন বলিল, "টাকা পাওয়া গেল না, ব্রতী।"

আশ্চর্য্য হইয়া ভ্রূ দুইটা একটু কুঞ্চিত করিয়া ব্রতী বলিল, "পাওয়া গেল না ?"

"উঁহুঁ।"

"তার মানে ?"

"মানে তো যা বুঝতে পার্চ্ছি, তুমি নিজে না গেলে আদায় হবে না।"

ব্রতীন্দ্র গম্ভীরভাবে নিজের মনে বলিল, "হুঁ।"

সুপ্রসন্ন বলিল, "এমন তেমন যদি বেশী দেখি তো শেষ পর্য্যন্ত জোর দেখানো ছাড়া উপায় নেই। ডাকাতি কি আর সাধে করে কেউ ?"

ব্রতী আবার তেমনি চিন্তিতভাবে বলিল, "হুঁ।"

টপ্ টপ্ করিয়া বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা নামিয়া পড়িল। সুপ্রসন্ন চক্ষু কুঁচকাইয়া বলিয়া উঠিল, "ঐঃ! বৃষ্টি নেমে গেল আবার! আজ বেরুনো শক্ত হবে।"

বাহিরের উন্মাদনৃত্যের দিকে চক্ষু মেলিয়া ব্রতীন্দ্র বলিল, "ও কিছু নয়, কেটে যাবে এক্ষুণি।"

"তাহলে আজই সন্ধ্যেবেলা চল ওঁকে গিয়ে আবার ধরোয়া করি।"

ব্রতী বলিল, "আজ থাক্।"

"কেন ?"

"দেবীর ওখানে আজ একবার যাওয়া দরকার।"

"সেটা আজ না গেলে চলে না ?"

সেকথার উত্তর না দিয়া ব্রতী জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যারিষ্টার মশায়ের কাছে কখন গেছ্‌লে ?

"এই তো দুপুরবেলা !

"হুঁ।" ব্রতী ভাবিয়া বলিল, "তাহলে আজ থাক্, কাল যাব। দেবীকে সন্ধ্যের পরে না গেলে পাওয়া যায় না।"

"আচ্ছা।" বলিয়া সুপ্রসন্ন বিছানার উপর ঠেস্ দিয়া পা তুলিয়া বসিল খানিকপরে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "দেবীর বয়স কত ব্রতী ?"

"কেন ?"

"এমনি।"

ব্রতী বলিল, "বছর তিরিশেক হতে পারে।"

"মাত্র !! তোমার আর শঙ্করবাবুর মুখে তাঁর যেরকম মহিমা শুন্তে পাই, বয়স আর একটু বেশী হলে মানাত !"

ব্রতী একটু হাসিয়া বলিল, "বয়স দিয়ে কি যোগ্যতার বিচার করা চলে ?

তা অবশ্য চলেনা—সুপ্রসন্ন মনে মনে জানে ; কারণ, ব্রতীর চেয়ে সুপ্রসন্নর নিজেরই বয়স বেশী। সে একটু থামিয়া থাকিয়া আবার বলিল, "দেবী দেখ্‌তে কেমন হে ?"

ব্রতী হাত হইতে খসিয়া-পড়া পত্রিকাখানার পাতা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে সংক্ষেপে উত্তর দিল, "ভালোই।"

সুপ্রসন্ন কৌতুকহাস্যে ব্রতীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বড্ড কৌতূহল হচ্ছে আমার!"

ব্রতীন্দ্র কি মনে করিয়া মাথা তুলিয়া ক্ষণেক সুপ্রসন্নর চোখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইল। সুপ্রসন্ন তখনও একটু একটু হাসে।

এমন সময়ে দরজার সাম্নে আসিয়া দেখা দিল অনিমেষ।

সাম্‌নে আসিয়া ব্রতীন্দ্রের পায়ের ধূলা লইয়া অনিমেষ দাঁড়াইতেই সুপ্রসন্ন বলিয়া উঠিল, "কি হে?"

চেয়ারখানা দেখাইয়া ব্রতী বলিল, "বোসো। তারপর কবে এলে?"

সযত্নে ভাঁজকরা ধব্‌ধবে যে চাদরখানি নিপুণ পারিপাট্যের সঙ্গে তাহার কণ্ঠ ও স্কন্ধ বেষ্টন করিয়া ঝুলিতেছে, তাহার আলম্বিত প্রান্তভাগ সন্তর্পণে গুটাইয়া লইয়া অনিমেষ যতক্ষণে চেয়ারে অধিষ্ঠান করিয়া বসিল, ততক্ষণে ব্রতীন্দ্র তাহার আপাদমস্তক একবার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লইয়াছে।

অনিমেষ বলিল, "এই মাস খানেক হল। ভালো আছেন তো আপনি?"

ব্রতী বলিল, "হুঁ।—জেল-লাইফ্ কেমন লাগ্‌লো?"

"ওঃ, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি অনেক!

ব্রতী হাসিয়া বলিল, "সত্যি?"

একথা সেকথা নানাকথা ও কুশলসংবাদাদির পর অনিমেষ

বলিয়া বসিল, "ব্রতী-দা, কম্‌রেড রয় আপনার সঙ্গে একবার দেখা কর্ত্তে চান।"

সুপ্রসন্ন ভ্রূ টানিয়া বলিয়া উঠিল, "কমরেড্ রয়টি কে হে, অনিমেষ?"

বিস্ময়প্রকাশ করিয়া অনিমেষ বলিল, "চেনেন না? একজন নামজাদা লেবার লীডার!"

ব্রতী জিজ্ঞাসা করিল, "কি দরকার বল্‌তে পার?"

"দেশের future programme সম্বন্ধে আলোচনা করবেন বোধ হয়।"

সুপ্রসন্ন বলিয়া উঠিল, "বর্ত্তমান না ফুরোতেই future?"

অনিমেষ একবার তাহার মুখের দিকে চাহিল মাত্র, উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করিল।

ব্রতীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "রয়কে তুমি পেলে কোথায়, অনিমেষ?"

জেল হইতে সে ফিরিয়াছে মাসখানেক; ইহার মধ্যে তাহার চিরদিনকার মাননীয় দলপতি ব্রতীদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার সময় হয় নাই, অথচ কমরেড্ রয়ের সঙ্গে কি করিয়া ইহারই মধ্যে আলাপ জমিয়া গিয়াছে, উত্তর দিতে গিয়া হঠাৎ অনিমেষের কেমন একটু যেন লজ্জা করিল। কিন্তু সপ্রতিভ ভাবে বলিল, "জেলে কয়েকটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তারাই এঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। খুব বিদ্বান্, খুব well-informed লোক ইনি।"

সুপ্রসন্ন কৌতুকে হাসিয়া বলিল, "কম্যুনিষ্ট্ নাকি ?"

"হুঁ।"

ব্রতী স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "কম্যুনিজ্ম্টা তোমাব খুব ভালো লেগেছে বুঝি ?"

"সত্যি বলতে কি ব্রতীদা, যতই আমি study কবছি, ততই দিনে দিনে আমাব কাছে appeal করছে বেশী।"

"কোন্ দিক্টা ?"

অনিমেষ সোৎসাহে বলিল, "সবই। অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি এর প্রত্যেকটাকেই কম্যুনিজ্ম্ একটা নূতন রূপ দিয়েছে এবং আমি বুঝতে পাবছি সেইগুলোই তাব খাঁটি রূপ। সেইদিকেই এখন থেকে আমাদেব work কর্ত্তে হবে।"

সুপ্রসন্ন মাঝখান হইতে বলিল, "এ নবধর্ম্ম গ্রহণ করলে কবে থেকে হে ?"

অনিমেষ বিবক্ত হইয়া জবাব দিল, "ঠাট্টা কবলেই তো সত্যকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, সুপ্রসন্নদা !"

"ঠাট্টা নয়, অনিমেষ। ধর্ম্মান্তব গ্রহণ কববাব আগে ভাবনাচিন্তা কর্ত্তে একটু সময় লাগে তো ? তাই বলছি, তোমাব conversionটা এত শীগ্গির হয়ে গেল—একটা জেলবাসেব মধ্যেই ? কি সাংঘাতিক জোরালো মন্ত্র !"

অনিমেষ কটাক্ষ করিয়া বলিল, "এব আগে converted হতেও তো এর চেয়ে বেশী সময় লেগেছিল বলে মনে পড়ে না !"

ব্রতী হাসিয়া বলিল, "তাই না কি ?"

নিজের কথাটাতে অনিমেষ মনে মনে একটু অপ্রতিভ হইয়া বালল, "সত্যি বল্‌তে কি, ব্রতীদা, ওরা sound principleএর ওপরে দাঁড় না করিয়ে কাউকে দলে টানবার চেষ্টা করে না।"

ব্রতী জিজ্ঞাসা করিল, "সে ভালো। আচ্ছা, sound principle তৈরী করবার জন্যে কি কি বই পড়তে দেয় ওরা ?"

"কেন, সব রকমেরই পড়ানো হয়! দেশবিদেশের ইতিহাসের কথা, ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস, রুশবিপ্লবের ইতিহাস, লেনিনের বই, মার্ক্‌স্‌, এঙ্গেল্‌স্‌, বুখারিন্‌, ক্রপ্‌টকিন এঁদের সব লেখা—dialectic meterialism, socialism —"

অনিমেষ এক নিঃশ্বাসে আরও অনেকখানি বলিয়া যাইবার আশা রাখিযাছিল, কিন্তু ব্রতী মধ্যপথে আস্তে বাধা দিয়া বলিল, "বেশ বেশ, হয়েছে। ওগুলো পড়া খুব দরকার। কিন্তু ভারত-বর্ষের ইতিহাস পড়ায না ?"

অনিমেষ খানিকটা তাচ্ছিল্যভরে বলিল, "ও তো সবাই জানে !"

"কি জান ?"

অনিমেষ অবাক্ হইয়া তাকাইল।

ব্রতী আবার বলিল, "পড়েছ ভারতবর্ষের ইতিহাস ?"

"হুঁ—।" লম্বা একটা টান দিয়া অনিমেষ উত্তর দিয়া ফেলিল।

ব্রতী বলিল, "থার্ড ক্লাস পর্য্যন্ত বুঝি ?"

অনিমেষ মনে মনে একটু সঙ্কুচিত হইযাও বাহিরে সগর্ব্বে বলিল, "ওতেই কাজ চলে।"

"বাংলাদেশের ইতিহাস ?"

"সেটা পড়িনি।"

ব্রতী আবাব বলিল, "ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস! সে গুলো তো জানো সব—না ?"

অনিমেষ উৎসাহ সহকারে উত্তর দিল, "হ্যাঁ—সব জানি।"

"আর ভারতবর্ষের সিপাহী-বিদ্রোহেব খবরটা ?"

"তাও জানি।"

সুপ্রসন্ন বলিযা উঠিল, "সেটা বুঝি পূর্ব্ব আমলেব শেখা ?"

অনিমেষ তাচ্ছিল্যহেতু উত্তর দিল না। আসলে উত্তর দিবার ছিলও না কিছু, কারণ, কথাটা ঠিকই। ব্রতীন্দ্রের জেরাব পাল্লায পড়িযা অনিমেষ যুগপৎ বিপন্ন ও উত্যক্ত হইযা পড়িতেছিল। অথচ ব্রতী আবার প্রশ্ন করিযা বসিল, "Dialectic Materialism পড়েছ বলছিলে, না ? ভগবান্ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু পড়নি ? লেনিনের সেই বইখানা ?"

"হুঁ। ওই ধরণের আরও অনেক। God এবং Religion সম্বন্ধে অনেক লেখা পড়েছি।"

"সাংখ্যদর্শন ? বেদান্তদর্শন ? ভাগবত ?"

অবজ্ঞাভরে একটু হাসিযা অনিমেষ বলিল, "আপনাকে নিযে

তো আর পারা যায় না ব্রতীদা! ওসব সংস্কৃত পুঁথিপত্র নিয়ে বাজে সময় কাটানো কি আজকালকার কাজের যুগে পোষায়? কাজ নেই, কর্ম্ম নেই, বসে বসে যারা টিকি আর টোল সামলাচ্ছে, ওসব সেই অকর্ম্মা পণ্ডিতদেরই কাজ। আমাদের নয়!"

ব্রতীন্দ্র হাসিয়া বলিল, "উপনিষদ্ বা গীতা ?"

"তাও পড়িনি।"

ব্রতীন্দ্র বিস্ময় প্রকাশ করিয়া সহাস্যমুখে বলিল, "এক-খানাও না ?"

"ন্নাঃ!"

"অন্ততঃ পক্ষে অরবিন্দের 'গীতার ভূমিকা' ?" বলিয়া ফেলিয়াই সুপ্রসন্ন স্বয়ংই আবার উত্তর যোগাইল, "সেখানা হয়তো কোনকালে পড়া থাক্‌তেও বা পারে। না অনিমেষ ?"

অনিমেষ হঠাৎ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমার আর সময় নেই।—কমরেড্ রয়কে গিযে কি বলব ব্রতীদা ?"

"বোলো—দেখা কর্ত্তে আমার আপত্তি নেই।"

অনিমেষ চলিয়া যাইতে না যাইতেই সুপ্রসন্ন বলিল, "বলেছিলাম কিনা সেদিন? দেখলে তো মজাটা, একেবারে ভোল বদলে গেছে!"

ব্রতীন্দ্র একটু অবজ্ঞাভরে বলিল, "নির্ব্বোধ।"

ঝড়ের বেগ কখন্ থামিয়া গিয়াছে; ঝম্ ঝম্ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়া এখন আছে তারই একটু বিদায়মন্থর গতি। ব্রতী

আকাশের জলধারার দিকে একবার চাহিয়া ঘড়ির দিকে একবার তাকাইল। তারপর উঠিয়া গিয়া জামা পরিয়া ইস্তাহার দুইখানি পকেটে পূরিয়া সুপ্রসন্নকে বলিল, "ওঠ, এবার বেরুতে হবে আমার।"

"দেবীর কাছে নাকি ?"

"হুঁ।"

২৪

মেসের ঘরে ব্রতীরা যখন অনিমেষকে লইয়া যাচাই করিয়া দেখিতেছিল, সেই সময়টিতে শিবানী তাহার ঘরের মধ্যে বসিয়া পশ্চিমের জানালার পথে চাহিয়া চুপ করিয়া আছে। বারান্দা ছাড়াইয়া রাস্তার খানিকটা অংশ চোখে পড়ে; কিন্তু শিবানীর চোখ সেদিকে নাই। সে তাহার বড় বড় দুটি চক্ষু আরও বিস্তৃত করিয়া মেলিয়া আছে সেইদিকে—যেখানে বৈশাখী ঝড়ের মাতাল পাখার ঝাপটা পরিপূর্ণ দেখা যায়, যেখানে আকাশের অস্বাভাবিক ধূম্র-পাটল আভা ক্রমে মেঘের ভ্রূকুটির ঘনান্ধকারে ভয়াল হইয়া আসিতেছে। ঘরের মধ্যে আর কেহ নাই। যদি থাকিত, তবে সে দেখিতে পাইত—শিবানীর চোখের দীপ্তিতে একবার ঐ প্রলয়াকাশের মতই অদ্ভুত আগুন ধরিয়া যাইতেছে, আবার ধীরে ধীরে থম্‌থমে, গাঢ়, অবিচল এক স্তব্ধতা, যাহার মর্ম্মভেদ করিবার সাধ্য কাহারও নাই।

বারান্দার রেলিংএর গায়ে সুখুর সখের-রোওয়া অপরাজিতা লতাটি জড়াইয়া উঠিয়াছে, ঝড়ের গতির পিছন পিছন ধাবমান তাহার চোখের দৃষ্টি তাহারই পল্লবে প্রতিহত হইয়া হঠাৎ সেইখানেই স্থির হইয়া রহিল। গত বছর ঠিক এমনি দিনে সুখু যেদিন মহা উৎসাহে ছোট্ট চারাটি লইয়া সর্ব্বপ্রথমে দিদির ঘরে দেখাইতে আনিয়া হাজির করিল, আজিকার এই ঘনসবুজ ফিকে-সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে ঘননীল ফুলের উঁকির মধ্যে সেই দিনটি যেন আসিয়া হঠাৎ উঁকি দিল। অকস্মাৎ কালবৈশাখীর ঝড়ের মত একটা ভয়ঙ্কর নিঃশ্বাস শিবানীর বুকের পাজর ভেদ করিয়া বাহিরে ছুটিয়া আসিয়া মিলাইয়া গেল।

অসময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ সশব্দে ভেজানো দুয়ারটা ঠেলিয়া রমেশবাবু ঘরে ঢুকিয়াই ডাকিলেন, "শিবু!"

তাঁহার পাদুকাক্ষেপের অসম্ভব দ্রুতদাপে ও কণ্ঠস্বরের কঠিনতায় চমকাইয়া উঠিয়া শিবানী বলিল, "কি বল্‌ছ?"

কোনও ভূমিকামাত্র না করিয়া রমেশ সোজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুখু কোথায় গেছে, জান?"

সহজ বাৎসল্য-সম্পর্কের "তুই" সম্ভাষণের পরিবর্ত্তে যখনই রমেশবাবুর মুখ দিয়া "তুমি" বাহির হইয়া পড়ে, ছেলেমেয়েরা তখনই জানে, কোথায় কিছু একটা গলদ্ ঘটিয়াছে নিশ্চয়! সুতরাং শিবানী মনে মনে সতর্ক হইয়া সহজভাবে বলিয়া ফেলিল, "কেন, কক্স্‌বাজারে!"

রমেশবাবু মিনিট্‌খানেক গুম্ খাইয়া থাকিয়া বলিলেন, "হুঁ।"

শিবানী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ? হয়েছে কি বাবা ?"

রমেশ চেয়ারের উপর সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া বসিয়া গুরুগম্ভীর আওয়াজে ধীরে বলিলেন, "আই, বি, থেকে পুলিশ অফিসার এসেছিলেন একজন।"

আশ্চর্য্যভাবে শিবানী বলিল, "পুলিশ অফিসার ? কখন্ ?"

"এইমাত্র। এক্ষুণি বিদেয় হয়ে গেলেন।—তিনি তলব দিয়ে গেলেন আমাকে আজ যেতে হবে—একটা identification-এর জন্যে।" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই রমেশবাবু আবার একটু থামিলেন।

"কিসের identification বাবা ?"

"একটা মৃতদেহ সনাক্ত কর্ত্তে হবে, দেখতে হবে সুখুর দেহ কিনা।" রমেশের গলার আওয়াজটা কেমন যেন অস্বাভাবিক শুষ্কতায় জড়াইয়া আসিল।

শিবানীর বুক মোচড়াইয়া উঠিল। এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া ফেলিল, "সে কি, বাবা !!!"

রমেশ উত্তর করিলেন না।

শিবানী বলিল, "এ হতে পারে না কক্ষণো ! তোমার বিশ্বাস হয় বাবা ?"

রমেশ চিন্তিতমুখে শুষ্কস্বরে বলিলেন, "জানিনে।"

রমেশ হঠাৎ শিবানীর মুখের দিকে চোখ তুলিয়া তাকাইলেন। শিবানীর বিষণ্ণ গম্ভীর মুখের এই সহজ কথাগুলি অকৃত্রিম জোরের সঙ্গে তাঁহার কাণে বাজিয়া কেমন যেন গভীর শ্লেষের মত শুনাইল।

তিনি মুহূর্ত্তের জন্য নিজেকে, মেয়েকে, মেয়ের কথাগুলিকে ও নিজের এই মুহূর্ত্তের পারিপার্শ্বিকতাকে—কাহাকেও যেন বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।

কথাটা বলিয়া শিবানী রমেশের মুখের দিকে চাহিয়া দেখে—তাঁহার চিরকঠিন, দাম্ভিক মুখের উপর এমন ফ্যাকাশে মলিনতা আর কোনদিন সে দেখে নাই। বুদ্ধিদীপ্ত প্রখর দৃষ্টি কেমন যেন ফ্যালফেলে হইয়া গিয়াছে।

রমেশবাবু খানিকক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিয়া নিজের মনেই বলিলেন, "আমি কিছু বুঝতে পার্চ্ছিনে!"

"তাই তো!"

"তোর মা কোথায় রে শিবু?"

শিবানী ব্যস্ত হইয়া বলিল, "মাকে এখন বোলো না বাবা! মা সইতে পারবেন না।"

"লুকিয়ে তো আর রাখা যাবে না!"

"তা হোক্! তবু আগে বলে লাভ কি? যদি সত্যি নাই হয়ে থাকে! মাকে একটা বাজে কারণ দেখিয়ে তুমি আজ চলে যাও, আমি এদিকে ততদিনে তাঁকে বুঝিয়ে রাখব।"

রমেশবাবু গুরুগম্ভীরমুখে ভাবিতে লাগিলেন।

বিভা আজকাল বই পড়ে—বাংলা ও ইংরাজী হরেক রকমের নূতন নূতন বই, কিন্তু শরৎচন্দ্র অথবা হল্‌ফেন, হাচিনসনের বই নয়। পত্রিকাও পড়ে, কিন্তু মাসিক সাহিত্য পত্রিকার চেয়ে দৈনিক সংবাদপত্রের দিকে সময় যায় বেশী। সেই যে সেদিন ব্রতীন্দ্র প্রথম একখানা বই আনিযা তাহার হাতে দিল, তারপরে আসিল ভারতের রাজনীতিক, সমাজতান্ত্রিক নানারকম বই। সেই হইতে এখন বিভাকে প্রায়ই দেখা যায়—সময় পাইলেই ঘরের মধ্যে, রেলিং-এর পাশে, অথবা ছাদের কোণে বই হাতে লইয়া বসিয়া আছে। পড়িতে বিভার বড় যে বেশী ভালো লাগে তাহা নয়, কিন্তু তবু যেন ভালোই লাগে না পড়িয়া যেন পারে না, কারণ ব্রতীদার ভালো লাগে, ব্রতীদা বলিয়াছে, এগুলি ভালো বই। মনের আগ্রহ একত্র জমাইয়া মনোযোগ দিয়া বই পড়িতে যখন বসে, তখন পড়িতে পড়িতে এক একদিন কেমন যেন অস্পষ্ট একটি ছবি ভাসিয়া উঠে—যে ছবি সে আগে কখনও দেখে নাই, যে ছবি নিজেকে মুছিয়া, নিজের চারিপাশের জগৎ মুছিয়া শুধু ভারতবর্ষের একখানি অপরূপ রূপ ফুটাইয়া তোলে, মায়ের হাসি লইয়া সে ভারত তাহাকে কেমন যেন একটু একটু টানে। আবার হঠাৎ সব মুছিয়া গিয়া সমস্ত দৃশ্যপট জুড়িয়া হাসিতে থাকে ব্রতীদা, বিভার বুকের মধ্যে কি রকম যেন

দোল খাইতে থাকে আর হাতের বইখানা খসিয়া পড়ে কোলের উপর, বিভা আনমনে আকাশের দিকে তাকায়, আর মনে হয় যেন আকাশ বাতাস পৃথিবী রসে আর রঙে টইটম্বুর হইয়া রহিয়াছে।

আজও ঠিক তেমনি হইয়াছে। বাঁ হাতের একটা আঙুল দিয়া বইএর পাতাটা ধরিয়া রাখিয়া রেলিংএর গায়ে ডান হাতের কনুই ঠেকাইয়া গালে হাত দিয়া বিভা চাহিয়া দেখিতেছে, অদূরবর্ত্তী বাড়ীটার ফাঁক দিয়া যেখানে একটুক্‌রা নীল আকাশ উঁকি দেয়। পশ্চিমযাত্রী সূর্য্যের সোণালী রশ্মিগুলি মহাপাড়ি দিয়া পুবের ঐ আকাশটুকুতে একটা প্রলেপ বুলাইয়া দিয়াছে শুধু, ঝল্‌সাইয়া দেয় নাই, চোখের দৃষ্টিকে আঘাত করে না। বিভার কালো চোখ দুইটি সেইখানে আবছায়া মেঘের গায়ে ইন্দ্রপুরী দেখে। দেখে অথচ দেখেও না, কেমন যেন চেতনা আচ্ছন্ন হইয়া আছে, অবচেতনার দুয়ার দিয়া একটির পর একটি পরীমূর্ত্তি বাহির হইয়া আসে, আলোয় আলোয় সব ভরিয়া উঠে, উৎসবের নৃত্য লাগিয়া যায় তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া যেন। বিভা পুলকে শিহরায়, অকারণে অজান্তে শাড়ীর আঁচলখানা বুকের উপর দিয়া আবার ভালো করিয়া টানিয়া দেয়।

এমন সময় ভিজিটার্স রুমে ব্রতীন্দ্র আসিয়া হাজির।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ঘর হইতে ছোট্ট একটা মেয়ে আসিয়া খবর দিয়া গেল।

“ইণ্ডিয়া ইন্ বণ্ডেজ্”খানা তাড়াতাড়ি তুলিয়া লইয়া বাক্সবন্দী

করিয়া বিভা যখন নীচে আসিয়া দাঁড়াইল, ততক্ষণে তাহার বুকের রক্ত চন্‌চন্‌ করিয়া সমস্ত শিরায় শিরায় ধাক্কা দিতে সুরু করিয়াছে। নিজের কাছে চাপা দিবার উপায় নাই, কিন্তু ব্রতীদার চোখের পানে চাহিয়া বিভা বিষম গম্ভীর ভঙ্গীতে বলিল, "এত শীগগির যে এলে বড়? বইএর জন্যে তাড়া দিতে বুঝি? ও আমার এখনও পড়া হয়নি।"

ব্রতী বলিল, "না, না, তাড়া দিতে আসিনি। আস্তে সুস্তে ভালো করে পড়। এলাম এমনিই।"

"আজকাল তোমার কাজ বুঝি একটু কম?"

"সমানই।"

বিভা বলিল, "তাহলে সময় পাও কি করে? আগে তো কাজের ব্যাঘাত করে আস্‌তেনা কক্ষণো?"

ব্রতী হাসিয়া বলিল, "তোমাকে দেখতে আসাও কি একটা কাজ নয়?"

বিভার গাল দুইটা কেমন যেন লাল হইয়া উঠিল। ব্রতীর মুখ হইতে চোখের দৃষ্টি ফিরাইয়া না আনিয়া পারিলনা। অন্যদিকে চাহিয়া জবাব দিল, "বড্ড সৌভাগ্য দেখছি!"

ব্রতীন্দ্র বিশেষ ভণিতা না করিয়া বলিল, "চল তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যাই।"

বিভা একেবারে অবাক্ হইল; বলিল "কোথায়?"

"যেখানে হয়!"

রক্তধারায় এমন একটি আনন্দের মাতামাতি সুরু হইল যে বিভা

রাঙা কপোল তুখানির নির্লজ্জতাকে কোনমতেই শাসন করিতে না পারিয়া সংক্ষেপে শুধু বলিল, "চল।"

ব্রতীন্দ্র তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কথা বলিতেছিল, হঠাৎ আস্তে চোখ ফিরাইয়া লইল।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ভিতরের বাগানটাতে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া তুইজনে আসিয়া বসিল তাহার বাহিরে রাস্তার পাশে সবুজ মাঠটির একধারে—যেখানে মেমসাহেবদের শিশুরা আয়ার সঙ্গে খেলা করে, আর রঙীন ফানুস উড়ায়, আর কাহাকেও বড় একটা দেখা যায় না; দেখা যায়, রাস্তায় ভোঁস্ ভোঁস্ করিয়া মোটরগাড়ীগুলি ক্রমাগত আসে আব যায়। নিমজ্জমান সূর্য্যের আলো গোধূলির রঙে বিচিত্র হইয়া বিভার কপালে ও কপোলে আসিয়া খেলা সুরু করিয়াছে, কালো আঁখিপল্লবে ঢাকা কালো চোখের কোণগুলি ঘন নিবিড়। ব্রতীন্দ্র ইচ্ছা করিলে দেখিতে পাইত, এমন অপরূপ লাবণ্য বিভার মুখে ও অবয়বে আর কখনও সে দেখে নাই। কিন্তু বিভার মুখে তাহার চোখ ি । না, ছিল সাম্নের ঐ প্রকাণ্ড স্মৃতিসৌধের অভ্রভেদী শাদা চূড়ায়।

বিভার মন কেবলই কি যেন কথা বলিতে চাহিতেছে, অথচ বলিবার মত কোনও কিছু খুঁজিযা পায় না। অসহায় হইয়া পায়ের আঙুলের ডগাগুলি দিয়া নিরীহ দুর্ব্বাদলকে দলিয়া মুচ্ড়াইয়া দিতে দিতে এক একবার শুধু পশ্চিমের আকাশের পানে মুখ তুলিয়া তাকায, এমন সময় ব্রতী জিজ্ঞাসা কবিল, "বইগুলো কেমন লাগছে বল দেখি?"

বিভা খানিকটা যেন হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল। উত্তর দিল, "ভালো।"

"পড়ে কি মনে হয় ?"

কি যে মনে হয় তাহা বিভা এখনও ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। পড়ে এবং একটু একটু ভালোও লাগে, কিন্তু মনে হয় না বিশেষ কিছু। সে একটু ভাবিয়া বলিল, "মনে হয়, আমাদের দেশ এককালে খুব বড়ই ছিল, কিন্তু আজ আর নেই।"

"তার পরে ? আর ?"

"আর কি ? আর কিচ্ছু না !"

"মনে হয় না, সে আবার বড় হবে ?"

বিভা নিশ্চিন্তস্বরে বলিল, "হবে হয়তো !"

"যদি না হয় ?"

"না হলে আর কি করা যাবে ?"

"ক্ষতি নেই কিচ্ছু, কি বল ?"

বিভা প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "ক্ষতি তো আছেই।"

"তাহলে ?"

"তাহলে কি ? না যদি হয়, উপায় তো কিচ্ছু নেই !"

ব্রতী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "উপায় থাক্ বা নাই থাক্, ভারতবর্ষকে বড় যে হতেই হবে, একথা মনে হয় না কখনও ?"

বিভা বলিল, "উপায় না থাক্লে হবে কি করে ? তোমার কথার কোনও মানেই হয় না !"

"বড় হবে বলে যে পণ করে, উপায় তার কাছে আপনি আসে।"

বিভা বলিল, "এলে তো ভালোই! কিন্তু যদি না আসে?"

"যদি না আসে তাহলে সে মরে। মানী যে, ছোট হয়ে সে কখনও বাঁচে না। ভারতবর্ষও ছোট হলে, বাচ্‌বে না।"

বিভা ব্রতীন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

ব্রতী ধীরে বলিল, "আত্মসম্মান মানুষের সব চেয়ে অমূল্য জিনিষ, বিভা। একে খুইয়ে ফেল্‌লে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এই জিনিসটি নেই বলেই অমন নির্ব্বিবাদে বলতে পারলে—ভারতবর্ষ বড় না হতে পারলে তোমার করবার কিছুই নেই।"

আত্মসম্মানের খোঁচা খাইয়া বিভার আত্মসম্ভ্রম জাগিয়া উঠিল। সে মাথা দোলাইয়া বলিল, "কক্ষণো না, আত্মমর্য্যাদাবোধ আমাদের যথেষ্ট আছে!"

ব্রতী একটু হাসিয়া বলিল, "আছে? বেশ কথা!"

বিভা আর কিছু বলিল না।

"কতটুকু?"

বিভা একটু রাগ করিয়া বলিল, "অত শত মেপে জুপে দেখিনি!"

ব্রতী বলিল, "ঠাট্টা করছি না, বিভা। সত্যি করে বল, আমি সত্যি জান্তে চাই।"

বিভা মুখ তুলিয়া চাহিতেই ব্রতীন্দ্রের চোখের তারায় চোখ ঠেকিয়া গেল। ব্রতীর যে ঘনায়মান দৃষ্টি তাহারই দিকে স্থাপিত

হইয়া আছে, বিভা স্পষ্ট দেখিতে পাইল, তাহা যেন অসীম দূরে। সে আস্তে আস্তে বলিল, "সত্যি আমি জানিনে। তবে দেশের এই অবস্থা পুষে রাখবার আমার কিছু মাত্র সাধ নেই, এটুকু ঠিক বুঝতে পারি।"

ব্রতীন্দ্র গম্ভীর মুখে বলিল, "হুঁ।"

"বিশ্বাস করছ না বুঝি ?"

আবার,—"হুঁ।"

ব্রতীর মৌন-মুখের দিকে বিভা কতক্ষণ চাহিয়া রহিল, ব্রতী দেখিল না। ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস তাহার বুকের আবরণ ছাপাইয়া বাহির হইয়া আসিল।

খানিক পরে সসঙ্কোচে নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া সে জিজ্ঞাসা করে, "তুমি বুঝি ভাব আমি দেশকে ভালোবাসি না ?"

"বাস্‌তে শিখো একটু একটু।"

আবার একটু চুপ করিয়া আর একটা নিঃশ্বাস আলগা করিয়া দিয়া বিভা বলিল, "দেশকে যে ভালো না বাসে, তুমিও তাকে ভালোবাস্‌তে পার না ব্রতীদা, না ?"

ব্রতী বলিল, "না।"

বিভার মনটা এতটুকু হইয়া আসিল। এত সোজা উত্তর যে ব্রতীদা দিয়া ফেলিবে, তাহা সে আশা করে নাই। এ উত্তর সে বিশ্বাসও করিল না। দেশকে কি মানুষে সত্য সত্যই এত ভালোবাসে নাকি ? তাহাকে জব্দ করিবার জন্য ব্রতী ঠাট্টা করিতেছে নিশ্চয়। ভাবিল, আবার জিজ্ঞাসা করে,—"সত্যি ?"

কিন্তু এক মিনিট্ নীরব থাকিয়া মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল অন্য কথা, "এ তো আগে জান্তাম না, ব্রতীদা! আমাকে তো বলনি!"

"আমাকে তো জিজ্ঞাসা কর নি, কখনও!"

রাস্তার আলোগুলি সব এক সঙ্গে দেওয়ালীর মালার মত ঝক্ঝক্ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহাদের কুতূহলী প্রখর দৃষ্টি এই সবুজ মাঠখানির কোণ-কানাচ সব দখল করিয়া লইতে পারে নাই। বড় বড় গাছের সুদীর্ঘ ছায়ায় আপনাকে সন্তর্পণে আড়াল করিয়া দুর্ব্বাবিতান সুন্দর একটি রহস্যঘন অন্ধকারে এখানে সেখানে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। বিভা আরও একটু অন্ধকারে মুখখানা সরাইয়া লইয়া কৃষ্ণপক্ষের সরু এককলা চাঁদের দিকে তাকাইয়া রহিল। কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাইল না, অথচ গলার নীচে, পাঁজরের তলায় কেমন একটা অব্যক্ত অনুভূতি সর্‌সর্ করিয়া উঠিল, মনে হইল আর একটু ঘনাইয়া উপরে উঠিয়া আসিলেই টস্ টস্ করিয়া চোখ দিয়া ফাটিয়া পড়িবে। ব্রতীন্দ্রের স্থির কণ্ঠের ঐ গম্ভীর "না" শব্দটুকু ক্ষণে ক্ষণেই ঘোরালো হইয়া জটিলপাশে জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে অসংবৃত করিয়া ফেলিতে চায়।

খানিক পরে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি যদি না পারি ব্রতীদা?"

ব্রতীন্দ্র বলিল, "কি?"

"দেশকে তোমার মত ভালোবাস্তে?"

ব্রতী এক মুহূর্ত্ত থামিয়া উত্তর করিল, "না পারলে দুঃখের কথা।"

"তুমি তাহলে রাগ করবে ?"

ব্রতী এবার হাসিল, "করলেই বা কি, আর না করলেই বা কি ? দেশের যেটুকু লোকসান, তা হবেই।"

২৬

এমন করিয়া যে মা সাম্‌লাইয়া লইতে পারিবেন, শিবানী তাহা ভাবে নাই। রমেশবাবু যেদিন ফিরিলেন এবং তার পরে পিতাপুত্রীর মিলিত আয়াসে নানা কৌশলের মধ্য দিয়া মর্ম্মান্তিক দুঃসংবাদটি মায়ের কাণে পশিল, তখন মিনিট পনেরো ধরিয়া হেমপ্রভা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিলেন—একবার স্বামীর মুখের দিকে, একবার মেয়ের। সেই সময়টুকুর সেই বুদ্ধিহীন চোখের দৃষ্টি আর রক্তহীন বিবর্ণতা শিবানী কোন মতে ভুলিতে পারিতেছে না। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। তার পরেই মা একবার ভয়ানক বেগে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া অচেতন হইয়া পড়িলেন। তার পরে অনেকক্ষণ পরে মূর্চ্ছা যখন ভাঙ্গিল, সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত এই চার পাঁচ দিন আর কোনও উপদ্রবই মা করেন নাই, তাহাদের বিব্রত ও বিপন্ন করিয়া তুলিবার মত কোনও বিলাপ, ক্রন্দন, কিচ্ছু না ; কেবল হঠাৎ হঠাৎ অসময়ে চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল নামিয়া পড়ে।

শিবানী কতকটা হাঁফ্ ছাড়িয়া নিশ্চিন্ত হইল।

ইস্কুল হইতে আজ নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া সে সন্ধ্যাকালে অপরাজিতা-ঘেরা রেলিংএর কোণ ঘেঁসিয়া ইজিচেয়ারে গা ছড়াইয়া বসিয়া আছে। আকাশ নীল, বাতাস ফুরফুরে। ঘাড়টা একটুখানি পাশে হেলাইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে শিবানীর চোখের পাতা নিস্তেজ হইয়া বুঁজিয়া আসিল। সম্পূর্ণ বাহুখানা আস্তে এলাইয়া গিয়া রেলিংয়ের মাথায় লগ্ন হইয়া রহিল অপরাজিতার ঘন পল্লবগুলির গা ছুঁইয়া।

পিছন হইতে চমক্ লাগাইয়া কল্যাণী হঠাৎ তাহার হাতটা টানিয়া ধরিয়া একেবারে ইজিচেয়ারের কাছ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল।

শিবানী অতর্কিতে বাধা পাইয়া বিরক্ত হইয়া চক্ষু মেলিয়া বলিল, "ও কি ?"

কলি ওদিক্কার ঘরের দিকে তাকাইয়া বলিল, "বা—ব্বাঃ, পালিয়ে এসেছি একেবারে !"

"কেন, হল কি ?"

"চাইতে গেলাম একখানা কেক্-বিস্কুট, মা একেবারে খ্যাংরা নিয়ে তেড়ে এলেন !"

শিবানী হাতখানা সরাইয়া লইয়া ধমক দিয়া বলিল, "যা যা, বাজে বকিস্ নি।"

কলি প্রতিবাদ করিয়া মুখ-চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "ঐ দেখ না, কি রকম বক্ বক্ করছেন !"

ভাঁড়ার ঘর হইতে বাহির হইয়া হেমপ্রভা পাশের ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। শিবানী চাহিয়া দেখিল।

হঠাৎ ইজিচেয়ারে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া সে মিনিটখানেক উৎকর্ণ হইয়া রহিল। তার পরে চট্ করিয়া পিছন পিছন ঘরে ঢুকিয়া ডাকিল, "মা!"

হেমপ্রভা ফিরিয়া তাকাইলেন না, আপন মনে বিড়্ বিড়্ করিয়া চলিলেন। শিবানী আবার বলিল, "মা, বল্ছ কিছু?"

মা এবার তর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "চোখ নেই, কাণ নেই নাকি? তোরা করিস্ কি?"

"কি হল?"

"সব খোয়ালে! সব খোয়ালে!"

"কি?"

"দেখি, খুঁজে দেখি—" বলিয়া হেমপ্রভা ঘরের আনাচে কানাচে হাত্ড়াইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবাক্ হইয়া শিবানী কতক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া দেখিল।

জানালার কবাটের পিছনে খুঁজিয়া দেখিতে গিয়া মা গরাদে ধরিয়া খানিকক্ষণ হাঁ করিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, ঠোঁট দুইটা একবার কাঁপিল, আবার আস্তে আস্তে নড়ে; অকস্মাৎ দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া গরাদের মধ্য দিয়া হাতখানা বাড়াইয়া দিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, "ঐ যে।"

শিবানী তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিয়া মাথাটা জানালার দিকে ঝুঁকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

মা কোনও উত্তর করিলেন না। শিবানী আবার বলিল, "কি খুঁজছ মা? কি হারিয়েছে?"

মা দুই তিনবার পিট্ পিট্ করিয়া চোখের পলক ফেলিয়া শিবানীর মুখের দিকে বোকার মত তাকাইয়া রহিলেন। শিবানী বড় বড় চোখ মেলিয়া মায়ের আপাদমস্তক একবার চাহিয়া দেখিতে না দেখিতেই মা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "শিবু!"

সন্ত্রস্ত হইয়া শিবানী মায়ের হাতখানা হাতের মুঠার মধ্যে লইয়া শুধু বলিল, "কেঁদোনা, মা।" আর যে কি বলা সমীচীন, মনে করিয়া আনিতে পারিল না।

হেমপ্রভা শিবানীর আঁচলের মধ্যে ছেলেমানুষের মত মুখ লুকাইয়া অনেকক্ষণ ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "চল্‌রে, শীগ্‌গির চল্।"

"কোথায়?"

"কি জানি কোথায়।"

শিবানী ভয় পাইয়া বলিল, "কি বল্‌ছ মা?"

"চল্—চল্।"

শিবানী যতটুকু সময় দাঁড়াইয়া মনের মধ্যে বিচারবিতর্ক করিতেছে, ততক্ষণে মা একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। ঝাঁঝালো গলায় বলিলেন, "চল বল্‌ছি!—যাবিনে?"

মেয়ের তরফ হইতে কোনও উত্তর না পাইয়া মা তাহার আঁচলটা সজোরে টানিয়া নাড়া দিয়া গায়ে একটা ঠেলা মারিয়া বলিলেন, "যাবিনে রাক্ষুসী?"

শিবানী চোখে একেবারে অন্ধকার দেখিল। দরজার দিকে তাকাইয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "কলি!"

দরজার কবাটের ওধারে প্রথম হইতেই কল্যাণী দাঁড়াইয়া আছে। মায়ের কাণ্ড-কারখানা দেখিয়া সে হতভম্ব! এবার সে কাছে আসিল। শিবানী বলিল, "বাবাকে ডেকে নিয়ে আয় শীগ্‌গির!"

"হয়েছে কি, দিদি?"

"শীগ্‌গির যা!"

কলি ছুটিয়া নীচে গেল।

হেমপ্রভা চক্ষু পাকাইয়া বলিলেন, "দাঁড়িয়ে রইলি যে?"

অতি কষ্টে শিবানী প্রবোধ দিয়া বলিল, "যাব কেন মা? সুখু্‌ তো এল বলে!"

হেমপ্রভা চকিত হইয়া মেয়ের মুখের দিকে তাকাইলেন, "উঁ? উঁ? সু—খু্‌!"

শিবানী চুপ করিয়া রহিল।

খোলা দরজাটার দিকে দুই তিন মিনিট অনিমিষ চোখে তাকাইয়া থাকিয়া মা বলিলেন, "কই, আসছে না তো?"

"আস্‌বে।"

সিঁড়ির পথে বাবার পায়ের শব্দ পাইয়া শিবানী একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বারান্দায় বাহির হইয়া আসিল। চাপাগলায় দ্রুততালে বলিয়া ফেলিল, "বাবা, মা পাগল হয়ে যাচ্ছেন, বোধ হচ্ছে।"

রমেশবাবুর মাথায় মুহূর্ত্তে বজ্রনিপাত হইল। সেইখানেই থমকিয়া দাঁড়াইযা বলিয়া উঠিলেন, "পাগল !!"

"দেখ এসে।"

হেমপ্রভা ইতিমধ্যেই আবার ঘরের কোণে, টেবিলের নীচে, আল্‌নার পিছনে খোঁজাখুঁজি লাগাইয়া দিযাছেন। রমেশের পায়ের শব্দ পাইযা একবার পিছনে ফিরিযা বলিলেন, "ছ্যাখ্ তো দেখি শিবু, ছোঁড়াটা লুকোল কোথায ?"

মায়ের ফ্যাকাসে মুখের অসহায়, সকরুণ চোখ দুইটির দিকে চাহিয়া হঠাৎ শিবানীর চোখ ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। সে মুখ ফিরাইযা বলিল, "এসো, বাবা।"

রমেশ রেখাঙ্কিত কপালের উপর ডান হাতখানা চাপিয়া স্তব্ধ হইয়া হেমপ্রভার দিকে চাহিযা রহিলেন।

২৭

কম্‌রেড্ রয় ঘণ্টা দুই যাবৎ ব্রতীন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিযাছেন।

কথা আর ফুরায় না। বার বার ঘুরিযা একই জাযগাগুলিতে দুই জনের ঠোকাঠুকি লাগে। অবশেষে হাতঘড়ির দিকে পলকে চাহিয়া কম্‌রেড্ রয় চেয়ারে সোজা হইযা বসিয়া বলিল, "আলোচনা তো বিস্তর হল, একটা clear understandingএ আসা গেছে বোধ হয়। এবারে দেখুন একত্র এগোনো যায় কিনা এবং কতটা যায।"

মাথার চুলগুলির মধ্যে আঙুল চালাইতে চালাইতে ব্রতীন্দ্র চিন্তিতমুখে বলিল, "ভেবে দেখতে সময় চাই।"

"আচ্ছা বেশ, ভালো করেই ভেবে দেখুন।"

"হুঁ। দিন কয়েক পরে আপনাকে জানাব।"

কম্‌রেড্ রয় টেবিলের উপর হইতে হ্যাট্‌টি তুলিয়া লইযা দাঁড়াইল, "আচ্ছা, তাই কথা রইল। উঠি এখন।"

তাহাকে বিদায় দিযা দুযারের কাছ হইতে ফিরিয়া আসিযা ব্রতীন্দ্র আবার খাটের উপরে বসিয়া পড়িল। জানালার বাহিরে গলির ঘিঞ্জি বাড়ীগুলির উপর এক ফালি চাঁদ দেখা যায। অন্যমনস্ক-ভাবে চাঁদের পানে চাহিয়া চাহিয়া সে কি ভাবিতে লাগিল। অসম্ভব গরম! ভাঙ্গা হাত-পাখাখানার উদ্দেশে খাটেব আশে-পাশে একবার হাতড়াইয়া না পাইয়া ফতুয়াটার বুক খুলিয়া ফেলিয়া ধুতির খুঁট সহযোগে খানিক হাওযা খাইতে খাইতে ব্রতী কম্‌রেড্ রযের কথাগুলিকে মাথাব মধ্যে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

সশব্দ পদক্ষেপে সুপ্রসন্ন আসিয়া হাজির।

"কিহে, কি খবর?"

"খবর কিছু নেই। "বলিয়া সুপ্রসন্ন খাটেব উপরে বসিয়া পড়িল।

"অনিমেষের সেই কম্‌রেড্ রয় এসেছিলেন, জান?"

উৎসাহিত হইয়া সুপ্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি? কখন্?"

"এই যে এক্ষুণি চলে গেলেন—মিনিট দশেক।"

"আঃ-হা। আর একটুকু আগে এসে পড়লেই ঠিক হত। তারপর, কি রকম দেখলে?"

ব্রতী বলিল, "দেখলাম, পুরোদস্তুর এক কম্যুনিষ্ট! পোষাকে, পরিচ্ছদে, আদব-কায়দায়!"

"কি বাণী নিয়ে এলেন?"

ব্রতী হাসিয়া বলিল, "বাণী ঠিক নয়, একটা প্রস্তাব নিয়ে এসে-ছিলেন। একযোগে কাজ করা যায় কিনা, তাই আলোচনা করবার জন্যে।"

সুপ্রসন্ন বলিয়া উঠিল, "কাদের সঙ্গে? ওদের সঙ্গে আমাদের এক যোগে কাজ?"

"হুঁ।"

"তুমি কি বল্লে?"

"বলিনি এখনও কিছুই। ভাবছি।"

"ও হতে পারেনা। ওদের সঙ্গে আমাদের কাজ! একেবারেই খাপ খাবে না!"

ব্রতী বলিল, "দেবীর সঙ্গে কথা বলে দেখতে হবে একবার।"

সুপ্রসন্ন বলিল, "দেবী যদি বলেন সহযোগিতা কর্ত্তে, তাহলে কর্বে?"

"হয়তো করব।"

"আর দেবী যদি বলেন—'না'?"

"দেখা যাক্!"

সুপ্রসন্ন বলিল, "হাজার দেব-দেবী এসে বল্লেও আমি ওদের সঙ্গে নেই বাপু, বলে রাখ্‌চি!"

ব্রতী মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"কম্যুনিষ্টদের আমি একদম বিশ্বাস করিনে। ওদের

sincerity বলে একটা জিনিষ নেই, ভাল কিছু কর্ত্তে ওরা জানেই না। ওদের লম্বা বুলির বক্তৃতা! আর কিছু নয়!"

ব্রতীন্দ্র হাসিল।

সুপ্রসন্ন বলে, "ঠিক বলিনি?"

"খানিকটে, সব নয়।"

"এক্কেবারে।"

ব্রতীন্দ্র আশ্বাস দিয়া বলিল, "তা বেশ! কিন্তু তোমার ঘাবড়াবার কিচ্ছু নেই। কারণ, ওদের কোনও কথাই এখনও দিইনি এবং দেবীর অসম্মতি হলে মোটেই দেব না। অতএব আপাততঃ সুস্থ থাক।"

সুপ্রসন্ন হঠাৎ কথার মোড় ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিল, "দেখ, রাতদিন কেবল 'দেবী' 'দেবী' কোরো না তো! আমাদের নিজেদের কোনও ইয়ে নেই, দেবী যা বলবেন, তাই?"

ব্রতী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "নিজেদের প্রাধান্য খর্ব্ব হতে কোথায় দেখ্‌লে?"

"হবার খুব আশঙ্কা দেখচি!—দেখো ব্রতী, শেষকালে দেবীর পায়ে বিকিয়ে বোসো না যেন!"

ব্রতীন্দ্র ভ্রূ কুঁচ্‌কাইল। গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম?"

"রকম আর কি? দেবীরা কি মনে করেন জান? তাঁদের কথা ছাড়া আমরা অর্থাৎ তুমি এক পাও চল্‌তে পারনা, দেবীর ইঙ্গিতে সব চলে। বুঝলে?"

ব্রতী বলিল, "এ সব শোন কোথায় তুমি?"

"বলে ওদের ছেলেরাই। এই তো কাল্‌কেই লোকেন আমাকে বল্‌ছিল, ওদের পার্টিতে কে একটা মুসলমান ছেলে আছে, সে নাকি গর্ব্ব করছিল।"

ব্রতী একটু তাচ্ছিল্যভরে কথাটা উড়াইয়া দিয়া বলিল, "ছেলেরা অনেক কিছুই বলতে পারে। যার দলের ছেলেরা, তার গর্ব্ব একটু করেই থাকে। তুমিও যেমন পাগল, ওই নিয়ে মাথা ঘামাও!"

"ঘামাবার কারণ আছে বৈ কি? রকম-সকম তো দেখ্‌চি তেমনিই।"

ব্রতী আবার একটু ভ্রূ কুঁচ্‌কাইয়া বলিল, "দেবীকে তুমি একেবারেই চেন না।"

সুপ্রসন্ন সকৌতুকে বলিল, "নেহাৎ দুর্ভাগ্য আমার!—দেখাবে একদিন?"

ব্রতী উত্তর দিল না।

সুপ্রসন্ন একটু হাসিয়া বলে, "তোমার দেবীটিকে আমার একদিন দেখ্‌তেই হচ্ছে! তোমা হেন মানুষকেও টলাতে পারে, এ হেন জীব! চণ্ডী না মোহিনী, তাই ভাব্‌চি।"

ব্রতীন্দ্রর ফর্সা মুখখানা কেমন যেন আরক্ত হইতে হইতেই মিলাইয়া গেল, সুপ্রসন্নর চোখে পড়িল না। সুপ্রসন্নর চোখের দিকে স্থির ভাবে চাহিয়া দেখিয়া সে তিরস্কার করিয়া বলিল, "তোমার মুখে লাগাম থাকে না কেন, সুপ্রসন্ন?"

"কেন, তোমার দেবীর অপমান হল নাকি?"

ব্রতীন্দ্র মৌন হইয়া রহিল।

২৮

ইস্কুল আজ ছুটি হইয়া গেল। দীর্ঘ ছয় মাস পরে এতদিনে দেখা গিয়াছে গ্রীষ্মের দেড় মাসের অবকাশ। হোষ্টেলের মেয়ে-মণ্ডলীর মধ্যে বাড়ী যাওয়ার নাচানাচি, ও মার্কেটে মার্কেটে জিনিষ কেনার ধুম লাগিয়া গিয়াছে দিন চারেক হইতে, আজ একেবারে বিছানা-বাক্স বাঁধা-ছাঁদা করিতে সবাই ব্যস্ত। বিভাও বাড়ী যাইবে। মাকে ছাড়িয়া কখনও একটি দিনের তরেও যে দূরে থাকে নাই, সে এই ছয় মাস একলা কেমন করিয়া যে কাটাইল, সে নিজেই ভাবিয়া আজ আশ্চর্য্য হয়। অথচ কাটিয়াছে তো বেশ, তেমন খালি তো লাগে নাই !

বিভা তোরঙ্গ খুলিয়া জামা কাপড় খাতাপত্র নামাইয়া এখানকার জিনিষ ওখানে নূতনভাবে সাজাইতেছে, আর ভাবিতেছে মায়ের কথা। অনেকদিন পরে পল্লীপ্রান্তের সেই বাড়ীখানির কোণ-কানাচের ছবি নূতন করিয়া আবার মনের সাম্নে স্পষ্ট ভাসিয়া উঠে। মা ফরমায়েস্ পাঠাইয়াছিলেন, এক থান শাদা কাপড়, চন্দন ঘষিবার একখানা পাথর, আর একটি পঞ্চ প্রদীপের জন্য। সেই-গুলি বাক্সের তলায় এবং কোণে ঢুকাইতে ঢুকাইতে বিভা হঠাৎ এক একবার দরজার দিকে তাকায়, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর মায়াকে এক ধাক্কায় দূরে ঠেলিয়া কলিকাতার প্রবল টান আসিয়া বুকটাকে বাঁধিয়া ফেলে। মন আর ভালো লাগে না।

সিঁড়িতে যেন বেহারার পায়ের ধম ধম শব্দ শোনা যায়। বিভা আগ্রহে আবার দুয়ারের দিকে চাহিয়া দেখে। না, কেউ না! মাথা নীচু করিয়া কাপড় গুছাইতে গুছাইতে সে ভাবে, ব্রতী-দা এখনও আসে না কেন? তাহার প্রাণপণ বিশ্বাস, আজ ব্রতী একবার আসিবেই। কাল সে বাড়ী চলিয়া যাইবে, তাহা ব্রতীদা জানে।

সন্ধ্যা যখন হয়-হয়, বিভা চুল বাঁধিয়া, গা ধুইয়া জানালার কোণে দাঁড়াইয়া এক একবার গলির মাথার দিকে উদ্‌গ্রীবভাবে তাকাইতেছে, এক একবার সিন্দূরের মত টুকটুকে আকাশের প্রতিবিম্বিত আলোর খেলা নিজের অঙ্গে চাহিয়া চাহিয়া দেখে, এমন সময় ভিজিটারের বার্ত্তা লইয়া রেণু আসিয়া পিছন হইতে ডাকিল।

বিভা ফিরিয়া রেণুর মুখের দিকে চাহিয়া অকারণে হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "যাচ্ছি।"

রেণু মুখ টিপিয়া টিপিয়া সকৌতুকে হাসিল। বিভার ত্বরিত গতি ভঙ্গিমার দিকে চাহিয়া দেখিয়া সে ডাক দিল, "আরে শোন্ শোন্—"

ততক্ষণে বিভা দরজার চৌকাঠের ওদিকে পা বাড়াইয়াছে, অর্দ্ধেক থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

"আয় এদিকে, শুনে যা!"

বিভা অসহিষ্ণু হইয়া বলিল, "বলে ফেল না?"

"চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলা যায় নাকি সব কথা? আয়, শুনে যা এদিকে!"

"ধ্যেৎ, কি লাগিয়েছিস্? আমি আস্‌ছি নীচে থেকে, পরে শুন্‌ব।" বলিয়া বিভা পিছন ফিরিল।

"আরে বাবা, এক মিনিট সবুর সইছে না? এসেছেন কে শুনি?"

রেণুর মুখখানা না দেখিয়াও তাহার হাস্যচপল কণ্ঠস্বর বিভা ঠিক টের পাইল। সুতরাং বাঙ্‌বিনিময় করিবার আর ভরসা না পাইয়া তাড়াতাড়ি একেবারে সোজা নামিয়া আসিল নীচে।

একটা কাগজ-মোড়া বাণ্ডিল সামনে টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া ব্রতীন্দ্র বাহিরে তাকাইয়া বসিয়া আছে। গোধূলির স্বপ্নমাখা আলোর রশ্মি গলির গহন পথের আড়াল কাটাইয়া কোন্ ফাঁকে আসিয়া পড়িয়াছে ঠিক তাহার মুখে আর গায়ে। ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বিভার মুগ্ধ চোখ দুইটি একেবারে সন্নদ্ধ হইয়া পড়িল সেইখানে। ব্রতী যখন চোখ ফিরাইয়া তাকাইল, ততক্ষণে বিভার সমস্ত দেহ মন্থন করিয়া কী এক অপূর্ব্ব রস বুকের মধ্যে উচ্ছল হইয়া উঠিয়া তাহার কপোল দুখানিকে অপরূপ রঙে রাঙাইয়া দিয়াছে।

ব্রতী বলিল, "ছুটি হয়ে গেল?"

"হুঁ।"

"বাড়ী যাচ্ছ কবে? কালই?"

বিভা বলিল, "হুঁ।"

"যাও, অনেকদিন মার কাছ-ছাড়া হয়ে আছ।—খুব আনন্দ হ'চ্ছে, না?"

বিভা হাসিয়া বলিল, "হবে না?"

কাগজের বাণ্ডিলটা হাতে তুলিয়া দিয়া ব্রতী বলিল, "এই নাও, মাকে দিও।—তোমার কোনও জিনিষ-পত্র কিনবার-টিনবার আছে নাকি ?"

বিভা বলিল, "সব আমার কেনা হয়ে গেছে। তোমার ভরসায় বসে আছি নাকি ভাবছ ?"

"সে তো ভালো কথা !" পকেট হইতে একখানা খাম বাহির করিয়া বলিল, "এই চিঠিখানাও মাকে দেবে।"

"আচ্ছা" বলিয়া বিভা বেঞ্চির একপাশে বসিয়া পড়িল।

ব্রতী বলিল, "তারপর ? ইস্কুল খুলবে কবে ?"

"তেইশে জুন।"

"ছুটিটা একেবারে বসে বসে আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিও না যেন ! পড়া-শুনো কোরো একটু একটু।"

বিভা একটু হাসিল। কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের তো ছুটি নেই ব্রতীদা, না ?"

"নাঃ, আফিসের বাবুদের গরম-টরম লাগে না। গরমবোধ যত ইস্কুল-কলেজের ছাত্র আর মাষ্টারের গায়ে !"

বিভা হাসিয়া বলিল, "একদিনও নেই ?"

"উঁহুঁ।"

"ছুটি নেওয়া যায় না ?"

ব্রতী বলিল, "কি কর্ত্তে নেব ?"

"এমনি। কোথাও বেড়িয়ে টেড়িয়ে আস্‌তো পারো !"

ব্রতী বলিল, "ছুটি তো ইচ্ছে কল্লেই পাওয়া যায় না !"

বিভা নিজের মনে একটা নিঃশ্বাস ফেলিল ! সন্ধ্যার স্তিমিত আলো প্রায় মিলাইয়া আসিযাছে, আকাশে তারা ফুটে নাই, ঘরের মধ্যেও বাতি জ্বলে নাই ; ব্রতীন্দ্রের আবছাযা মুখচ্ছবি হইতে দৃষ্টি সরাইয়া আনিয়া সে মনের চোখে ছবি দেখিতে লাগিল—কাল এমন সময় সে চলিযাছে ট্রেণের পথে হুস্ হুস্ করিয়া ছুটিযা, আর ব্রতীদা রহিয়াছে এখানে। তাব পরদিন সে আরও দূরে, আর ব্রতীদা কলিকাতার কাজের কলকোলাহলের মধ্যে তাহার কথা ভুলিযাই আছে হয়তো !

ব্রতীন্দ্র খানিকক্ষণ খুঁটিনাটি নানা কথা বলিয়া কহিয়া অবশেষে বলিল, "এতদিনে কল্‌কাতাভীতি ঘুচেছে তোমার নিশ্চয় ? একলা নিজের ওপর নিজে দাঁড়াবার মত সাহস সঞ্চয় করেছ ? কেমন ?"

"হ্যাঁ, অনেক। আজকাল আমি একা একা অনেক জায়গায় ঘুরি ! মার্কেট থেকে জিনিসপত্র তো সব নিজে কিনে নিয়ে এলাম !"

"আমাকে না হলেও এখন চলে তাহ'লে ?"

তাহার মুখের দিকে অনুসন্ধিৎসুভাবে একবাব চাহিযা দেখিয়া বিভা একটু অভিমান করিয়া বলিল, "কেন, আমি কি তোমাকে বড্ড বেশী খাটাই ? আমার খোঁজখবর নিতে তোমার বড্ডই জ্বালাতন হতে হয নাকি ?"

ব্রতী সহাস্যে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া মাথা নাড়িযা বলিল, "ছি ছি, সেকথা নয় ! তোমার জন্যে কাজ কর্ত্তে আবার আমার জ্বালাতন কি ? কিন্তু আমি বল্‌ছি, আমি যদি দু'চারদিন না থাকি এখানে, তাহলে তুমি বেশ পারবে তো থাক্‌তে ? পারবে নিশ্চয় ?"

উদ্বিগ্ন হইয়া বিভা জিজ্ঞাসা করিল, "থাকবে না এখানে? কোথায় যাবে?"

ব্রতীন্দ্র বলিল, "দেখি কোথায় যাই! যাব কোথাও ওদিকে —পশ্চিমে।"

"বেড়াতে?"

"না বেড়াতে ঠিক নয়—কাজ আছে।"

বিভা বলিল, "তা ছুটিতে তো আর আমি থাক্‌ছি না এখানে। তুমি গেলেই বা কি?"

ব্রতীন্দ্র বলিল, "ছুটির পরেও কিছুদিন ফিরব না।"

বিভার বুকটা কেমন ধপ্‌ করিয়া উঠিল; জিজ্ঞাসা করিল, "কতদিন?"

"ঠিক বল্‌তে পার্চ্ছিনে। বেশ কিছুদিনই বোধহয়।"

বিভা শঙ্কিত হইয়া বলিল, "একমাস?"

"আরও বেশী হবে। ছ'মাস একবছর হতে পারে, কিম্বা আরও বেশী—স্থিরতা নেই কিছু!"

বিভার মুখখানা কেমন হইয়া আসিল; অস্ফুটকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এক বছর!! এর মধ্যে ফিরবে না!"

ব্রতীন্দ্র বলিল, "কিছু বলা যায় না। ফিরতেও বা পারি। মোটের ওপর, না আসাটাই ধরে রেখো।"

বিভা অবিশ্বাস দেখাইয়া বলিল, "এতদিন বিদেশে বসে কি এমন কাজ তোমাদের আফিসের?"

"কাজ আফিসের নয়। আমার নিজের কাজ।"

বিভা অবাক্ হইয়া বলিল, “নিজের কাজ!! নিজের কাজে এতদিন আফিস বন্ধ করবে ?”

ব্রতী বলিল, “ছুটির দরখাস্ত দিয়েছি।”

“ক’ মাসের ?”

“আপাততঃ চারমাসেব। দবকার হলে আরও নেব।”

চট করিযা বিভা বলিল, “কি করে এত ছুটি নেবে ? এক্ষুণি না বল্লে ; ইচ্ছে কর্ল্লে´ই ছুটি পাওয়া যায না ?”

ব্রতী একটু হাসিয়া বলিল, “ছুটি যদি না মঞ্জুর কবে, তাহলে কাজে ইস্তফা !”

বিভা হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিল। তারপর সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, “কাজেই ইস্তফা দেবে ? এমন কি জরুবী দরকার পড়ল তোমার বিদেশে ?”

“দরকার না থাকলে শুধু শুধু কি বেড়াতে যাচ্ছি, বিভা ? না গিয়ে উপায় নেই তাই।”

বিভা মিনিটখানেক চুপ কবিয়া থাকিয়া একান্ত অসহায় ভাবে তাহার মুখের দিকে চোখ তুলিয়া বলিয়া উঠিল, “যেও না ব্রতী-দা ! এতদিন আমি তোমায ছেড়ে একা থাক্‌তে পাবব না !”

ব্রতীন্দ্র বিভাব সুকুমার মুখখানার দিকে কতক্ষণ চাহিয়া রহিল। একটু হাসিযা তাহাকে উৎসাহিত করিয়া বলিল, “পারবে, পারবে !”

বিভা প্রাণপণ জোরে মাথা দোলাইযা বলিল, “না, না, যেও না, পারব না।”

"এইমাত্র না গল্প করা হচ্ছিল, আজকাল তুমি একা একা অনেক কিছু কর্ত্তে পার ?"

"তা হোক্! তবু অতদূরে গিয়ে পড়লে কি করে চল্‌বে? আরও, অ—ত দিন !"

ব্রতী বলিল, "তুমি বেজায় ছেলেমানুষ! বুঝতে পারছ না, আমার কাজ ?"

বিভা চুপ করিল। মনে মনে সে নিশ্চয় বুঝিতেছে, ব্রতীদার যাওয়াতে বাধা জন্মানো তাহার কর্ম্ম নয়। হাজার মিষ্টকথায় তাহার অনুমতি লইবার ভাণ দেখাইলেও ব্রতীর সংকল্প তাহার অনুমতি বা অসম্মতির অপেক্ষা করিযা বসিয়া নাই। সে হাল ছাড়িয়া বলিল, "কাজ যখন, তখন যাবেই! আমার ইচ্ছে হলেই তো আর তোমাকে ধরে রাখতে পারছি না !" একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া সসঙ্কোচে আবার যোগ করিল, "চিঠি দেবে তো মাঝে মাঝে ?"

ব্রতী বলিল, "চিঠি? সম্ভবতঃ পারব না দিতে। উপায় থাকবে না।"

"কেন ?"

একটু ভাবিয়া ব্রতী নীচু গলায় বলিল, "জান তো বিভা? পুলিসের নজর অত্যন্ত বেশী। আমি তোমাকে চিঠি লিখ্‌লে তোমারও বিপদ !"

বিভার চোখে হঠাৎ যেন আঁধার ঘনাইয়া আসিল। ব্রতীদা দেশকে ভালোবাসে ইহা সে জানে, কিন্তু তাহার অপরিহার্য্য মূল্য-

স্বরূপ পুলিশের অতন্দ্রিত অভিনিবেশ যে কিনিয়া রাখিয়াছে, সেকথা কখনোই তাহার মনে থাকে না। ব্রতীন্দ্র অকস্মাৎ আবার আজ মনে করাইয়া দিল। বিভা উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল, "তাহলে? তোমার খোঁজ-খবর পাব কি করে? অতদিনের মধ্যে একটা খবর দেবে না?—না ব্রতীদা, লিখো তুমি, আমার কিছু বিপদ্ হবে না!"

ব্রতী আশ্বাস দিয়া বলিল, "খোঁজ রেখে কি বা হবে তোমার? ধরে রেখো আমি ভালোই আছি।"

বিভা ব্যথা পাইল, রাগ করিল। কিন্তু বুকের মধ্যে এমন একটা ভাব আসিয়া ধীরে ধীরে চাপিতেছে, যে মুখ ফুটিয়া কোনও রাগই দেখাইতে পারিল না, শুধু বলিল, "ধরে রাখ্‌লে হয় না ব্রতীদা, আমার সত্যি বড় জান্তে ইচ্ছে করবে!"

"বেশ তো, নেহাৎ যদি খবর পেতে ইচ্ছে করে, তাহলে তোমাদের শিবানীদির কাছে যেও। সেখানেই আমার সব খোঁজ-খবর পাবে।"

শিবানীদির নামের প্রতিধ্বনিতে বিভার কান যেন ভরিয়া গেল। কি ভাবিতে কি ভাবিল, সেই জানে। হঠাৎ মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "শিবানীদি জানবেন কি করে?"

"জানাব তাঁকে।"

বিভার বুকের মধ্যে ধপ্ ধ'প্ সুরু করিল। গম্ভীরভাবে সে প্রশ্ন করিল, "কি করে জানাবে? তাঁকে চিঠি লিখলে তাঁরও বিপদ্ হবে না?"

ব্রতী এক মুহূর্ত্ত ভাবিয়া লইয়া উত্তর করিল, "বিপদ্ যদি তাঁর

হয়, তিনি তা সইতে পারবেন। তোমার মত ভীরু তো তিনি নন্।” বলিয়া হাসিল।

বিভা কোনও উত্তর খুঁজিয়া পাইল না, কোনও প্রশ্ন করিতে মন সরিল না, একটা ব্যর্থ অভিমান নিজেরই উপর আক্রোশে মাথা খুঁড়িয়া মরিতে লাগিল। সত্যই কি ব্রতীদা তাহাকে ভীরু মনে অবহেলা করিল? সে কি সত্যসত্যই এমনই ভীরু? আর—শিবানীদি এমনকি বীর?

ব্রতীন্দ্র বিদার লইবার উদ্যোগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, “যাও আপাততঃ তো বাড়ীই যাচ্ছ, কোনও ভাবনা নেই। ফিরে এসে তার পরে দু’চারদিন একা থাক্‌তে থাক্‌তেই অভ্যস্ত হয়ে যাবে।”

বিভা কোনও উত্তর করিলনা।

ব্রতী আবার বলিল, “আর একাও তো কিছু নয়! যেমন আছ হোষ্টেলে তেমনিই থাকবে। বাইরে থেকে একজন কেউ দেখা-শোনা করবার থাক্‌লে ভালো হয়, এই না? সে ব্যবস্থাও আমি করে গেলাম,—আমি না ফেরা অবধি শিবানীদি তোমাকে দেখবেন। তাকে ব’লে রেখেছি। সুতরাং কিছু ভয় নেই তোমার!”

বিভার অসহ্য হইয়া উঠিল। সে মুখ ভারী করিয়া জবাব দিল, “আমি একা থাকতে পারি না পারি, সে আমি বুঝব। শিবানীদির দেখবার কোনও দরকার নেই!”

ব্রতী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, ”কেন? তাঁর ওপর হঠাৎ এত রাগ কিসে?”

“আত্মীয়তারও তো কারণ দেখ্‌ছিনে কিছু!”

"আত্মীয়তা আছে বৈকি? তিনি তোমাদের হেডমিসট্রেস্, নিত্য দু'বেলা তাঁর সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হচ্ছে, তাছাড়া তিনি তোমাকে স্নেহ করেন—তোমার তত্ত্বাবধান নিতে তাঁর চেয়ে আত্মীয লোক এখানে পাবে কোথায়?"

"তত্ত্বাবধানের আমার কিছু দরকার নেই, আমি কচিখুকি নাকি?—শিবানীদি আমার কে?" উষ্ণতাসহকারে কথাগুলি বলিয়া বিভা গম্ভীব হইয়া রহিল।

ব্রতী সহাস্যে তাহার দিকে চাহিযা বলিল, "শিবানীদি তোমার কেউ নন্? তাহলে, আমিইবা তোমার কে?"

বিভা একটি মুহূর্ত্ত যেন অর্থবোধ করিতে না পারিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া রহিল। পরক্ষণেই সমস্ত শরীরের মধ্যে প্রবল ঝঞ্ঝনা নাড়া দিযা উঠিল। তার পরে একটা অস্বাভাবিক 'দীপ্তি' চোখে লইয়া সে ব্রতীন্দ্রের চোখের দিকে চোখ তুলিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল! একটি কথাও মুখে আসিলনা।—তাই তো! ব্রতীদা,—ব্রতীদা তাহার কে? একান্ত আপনার কবিয়া, সর্ব্বস্ব ভাবিয়া, এমন পরমনির্ভর-রূপে জড়াইয়া ধরিযা আছে যাহাকে, সে যে নিতান্ত পরের ছেলে! নিতান্ত পর! বিভার সঙ্গে কোথাও তাহার এতটুকু সূক্ষ্ম যোগ নাই। অথচ ইহাকেই সে সমস্ত ভার সঁপিয়া বসিয়া আছে!—অসহ্য বেদনায় যেমনই তাহার মর্ম্মের তন্তুগুলি ঝন্ ঝন্ করিয়াছিল, অমনই চারিদিক্ হইতে যেন একসঙ্গে একশো চাবুক সপাং করিয়া সর্ব্বশরীরে আঘাত করিল—নির্ল্লজ্জ !!!

বিভা বার-দুইতিন ঠোঁট কাম্‌ড়াইয়া অবশেষে সোজা উত্তর "না, তুমি আমার কেউ নও।"

দুই মিনিটের মধ্যে বিভার সুকোমল মুখখানার উপর দিয়া যে বিচিত্র মেঘ ও রৌদ্রের আলোছায়াব ঢেউ খেলিয়া গেল, ব্রতীন্দ্রের চোখের দৃষ্টিতে তাহা ধরা পড়িল—দর্পণের মত সুস্পষ্ট, স্বচ্ছ। স্বচ্ছ অপ্রতিভ হইযা নিজের মনে তাহাকে স্বীকার করিতে হইল, সে ভুল করিয়াছে।

বিভা আর একটি কথাও বলিলনা। টেবিলের উপর হইতে বাণ্ডিলটা তুলিয়া লইতে হাত বাড়াইয়া একবার থামিয়া গেল, তার পরেই ধীরে তুলিয়া লইয়া দাঁড়াইয়া বলিল "সন্ধ্যে হয়ে গেছে, যাই এখন।"

ব্রতী তাড়াতাড়ি বলিল, "রাগ করলে কেন, বিভা? তুমি কোনও কথার মানে বোঝনা। ছি।"

"বুঝি।" বলিযা বিভা পা বাড়াইল।

ব্রতীন্দ্র পলকমাত্র ইতস্ততঃ করিযা বিভার ডান হাতখান ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "যেওনা, শোনো।"

বিভার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল, ভযে নয, লজ্জায নয, আনন্দেও নয়; কেন যে, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারেনা। মুহূর্ত্ত-মাত্র ভাবিয়াছিল, হাতখানা সরাইয়া লয়, কিন্তু পারিলনা, চেষ্টাও করিলনা। ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কোনও প্রশ্ন না করিয়া শুধু মুখের দিকে চাহিল।

হাতখানা ছাড়িয়া দিয়া ব্রতীন্দ্র কোমলকণ্ঠে বলিল, "সত্যি তুমি

মনে করলে আমি তোমায পর ভাবি ? সামান্য একটা ঠাট্টা বুঝতে পারলেনা ?”

বিভা কি একটা জবাব দিতে যাইতেছিল, কিন্তু কথা বলিতে পারিলনা, ঠোঁট কাঁপিয়া গেল।—সামান্য একটা ঠাট্টাই হয়তো ! কিন্তু শিবানীদির নামের সঙ্গে মিলিযা এ ঠাট্টা তাহার কাছে যে কতখানি মারাত্মক ব্রতীদা তাহা বুঝিবে কেমন করিয়া, বুঝিবার গরজ তাহার কই ? বিভা শ্বাসরোধ করিয়া প্রাণপণে নিজের সঙ্গে যুঝিতে লাগিল, চোখের শিরাগুলি যেন আর্দ্র হইযা না উঠে কোনোমতেই। তাহা হইলে আর যে তাহার লজ্জা রাখিবার স্থান নাই।

ব্রতী অপেক্ষা করিল ; নিজেকে সাম্‌লাইযা লইয়া কথাব উত্তব দিতে বিভার যে সময় লাগিবে, তাহা সে বুঝিয়াছে। কিন্তু বিভা নিথর পাষাণ হইয়া দাঁড়াইযাই রহিল, সময় চলিয়া যায, কিন্তু তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হয়না।

নিরুপায় হইয়া ব্রতী আবার বিভার হাতখানা নিজেব মুঠাব মধ্যে তুলিযা লইযা আদব কবিয়া বলিল, “তুমি রাগ করলে আমার বড় কষ্ট হয, বিভা। তোমাকে কত ভালোবাসি, জানোনা তুমি ? আমি তোমার কেউ নই, একথা কি করে তুমি বিশ্বাস করলে ? তুমি চিরকাল আমার আদরের বোন্ যে, চিরকালই তাই থাকবে।”

বিভার বুকের ক্রন্দন আর বাঁধ মানিতে চাহিলনা। সজোরে হাতখানা সরাইযা লইযা সে মুখ ফিরাইয়া বলিল, “যাও তুমি !”

খোলা দরজার ওপাশ দিয়া কত মেয়ে আসে আর যায়। বেড়াইয়া ফিরিতে ফিরিতে দুই তিনজন চকিতে এদিকে চাহিয়াও গেল। একহাট মেয়ের মাঝে বিভা না জানি কি কাণ্ড করিয়া বসে, মনে করিয়া ব্রতীন্দ্র প্রমাদ গণিল। সে সরিয়া দাঁড়াইয়া আস্তে বলিল, "আচ্ছা, যাচ্ছি।—রাত হয়ে গেল। তোমারও গোছগাছ করা বাকী রয়েছে অনেক। না? যাও, করগে। কাল আমি তিনটের সময় আস্‌বো তোমাকে ষ্টেশনে তুলে দিতে।"

যাহাকে চলিয়া যাইতে আদেশ করিল, সে যে এত শীঘ্রই চলিয়া যাইতেছে—ভাবিতে বিভার মনটা অকস্মাৎ ব্যাকুলভাবে আছড়াইতে আরম্ভ করিল। আর একটা মিনিট্ ব্রতীদা দাঁড়াইবেনা? একটা মিনিট তাহাকে ধরিয়া রাখা যায়না? নিজেকে ভুলিয়া গিয়া অবাক চক্ষু দুইটি ব্রতীন্দ্রের মুখের উপর ফিরাইতেই দেখিতে পাইল, তাহাতে ভাবলেশমাত্র নাই, অত্যন্ত স্বাভাবিক সহজ দীপ্তি যাহা চিরদিন দেখিয়া আসিয়াছে। প্রচণ্ড আঘাতে মনটা বেদনায় কঠোর হইয়া গিয়া সে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আস্‌তে হবেনা—দরকার নেই।"

ব্রতীন্দ্র একটু জোর দিয়া বলিল, "আছে দরকার।—পাগলামি কোরোনা, বিভা!"

বিভা আর এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইতে পারিলনা। বিদ্যুৎ গতিতে দরজা ঠেলিয়া ওপাশে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ব্রতী পুনরুক্তি করিবার অবকাশও পাইলনা, ইচ্ছাও করিলনা। বিভার গতিশীল করুণমূর্ত্তির দিকে একটিবারও না তাকাইয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গলির পথে নামিয়া পড়িল।

বিভা কম্পিতপায়ে কোনমতে উপরে উঠিয়া আসিয়া চিঠিসুদ্ধ কাগজের মোড়াটা ধপ করিয়া বিছানার উপরে ফেলিয়া দিয়া বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজিল। ঘরের মধ্যে মেয়ে ছিল তখন বেশী অবাক্ হইযা তাহারা বলিল, "ওকি ?"

বিভা উত্তর দিলনা গ্রাহ্যও করিলনা, মুখ চাপিয়া পড়িয়াই রহিল।

রেণু একটিবারমাত্র তাকাইযাই ঠোঁটের কোণে আর হাসি চাপিতে পারেনা। দ্রুতপদে বিভাব খাটেব পাশে গিযা ঝুঁকিযা তাহার মাথাটা ঠেলিয়া বলিল, "কি গো বাপু, হল কি তোমার ?" তার পর কানের কাছে মুখ নিয়া 'ফিস্ ফিস' করিয়া, "দাদার সঙ্গে ঝগড়া ? না, বিরহ ?"

বিভা প্রচণ্ড এক ঝাপটায় তাহাকে ঠেলিযা দিয়া ফোঁপাইযা উঠিল। বুকের তন্ত্রীগুলি বুঝি ছিঁড়িযা যায় যায়!' দুইহাতে হৃদ্‌পিণ্ডটা চাপিযা ধরিযা সে ডুক্‌রিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, "উঃ !"

২৯

পথে নামিবার বহুপূর্ব্ব হইতেই শিবানী বার বার সামনে তাকাইয়া দেখিয়াছিল, সেখানে কোন্ বাধা, কোন্ বিঘ্ন পথ আগুলিয়া বসিয়া আছে। দেখিযাছে—বিপদের অন্ত নাই, কাঁটার স্তূপে গোলাপের রূপ ঢাকিয়া গিয়াছে, ভয়াল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পথেব শেষ আর দেখা যায়না। তবু সে পথ চলা সুরু করিয়াছে, দেখিযা শুনিয়া বাছিয়া গুণিয়া।

দেখিয়াছিল, তাই রক্ষা। নতুবা একটার পর একটা এই আক্রমণ যদি অতর্কিত হইত, তাহা হইলে অবিচল থাকার 'সাধ্য তাহারও ছিল কিনা বলা যায়না। অপেক্ষা ও সম্ভাবনা প্রতিমুহূর্ত্তে ছিল বলিয়াই ইস্কুল হইতে বিদায় লইতে বাধ্য হইয়া আজ তাহার মনটা সামান্য একটুখানি নড়িল মাত্র, আর কিছু টের পাওয়া গেলনা।'

সেদিন যখন বাবার অবসর ও মেজাজ বুঝিয়া শিবানী যথাসাধ্য সন্তর্পণে বলিয়া ফেলিল, "আমার ইস্কুলের কাজে রেজিগনেশান দিতে হল, বাবা।" রমেশ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কেন?"

"আমাকে রাখ্‌তে পারবেনা ওরা।"

আরও আশ্চর্য্য হইয়া রমেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাখতে পারবেনা। কি হল হঠাৎ?"

শিবানী বাহুল্য না করিয়া উত্তর দিল, "সরকারী হুকুম এসেছে, আমি পলিটিক্যালি আন্‌ডিজায়ারেবল্‌, সুতরাং স্কুল থেকে আমাকে সরাতে হবে।"

রমেশবাবুর মগজের মধ্যে সংবাদটি একেবারে ঠন্‌ করিয়া ধাক্কা দিল। তিনি প্রথমটা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া, তার পরে চক্ষু পাকাইয়া, তার পরে কুঞ্চিত করিয়া একদৃষ্টে মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি করেছ কি?"

শিবানী উত্তর দিল, "করেছি কিছু বলেতো মনে হচ্ছেনা; সুখুর দিদি—সেইটেই আমার অপরাধ বোধহয়।"

রমেশবাবু পাকা লোক, বুদ্ধি বিচক্ষণতার দক্ষতা দেখাইয়া

আসিয়াছেন যেমন জজিয়তীতে তেমনই পারিবারিক ক্ষেত্রে। সহজ কথাও সহজে তিনি বিশ্বাস করিয়া ফেলেননা। শিবানীকে জেরা করিয়া বলিলেন, "ভাই দোষ করলেই বোনকে নিয়ে টানাটানি করবে, এর কি মানে আছে? ঢের ঢের ছেলে তো জেলে যাচ্ছে, ফাঁসী যাচ্ছে, তাদের সব বোনেদের ওপরে নজর না পড়ে, বেছে তোমার ওপরে কেন?"

শিবানী একটু হাসিয়া বলিল, "তাদের ওপরেও যে পড়েনি, কি করে জানলে বাবা? আমি চাকরী করেছিলাম বলে বরখাস্ত করবার সুযোগ পেয়ে একটা চাক্ষুষ প্রমাণ দেখিয়ে দিল এই মাত্র! যে সব বোনেরা ঘরে বসে আছে, তাদের ওপরে আর কি করবে বল?"

রমেশ মন্তব্য না করিয়া গম্ভীরমুখে শুধু বলিলেন, "হুঁ"।

মেয়ের চোখের দৃষ্টি ও মুখের রেখাগুলির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিতে করিতে খানিক পরে বলিলেন, "দাঁড়াও, দেখতে হচ্ছে একবার পলিটিক্যাল সেক্রেটারীর সঙ্গে কথা বলে।"

শিবানী মনে মনে সন্ত্রস্ত হইয়া বলিল, "দরকার কি অনর্থক? একটা চাকরী গেছে আর একটা আবার মিল্‌বে'। ওজন্যে পলিটিক্যাল সেক্রেটারীর সুপারিশ ধর্ত্তে যাই কেন?"

"চাকরীর জন্যে কিছু নয়—ও তোমার সখের চাকরী গেছে যাক্! কিন্তু মিছে মিছি একটা বদনাম গায়ে মেখে বেরিয়ে আসাটা তো ঠিক নয়।"

শিবানী বাবাকে বিরত করিবার মানসে একটা উপযুক্ত যুক্তি ঠাওরাইয়া আনিতে লাগিল। কিন্তু শিবানীর উত্তরের অবকাশ না

লইয়াই রমেশ আবার বলিলেন, "তুমি ওসব স্বদেশীয়ানার ধার দিয়ে ঘিঁসছনা, এ বিশ্বাস যদি তোমার নিজের স্থির থাকে, তাহলে আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলে পজিশন্‌টা ক্লিয়ার করে আস্‌তে পারি।"

"কি ভাবে ?"

"পরিষ্কারভাবে। অর্থাৎ সুকুর কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে তোমার জ্ঞানতঃ কোনও প্রভাব ছিলনা এবং ওসবের সঙ্গে কোনও যোগ বা সহানুভূতি তোমার নেই, এ কথা তাঁকে বুঝিয়ে দেব।" বলিতে বলিতে এমনভাবে তাকাইয়া রহিলেন যেন চোখের তারা ভেদ করিয়া অন্তরের কোণ-কাণাচ সব দেখিয়া লইবেন।

শিবানী এক মিনিট্‌ ভাবিয়া বলিল, "চাকরী বজায় রাখবার জন্যে যখন আমাদের কোনও ব্যস্ততা নেই তখন অত সব খত দিতে যাওয়ার আমাদের দরকার কি ?"

রমেশ গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপত্তি আছে কিনা তাই বল।"

সোজা চাহিয়া শান্তগলায় গম্ভীরমুখে শিবানী বলিল, "সুখুর সঙ্গে আমার সহানুভূতি নেই, এ কথা কোনদিন যদি বা বল্‌তে পারতাম, আজ পারিনা—আজ সে যখন আমাদের ছেড়ে চলে গেছে।"

রমেশবাবুর মাথা একটু গরম হইয়া উঠিল। কিঞ্চিৎ ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, "সুখুর সঙ্গে সহানুভূতি নেই, সে কথা তো হচ্ছে না! সুখুর বিপ্লবাত্মক কার্য্যকলাপের সঙ্গে সহানুভূতি আছে কি নেই, সেইটে পরিষ্কার করে বল!"

শিবানীর মাথা গরম হইল না বটে, কিন্তু পিতার তিরস্কারব্যঞ্জক ভ্রূকুটিতে মন শক্ত হইয়া উঠিল। সে কঠিনভাবে বলিল, "তার কাজের সঙ্গে সহানুভূতি থাকলে আমার অন্যায় হোত না। কিন্তু আজ আমার মনে হচ্ছে,—যে কাজের জন্য আমার সুখুর মত ভাইকে হারাতে হ'ল, সে কাজেআমার সহানুভূতি নেই বা ভবিষ্যতে থাক্‌বে না।"

এমন কথা শিবানীর মুখে রমেশের কাছে আজ এই নূতন, একেবারে অপ্রত্যাশিত। সুখুর মরণ সংবাদের পর হইতে নানা-কারণে এক আধবার সন্দেহ উঁকি মারিযাছে বটে, কিন্তু শিবানীর মত বুদ্ধিমতী বিদুষী ও প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ে যে মতিচ্ছন্ন ছেলে-ছোক্‌রাদের মত এই ভ্রান্তপথে ঝুঁকিতে পারে, এমন বিশ্বাস তিনি কখনই করিতে পারেন না। তিনি ক্ষণেক স্তম্ভিত থাকিয়া বলিলেন, "তাহলে তারা যে তোমাকে আন্‌ডিজায়ারেবল্‌ মনে করবে, তাতে আর বিচিত্র কি?"

"তা বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু এ রকম কথা আমি পথে ঘাটে বলে বেড়াই নে—তুমি জিজ্ঞেস করলে, তাই বল্লাম।"

ঘটনাটি হইয়া গিয়াছে সপ্তাহখানেক আগে। রমেশবাবু সেদিন আপন মনে কতক্ষণ গুম্‌ হইয়া বসিয়া থাকিয়া সেই নীচে চলিয়া গেলেন, তারপর হইতে এ কয়দিনে নিতান্ত প্রয়োজনীয় দুই চারিটি কথা ছাড়া আর শিবানীর সঙ্গে বাক্যালাপ করেন নাই। শিবানীর গল্প-গুজব করিবার অভ্যাস বা অবসর কোন কালেও বেশী ছিল না, আজকাল মণিকাঞ্চন যোগ হইল—মা হইয়াছেন

উন্মাদ, কথা বলিতে গেলেই কোথা হইতে কি একটা না একটা উৎপাত বাধাইয়া বসেন, বাবা হইলেন বিরূপ, দায়ে ঠেকিয়া এখন সে একেবারেই নিঃসঙ্গ ও নির্ব্বাক।

সকালবেলাকার একটা ঝিরঝিরে হাওয়া মিঠা হইয়া গায়ে আসিয়া ছড়াইয়া যাইতেছিল। শিবানীর মর্ম্মমাঝে তাহার স্পর্শ-রেশটুকু পশিয়া কী এক অনির্দ্দেশ্য বেদনায় মন ভারী করিয়া দিল। মিঠা হাওয়া আর মিঠা লাগে না। ছেলেবেলার কত বিস্মৃত, পুরাণো ছবি মনের দুয়ার আলগা পাইয়া একটি একটি উপরে ভাসিয়া আসিতেছে। শিবানী বাধা দিল না, দেখিতে আজ ভালো লাগে। কত রূপ বিরূপ হইয়া গিয়াছে, কত রং বিবর্ণ ; আবার তাহারই আশে-পাশে, তাহাকেও ছাপাইয়া কত নূতন রঙের যে বজ্রশিখা জ্বলিতেছে, তাহার আলোকচ্ছটায় শিবানীর দেহের রক্ত ধীরে ধীরে যেন উত্তপ্ত, তাজা হইয়া উঠিল। একবার গা-ঝাড়া দিয়া মনের তন্দ্রা ঝাড়িয়া ফেলিয়া আবার শান্তভাবে ইজিচেয়ারে হেলিয়া বসিল। ইস্কুলের ছবিখানি চোখে ভাসিল, তাহার উঁচু দালানটা, তাহার প্রশস্ত মাঠখানি। মনে পড়িতে লাগিল মেয়ে-গুলির কচিমুখ। সময়ে অসময়ে ভয়ে ও নির্ভয়ে কত আবদার, অনুরোধ, অনুযোগ লইয়া ঘরে ঢুকিয়া সেই 'শিবানীদি ! শিবানীদি !' মেয়েরা এখনও জানেও না—তাহাদের শিবানীদি আর তাহাদের মাঝে ফিরিবে না। শিবানী নিঃশ্বাস ফেলিল।

ঠক্ করিয়া কিসের শব্দ হইতে সে পিছনে ঘাড় ফিরাইয়া দেখে, হেমপ্রভা কি করিয়া হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া গিয়া দুয়ারের কবাটে

মাথা ঠুকিয়া গিয়াছে। মাথার কাপড়টা খসিয়া পড়িয়াছে, চুলের উপর হাত ঘসিতে ঘসিতে তিনি তদবস্থায়ই মেজের উপর বসিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। ব্যস্ত হইয়া শিবানী আসিয়া পিছন হইতে মার কাঁধের কাছে হাত জড়াইয়া বলিল, "আহা-হা, লাগ্‌ল মা বড্ড ?"

মা কোনও কথা বলেন না; শিবানীর হাতের উপরে মাথা, ঝরঝর চোখের জলে কতক্ষণ তাহার বাহু ভিজাইয়া দিয়া তারপর বিহ্বলের মত তাকাইয়া রহিলেন।

কেমন করিয়া মা হঠাৎ পড়িয়া গেলেন, কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া শিবানী একবার ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখে—কবাটের পাশেই ছোট্ট একটা টুল উল্‌টাইয়া কাৎ হইয়া পড়িয়া আছে, অনেকটা উপরে ফ্রেমে বাঁধানো স্নুখেন্দুর একখানা ছবি পড় পড় হইয়া ঝুলিতেছে। মায়ের দুরবস্থা দেখিয়া শিবানী হাসিবে না কাঁদিবে, ভাবিবার অবকাশ না হইতেই হেমপ্রভা জড়তা কাটাইয়া উঠিয়া উবুড় হইয়া আবার টুলখানার দিকে হাত বাড়াইলেন।

শিবানীর বুক বেদনায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি মাকে থামাইয়া দিয়া বলিল, "তুমি দাঁড়াও মা, আমি পেড়ে দিচ্ছি ছবি।"

স্নুখেন্দুর ছবিখানা!—কিশোর মুখের সেই সরল দীপ্তিটুকু, ঠোঁটে আর চোখে সেই চঞ্চল স্বচ্ছ হাসি, ঠিক তেম্‌নি আছে—ঠিক তেমনি! দেড়মাস আগে যেমন ছিল, ঠিক তেম্‌নি!

শিবানী সন্তর্পণে নামাইয়া ছবিখানি নিঃশব্দে মায়ের সাম্নে রাখিয়া দিল।

হেমপ্রভা খট্‌খট্‌ শব্দে উচ্চ হাসিয়া সে খানিকে জাপ্‌টাইয়া কী যে করিতে সুরু করিলেন, দেখিতে শিবানীর মন সরিল না। সে বাহিরের দিকে চাহিযা প্রথমটা একবার ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া তারপরে চোখ বুঁজিযা রহিল—কয়টি মুহূর্ত্ত।

হঠাৎ বাধা পাইল রমেশবাবুর পায়ের শব্দে। সে শুনিতে পাইল, রমেশ তাহারই ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া আবার বাহির হইয়া আসিতেছেন। শিবানী তাড়াতাড়ি বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। রমেশ তাহাকেই খুঁজিতেছিলেন, বজ্র কঠিন স্বরে বলিলেন, "এসো এদিকে।"

ব্রাউন রঙের লম্বা খামখানির ভিতর হইতে একখানা কাগজ টানিয়া বাহির করিয়া শিবানীর টেবিলের উপরে ফেলিয়া রমেশ বলিলেন, "পড়।"

উৎকণ্ঠিত হইযা শিবানী দেখিল,—সরকারী চিঠি, কথা বেশী নয়, গুটি পাঁচ সাতেক টাইপ করা লাইন।

মর্ম্ম,—যেহেতু রায বাহাদুর রমেশচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার পুত্র ও কন্যার প্রতি উপযুক্ত শাসন প্রযোগ করেন নাই ও করিতেছেন না, এবং যেহেতু তাঁহার পুত্র ও কন্যার কার্য্যকলাপ ঘোর বিপ্লবাত্মক এবং সমাজ শান্তির পরিপন্থী, অতএব তাঁহার সরকার প্রদত্ত রায়-বাহাদুর খেতাব প্রত্যাহার করা হইল। এবং ভবিষ্যতে কন্যার প্রতি উপযুক্ত শাসন প্রদর্শন না করিলে সরকারী পেন্‌শন্‌ রহিত হইবার সম্ভাবনা।

শিবানী পড়িয়া স্তব্ধ হইযা রহিল। চোখের সামনে ঘনাইয়া আসিল একটা অন্ধকারের কুহেলী।

রমেশ শুষ্ক গম্ভীর স্বরে দাবী করিলেন, "কি ?"

শিবানী নিজেকে সংবরণ করিযা শান্তভাবে বলিল, "পড়লাম।"

বাজের আওয়াজের মত ভয়ঙ্কর দাপটে রমেশ বলিলেন, "পড়লাম !! তার পরে ?—একি ছেলেখেলা পেয়েছ নাকি ?"

শিবানী বাবার মুখের দিকে শুধু চাহিয়া দেখিল, উত্তর করিল না।

"জবাব দাও !"

শিবানী বলিল, "এর ওপবে আর আমি বলব কি ?"

রমেশ শিবানীর মুখের উপর চক্ষু পাকাইয়া রহিলেন ; মেয়ের এই সহজ শান্ত বচনে মনের ক্ষোভ তাঁহার হঠাৎ এমন দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল যে বাক্যস্ফুর্ত্তি হইল না।

৩০

একটি বছর আগে এমন দিনে এই নিরালা পল্লীর কোনটিতে কেমন করিয়া তাহার দিনগুলি কাটিত আর এক বছর পরে আজ বা কেমন করিয়া কাটিতেছে, নিঃসঙ্গ বিভা একলা মনে কেবল তাহাই ভাবে। সেই শান্ত নীরব সকাল সন্ধ্যা, জনবিরল সেই নিস্তব্ধ জ্যৈষ্ঠের মধ্যাহ্ন বাবা মায়ের স্নেহের নিবিড়তায ছিল ভরা ; একাকিত্বের বোধ তাহার জীবনে একটা দিনের তরেও চাপে নাই। আকাঙ্ক্ষা কিছুরই ছিল না; তাই অভাবও কিছুরই হয নাই। আজও সকাল আসে তাহার সুকুমার সুষমাসম্ভার লইয়া, সন্ধ্যা

নামে ঐ বাঁশগাছগুলির মাথার উপরে কালো ওড়নায় মুখ ঢাকিয়া, পাতার ফাঁকে ফাঁকে, মাথার উপরে ঝিক্‌মিক্ করিয়া তারকা হাসে, তবু আগের সেই দিনগুলির মত তাহার প্রাণে কেন সাড়া পৌছায় না? বছর না ফিরিতে এমনতর উলট-পালট হইয়া গেল! বিভার মন নিজের গণ্ডীর মধ্যে নিজে গুমরিয়া কাঁদিয়া ফেরে, শুধাইবার কেহ নাই, সান্ত্বনা দিতে কেহ নাই। শুধাইবার কি বা আছে, সান্ত্বনাই বা কে দিতে পারে? সে তো নিজেই জানে সব। শুধু প্রতীকার করিতে পারে না, এই তো দুঃসহ ব্যথা; নিজের প্রতি অযথা আক্রোশে তাহার মন নিজেকে কেবলই আঘাত করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া পড়ে। হাল ছাড়িয়া দিয়া সে ভাবে, কেন ব্রতী আসিয়া দেখা দিযাছিল? কেন তাহাকে ভুলাইল? প্রবঞ্চক! সেদিন সেই নিদাঘ সন্ধ্যায় ঐ তুলসীমঞ্চের তলা হইতে বিকীর্ণ, প্রদীপের অস্পষ্ট আলোয় যে আসিয়া দাঁড়াইল, সে যদি না আসিত, তবে কোন্ ক্ষতি কার ছিল? পনেরো বৎসর যে জন অনায়াসে দূরে থাকিতে পারিয়াছে, সারাজীবন সে কেন দূরেই থাকিল না?—ভাবিতে ভাবিতে ব্রতীর মুখখানি তীব্রচ্ছটায় উদ্ভাসিয়া ওঠে; যতই বিভা মুছিয়া ফেলিতে চায়, ততই আরও অবাধ্যভাবে ব্রতীর মুখ চোখ হাসে, বিশেষ করিয়া সেই সস্নেহ হাসিটুকু, আসিবার কালে ষ্টেশনে শেষ যেটুকুকে সে অভিমানে অপমানে অনাদর করিয়া আসিয়াছে। ট্রেণের বাঁশী বাজিল, গাড়ীগুলি নড়িয়া উঠিল, ব্রতী কামরার দরজাটা ছাড়িয়া দিয়া হাসিয়া বিদায় লইয়াছে—'আচ্ছা, যাই এখন!' বিভা উত্তর দেয়

নাই, হাসে নাই, শক্ত কাঠ হইযা মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে। এই ছবিটি কেবলই মনে পড়িতে থাকে।

ভোর না হইতেই বিভার আজ ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কি যেন স্বপ্ন দেখিতেছিল মনে নাই, শুধু বুকের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে একটা মিলনের চঞ্চলতা। এত ভালো লাগিতেছিল, বিভা প্রাণপণে চোখ বুঁজিয়া মনে আনিতে চাহিল,—কিন্তু মনে পড়িল না। পাখীর প্রথম কল-কাকলী একটু একটু কানে পশিতে পশিতে সমস্ত দেহমন অর্দ্ধতন্দ্রা অর্দ্ধ-জাগরণের মধ্যে অপূর্ব্ব আবেশে আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। আর আপনার অগোচরে বিভার মুখের উপর লাগিযা রহিল একটু হাসি।

বিছানায় পড়িয়া থাকিতে আর ইচ্ছা হইল না। উঠিযা বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল। আকাশে রঙের আগুন ধরে নাই, পাৎলা নীল আর পাৎলা শাদা এখানে সেখানে কেমন যেন মেশামেশি হইযা রহিয়াছে আর গতরাত্রির আধখণ্ড রূপালী চাঁদ ফ্যাকাশে হইয়া ঠিক বরফের টুক্‌রার মত ভাসিযা বেড়াইতেছে আকাশের পশ্চিম কিনারায়। বিভার বড় ভালো লাগিল। ভাবিল, এমন অপরূপ মুহূর্ত্তটি রোজ কেন বিছানায় শুইযা শুইযা অবহেলায হারায়?— কিন্তু এত ভোরে উঠিয়া সারাদিন করিবেই বা কি? কাজ যে কিছুই নাই, দিন আর 'ফুরাইতে চাহে না। চট্‌ করিযা আবার মনে আসিয়া পড়িল—দিনগুলির দুর্ব্বহ দীর্ঘতা; দুঃসহ একাকিত্বে! সজীব তাজা মুখশ্রী নিমেষে ম্লান হইয়া আসিল। ভোরের ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওয়ার সাথে মিশিয়া ছড়াইয়া পড়িল একটি বিষণ্ণ নিঃশ্বাস।

এর চেয়ে ঘুমাইয়া সময় কাটাইয়া দেওয়াও স্বস্তি। স্বপ্নে নিজেকে তবু ভুলিয়া থাকা যায়!—গত রাত্রের স্পর্শ অজানিতে আবার গায়ে আসিয়া লাগে। একবার পুলকে কাঁপিয়া একবার বিক্ষোভে আছড়াইয়া বিভা বিহ্বল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সকালবেলা স্নান সমাপন করিয়া ছোটখাট গৃহকর্ম্ম সারিয়া সে দশটার মধ্যে রান্না বাড়া শেষ করিয়া রাখে। তারপরে অফুরন্ত বিশ্রাম! এই দীর্ঘ সময়খানির মধ্যে বিভা কখনও মাসিক পত্রিকা পড়ে কখনও সেলাই করে, আর সর্ব্বাগ্রে পড়ে, দৈনন্দিন খবরের কাগজখানি। ব্রতী নিষ্ঠুর, ব্রতী হৃদয়হীন, ব্রতী তাহাকে লাঞ্ছনা দিতেছে, কত শত বিশেষণ যে ব্রতীর বিরুদ্ধে বিশেষিত হইতে থাকে বিভার মনে তাহার ইয়ত্তা নাই—তবু তাহার নির্দ্দেশ না মানিয়া সে পারে না। যখনই কথাটা মনে পড়ে, তখনই হঠাৎ নিজেকে ধিক্কার দিয়া কাগজগুলি সরাইয়া রাখে। কিন্তু ঘুরিয়া ফিরিয়া দিনের মধ্যে এমন একটি সময় নিত্যই আবার আসে, যখন ভাঁজ খুলিয়া বাকী পৃষ্ঠা কয়খানি পড়িয়া শেষ করিয়া রাখিতেই হয়। নহিলে দিনের কাজ অসমাপ্ত থাকিয়া যায়,—কারণ ব্রতীর নির্দ্দেশ যে।

আজ দুপুরবেলাও খাইয়া দাইয়া কাগজ হাতে করিয়া বিভা খাটের উপর আসিয়া কাৎ হইল। বড় বড় হেড্‌লাইনগুলি দেখিতে দেখিতেই চোখে কেমন যেন তন্দ্রা জড়াইয়া আসিতে চায়। শ্রান্তি দূর করিবার মানসে বার কয়েক পাখা চালাইয়া একবার বাহিরের টগরগাছগুলির দিকে চাহিল, একবার রান্না ঘরের

চালাখানির দৃশ্যমান অংশটুকুর দিকে। অবশেষে একটু পৃষ্ঠা উল্টাইয়া কাগজগুলিকে বিকালের আশায় একপাশে ঠেলিয়া রাখা ছাড়া উপায় দেখিল না।

ভাঁজ করিতে গিয়া চোখে পড়িয়া গেল এক কোণে ছোট্ট এক প্যারাগ্রাফে সরকারী নোটীস।

আচমকা তীর বিদ্ধ হইয়া বিভার সমগ্র দৃষ্টি সেইখানে সহসা একেবারে আট্‌কাইয়া পড়িল। চোখ একবার রগ্‌ড়াইল, তুইবার রগ্‌ড়াইল, তারপরে, মুহুর্মুহুঃ পলক ফেলিয়া সম্পূর্ণ মেলিয়া ধরিয়া দেখিল, ঠিক দেখিয়াছে কিনা।—ঠিক্? সরকারী নোটীস্,—তার নীচেই লেখা ফেরারী আসামীর তালিকা, তার সঙ্গে সঙ্গে পুরস্কার ঘোষণা—তারপরের তৃতীয় নামটি কি ব্রতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়? ঠিকই? গোঁসাইপুরনিবাসী স্বর্গীয় লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র ব্রতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় !!!

বিভার চোখে নিদ্রা ভয়ঙ্কর ধাক্কায় চুরমার হইয়া গেল। মাথা ঘুরিযা উঠিয়া হাতের কাগজখানা খস্‌-স্‌-স শব্দে পড়িয়া গেল মেঝের উপর। মাথাটাকে কোন মতে সাম্‌লাইয়া বিভা তড়াক্ করিয়া খাটের উপর উঠিয়া বসিয়া অশান্তস্বরে ডাকিল "মা!"

ক্ষেমদা পাশের ঘরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

বিভা আর ডাকিল না। খাট হইতে নামিয়া কাগজখানা তুলিয়া আনিয়া আবার নির্ণিমেষে চাহিয়া রহিল।—ব্রতীদা পলাতক? তাহার ব্রতীদা? তাহাকে ধরিয়া আনিয়া বন্দী করিবার জন্য সরকার সহস্রদিকে জাল ফেলিয়া বসিয়া আছে?—ব্রতীদা কোথায়

আজ? হয়তো আশ্রয় তাহাকে কেহ দেয় নাই, হয়তো গোয়েন্দার দল তাহাকে দেশ হইতে দেশান্তরে, বনে, জঙ্গলে, পর্ব্বতে বন্য পশুর মত খেদাইয়া ফিরিতেছে! বিভার মনটা একেবারে পাগল হইয়া উঠিল। নিদাঘের উত্তপ্ত মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড হাওয়ার জ্বালায় বন্ধুবিহীন মরুপথের ছবি তাহার অনুভূতির ছায়াপটে যেন প্রখর হইয়া ফুটিয়া উঠিল। আম কাঁটাল গাছগুলির পাতার মধ্য দিয়া সোঁ সোঁ করিয়া বাতাস বহিয়া যায়, অতিষ্ঠ হইয়া বিভার মন সঙ্গে সঙ্গে ফুকারিয়া উঠে—ব্রতীদা, আমার ব্রতীদা!

তাই ব্রতীদা সেদিন অমন করিয়া বিদায় লইয়াছিল! তাই তো! কিন্তু পরিষ্কার করিয়া সেকথা তাহাকে বলিল না কেন? অমন করিয়া অবজ্ঞা দেখাইয়া উপেক্ষা দেখাইয়া, মুখ ফিরাইয়া তবে তো সে চলিয়া আসিত না! ব্রতী করুক্ তাহাকে শত অপমান, সহস্র বঞ্চনা, তবু সে যে ব্রতী!—সে একটিবার জানিত যদি শুধু!

টগরগাছগুলির উপর দিয়া রৌদ্রদগ্ধ আকাশের দিকে শুষ্কচোখে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে বিভার চোখ জ্বালা করিয়া উঠিল।

রাতের অন্ধকারে বেদনা আর বাধা মানিতে চাহিল না। অভিমানের অনাদরে ব্রতীর যে বই দুইখানা এই একমাস যাবৎ বাক্সের তলায় কোণ ঠেসা হইয়া পড়িয়া আছে, আজ নিরুপায় অসহায় হইয়া বিভা সেগুলি টানিয়া বাহির করিল। পঞ্চাশবার আঁচল দিয়া সযত্নে মুছিয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া অনিমেষ-নয়নে দেখিয়াও তাহার তৃপ্তি হইল না; সমস্ত কাজের অন্তে ঘুমাইতে যাইবার সময় বই দুখানি বুকে করিয়া লইয়া গেল বিছানায়। নিজেকে অকারণে

পিষিয়া মারিতে ইচ্ছা হয চোখের কোণে জল উছলিয়া উঠে, বুকের ব্যথা কোনমতেই আজ থামাইতে পারে না। অদম্য আবেগে ফুলিযা ফুলিয়া বিভা বই দুইখানিকে বুকের মাঝখানে এক একবার চাপিয়া ধরে—ব্রতীদার কত দিনের কত স্পর্শ এই পাতাগুলির অঙ্গে অঙ্গে লাগিয়া আছে না জানি! পুলকে শিহরিয়া উঠিয়া, বেদনায় আকুল হইয়া সে বার বার গালে ঠোঁটে ছোঁয়াইযা ছোঁয়াইয়া অবশেষে চুমায় চুমায মলাটের পাতাগুলি ভিজাইয়া দিল।

৩১

ইস্কুলের ছুটি কযেকদিন যাবৎ ফুবাইযা গিযাছে। কিন্তু শিবানীর ছুটি এবার অফুরন্ত। ছুটি—তথাপি বিশ্রাম মেলে নাই। দিনের মধ্যে যে কয়টি ঘণ্টা ইস্কুলে তাহাকে ব্যাপৃত করিয়া রাখিযাছে, আজ যেন দেখিতে দেখিতে কাজের দায়িত্বের পরিমাণ তুলনায় তাহাকে ছাপাইয়া উঠিল। সময়ে কুলাইতে চায় না। বাহির এতদিন যেন অপেক্ষা করিযাছিল, তাহার দাবী শিবানীর কাছে পরিপূর্ণ সমাদর পাইবার অবকাশ এতদিন পায নাই, আজ সে বিদ্যালয়ের রুটীনের বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই বাহির হুড়মুড় করিয়া তাহার চারিপাশে একান্ত ভাবে ঘিরিয়া ধরিল। এদিকে ঘরের মধ্যে সে ছিল এতদিন মুক্ত, দাযিত্ববিহীন —আজ ঘরের শান্তি ও শৃঙ্খলা উলট্ পালট্ হইযা গিয়াছে, দাযিত্ব ঘনাইয়া আসিয়াছে আর্থিক প্রয়োজনেরও।

শিবানী আজকাল অবসর পাইলেই উপন্যাস লেখে। লিখিত আগেও, কিন্তু তখন ছিল তাহা শুধু একটু হৃদয়ের তৃপ্তি, স্বভাবজাত যে সৌন্দর্য্যের অনুভূতিটি লইয়া জন্মিয়াছে তাহাকেই সময় সময় কল্পনার রং মাখাইয়া রূপ দিয়াছে মাত্র; আজ লিখিতে হইতেছে দায়িত্বের চাপে অর্থাৎ অর্থের প্রয়োজনে। স্কুলের আয়ের পথ ঘুচিয়াছে; অথচ যে-পিতার মতের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহী, যে-বিদ্রোহ পিতার বৃদ্ধ বয়সের আয়ের সংস্থান বন্ধ করিতে বসিয়াছে, সেই পিতারই উপার্জ্জনের অন্নে যদৃচ্ছা জীবন কাটাইতে অপমান বোধ হয়, অন্ততঃ মনে অরুচি আসে। সুতরাং সাহিত্যের এই পথটি ছাড়া আজ তাহার গত্যন্তর নাই।

পিতার সঙ্গে ব্যবধান দিনে দিনে বাড়িতেছে। অথচ পিতার মুখের দিকে চাহিয়া মাঝে মাঝে তাহার কষ্টও হয়। ঐ ভ্রূকুটি গম্ভীর মুখের আড়ালেও বুকের তলে তলে সন্তানের জন্য স্নেহ যে কতখানি সঞ্চিত হইয়া থাকিতে পারে, শিবানীর চোখে কখনও কখনও তাহা ধরা পড়ে। সেদিন যখন আই-এস-সি পরীক্ষার ফল বাহির হইল, রমেশ অসময়ে উপরে আসিয়া অযাচিতভাবে শিবানীর কাছে আসিয়া বলিলেন, "গেজেট এসেছে।" বলিয়া নিজেই গেজেটখানা টেবিলের উপর পাতিয়া ধরিয়া আঙুল দিয়া দেখাইলেন, "সুখু থার্টি-সেকেণ্ড প্লেস্ পেয়েছে।" শিবানী কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না, শুধু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, যে অবাধ্য স্বেচ্ছাচারী ছেলেকে তিনি মরণেও ক্ষমা করিতে পারেন নাই, তাহারই কৃতিত্বে গর্ব্বোৎফুল্ল স্নেহের আভা-মাখানো বাপের

মুখের ছবিটি কি করুণ। আর—সে-আনন্দের অংশ দিতে আসিয়াছেন তাহারই কাছে যে অবাধ্য মেয়ে তাঁহার সেই ছেলেকে মরণের মুখে পাঠাইয়াছে বলিয়া তিনি জানেন। আরও করুণ!—বাবার মুখের সেদিনকার সেই অনির্ব্বাচ্য ভাবরেখাগুলি, জানালার পথে চাহিয়া থাকা গম্ভীর চোখের উদাস দৃষ্টি, শিবানীর কেবলই থাকিযা থাকিয়া মনে পড়ে। কিন্তু সান্ত্বনা দিবার অধিকার তো তাহার নাই!

শিবানী আজও বসিযা বসিয়া লিখিতেছিল। মেঘলা দুপুরের ছায়াচ্ছন্ন নীরবতার সঙ্গে রাস্তার একটানা কলরবের মন্থর তাল মিশিয়া যে বিশ্রামের সুর সৃষ্টি করিযাছে, তাহার লাগিতেছে ভালো। লেখার মুখে প্রেরণা আসে।

সুমুখে দরজার জাপানীপাখী আঁকা গাঢ় সবুজ পর্দ্দাখানি হঠাৎ তুলিযা ঝি একপাশে সরিযা দাঁড়াইল, চটিজুতার মৃদু আওয়াজ করিয়া অপ্রত্যাশিতভাবে ঘরে ঢুকিল বিভা।

শিবানী চোখ তুলিযা কলম থামাইল। একটুখানি হাসিয়া বলিল, "আপনি যে এ সমযে? ইস্কুল ছুটি হযে গেল?"

বিভা সংক্ষেপে বলিল, "হ্যাঁ।"

"ও।—বসুন।"

বিভা বসিল বটে, কিন্তু কেমন ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। খানিকক্ষণ কিছুই বলিল না।

শিবানী জিজ্ঞাসা করিল, "ছুটিতে ভালো ছিলেন তো?"

"হ্যাঁ।" প্রত্যুত্তরে তাহারও যে জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল,

"আপনি ভালো আছেন তো ?" সেকথা বিভার মনে আসিল না। সে যাহা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছে, কেমন করিয়া সে কথাটি পাড়িবে তাহাই মনে মনে ঠাওরাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। অপ্রাসঙ্গিকভাবে হঠাৎই বলিয়া বসিল, "ব্রতীদা কোথায়, শিবানীদি ?"

আশ্চর্য্য হইয়া শিবানী বলিল, "ব্রতীবাবু ? কেন ?"

বিভা বলিল, "আমার দরকার বড্ড !"

"দরকার ? ও। কিন্তু তিনি তো কল্‌কাতাতে নেই বোধহয় আজকাল ?"

বিভা গম্ভীর মুখে বলিল, "কলকাতাতে নেই সেটুকু আমিও জানি। কোথা। আছেন, তাই জিজ্ঞেস করছি।"

"আপনার দাদা আপনাকে বলে যান্ নি ?"

বিভার মুখচোখ কেমন একটু লাল হইয়া উঠিল। কে তাহাকে অপমান করিল, কী অপমান, তাহা, বিশ্লেষণ করিতে না পারিয়াও সে নিজেকে অপমানিত বোধ করিল। শিবানীর মুখের দিকে একবার চাহিয়া জবাব দিল "না।"

শিবানী বলিল, "আচ্ছা, তাঁকে কি জন্যে আপনার দরকার, আমাকে বলুন। দেখি, আমিই হয়তো কাজটা করে দিতে পারব।"

"আপনি পারবেন না।"

শিবানী বিস্মিত হইয়া বলিল, "আমি পারব না ?"

বিভা বলিল, "না।—কাজের দরকার আমার কিচ্ছু নেই ; তিনি কোথায় আছেন সেইটে জানাই আমার দরকার শুধু।"

"তাহলে তো মুস্কিল ! কোথায় আছেন, তাতো আমি বল্‌তে পারিনে।"

বিভা তাহার দিকে একদৃষ্টে তাকাইযা অনুনয করিয়া বলিল, "বলুন, শিবানীদি !"

"আমি তাঁর খবর কোত্থেকে পাব, মিস্ গাঙ্গুলী ? আপনার দাদার খবর তো আপনারই জানা বেশী সম্ভব !"

বিভা জোর দিযা বলিল, "আপনিই জানেন।"

"আমি জানি !! এ আপনাকে কে বল্লে ?"

বিভা পুনরুক্তি করিল, "ব্রতীদা বলে গেছেন, আপনি জানেন।"

"ব্রতীদা বলে গেছেন !"

"হুঁ।"

শিবানী বিভার দিকে বড় বড় চোখ মেলিযা থাকিয়া ক্ষণপরে জিজ্ঞাসা করিল, "আর কি বলে গেছেন তিনি ?"

"আর কিছু বলেননি।"

শিবানী ভাবিতে লাগিল।

অসহিষ্ণু হইয়া বিভা বলিল, "আপনার কোনও ক্ষতি হবে না শিবানীদি। আমি তাঁকে ছিনিযে নেব না। শুধু আমাকে একটু জান্তে দিন্। আমার বড্ড মন কেমন করছে।" শেষের দিক্‌টায় সুর এমন ক্রন্দনের মত হইয়া বাজিল যে শিবানী বিস্মিত হইয়া চোখের দিকে তাকাইয়া ভাবিল, মেযেটির কথাগুলি এমন অস্বাভাবিক হইয়া উঠিতেছে কেন ?

বিভা অদ্ভুত ব্যাকুলতার ছাপ মুখে লইয়া তাহার দিকে চাহিয়াই রহিল।

শিবানী এবার মৃদুগলায় বলিল, "ব্রতীবাবু পলাতক হয়ে আছেন, জানো না বিভা?" একটু হাসিয়া সঙ্গে সঙ্গে—"'তুমি' বল্‌ছি বলে কিছু মনে কোরোনা, মিস্ গাঙ্গুলী, তুমি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। এখন আর তোমাদের হেড্‌মিস্‌ট্রেস্‌ও নই যে ফর্ম্ম্যালিটী বজায় রাখতে হবে। এখন থেকে দিদি বলেই আমাকে জেনো।"

অতর্কিত ও অযাচিত এই আত্মীযতা বিভার ভালো তো লাগিলই না, ববং মনে মনে সে ফুলিয়া উঠিল। শিবানীদি বড় আর সে ছোট—এ পার্থক্য সে কিছুতেই স্বীকার করিতে চায় না। ব্রতী এই পার্থক্য দেখাইযা শিবানীর গৌরব গাহিবে, আব শিবানীদি বযসের গোটাকতক বৎসরের প্রবীণতার জোবে তাহার উপর মুরুব্বিয়ানা চালিবে, ইহা তাহার অসহ্য লাগিল। এই দিদিত্বের আত্মীয়তার দাবী একেবারেই গ্রাহ্য না করিয়া সে শুধু পূর্ব্ব সূত্রটি ধরিযা উত্তর দিল, "তা জানি—কাগজে পড়েছি।"

শিবানী মিষ্ট ভৎ´সনার সুরে বলিল, "তাহলে তাঁর খোঁজ জানতে চাওযা তোমার অন্যায়, বিভা!"

"অন্যায কিসে হল? আমি কি সরকারী গোয়েন্দা যে আমাকে জান্তে দিতে এত ভয়? আমি তাঁকে ধরিয়ে দেব বলে আপনার আশঙ্কা হচ্ছে নাকি?"

"তা নয।"

"তবে কি?"

যে বিভা গাঙ্গুলী দুইমাস আগেও তাহার সঙ্গে কথাটি কহিতে সাহসে অগ্রসর হইত না ; বিনয় সম্ভ্রমের আতিশয্যে একটির বেশী দুইটি কথা মুখে শোনা যায় নাই, আজ তাহার সহিত মুখে মুখে তর্ক করিতেও ইহার যে সাহসের অন্ত নাই ! বিস্ময়ে ও কৌতূহলে শিবানী তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

বিভা দাবী করিল, "বল্‌বেন না ?"

"দেখ বিভা ব্রতীবাবু নিজে থেকে যখন তোমাকে জানাচ্ছেন না, তখন আমার বলবার অধিকার নেই তোমারও জান্তে চাইবার অধিকার নেই।"

প্রবল ঈর্ষ্যায় বিভার শরীর জ্বলিয়া উঠিল। গম্ভীরমুখে সে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি জান্‌ছেন কোন্ অধিকারে, শুন্তে পারি কি ?"

শিবানী চুপ করিয়া গেল। তারপর মাথাটা একটুখানি দোলাইয়া শুধু কহিল, "মিছে রাগ করছ, বিভা !"

শিবানীদিকে ইস্কুলের কাজের মধ্য দিয়া ছাড়া ঘনিষ্ঠভাবে জানিবার সুযোগ কখনও বিভা পায় নাই। ইস্কুলেব রুটীনেব কাজের মধ্যে তাহাকে দেখিয়াছে ঘড়ির কাঁটার মত পুঙ্খানুপুঙ্খ, ডিসিপ্লিনের বেলায় পাথরের মত শক্ত, অনড় কিন্তু তথাপি তাহার সহজ হাসিটুকু দেখিয়া সে এতদিন নিশ্চয় জানিয়াছে, গোটা মানুষটাই পাথর দিয়া গড়া যন্ত্র নয়। আজ আবার তাহাব ধাঁধা লাগিল—এ তো আবার সেই শিবানীদি অফিসঘরে ডেস্কের পাশের কর্ম্মনিরত যে গম্ভীর মূর্ত্তিটিকে নড়াইবার কাহাবও সাধ্য নাই, আগাইতে মানুষের ভয় করে ! কেমন করিয়া যে শিবানীদির

নিকট হইতে কথা বাহির করা যায়, বিভা ভাবিয়া ভাবিয়া কিছুই কিনারা পাইল না। মনে মনে মাথা খুঁড়িতে লাগিল। ব্রতীর উদ্দেশ তাহাকে যে পাইতেই হইবে, ব্রতীকে না দেখিলে সে বাঁচিবে না।

বিভার বুকের মধ্যে রক্ত এমন অসহায় আবেগে তোলপাড় করিয়া উঠিল যে, নিমেষে সকল ঈর্ষ্যা ঠেলিয়া ফেলিয়া একান্ত দীনের মত শিবানীর মুখের পানে চাহিয়া বলিয়া ফেলিল, "শিবানীদি, আমি রাগ করে থাকি যদি, মাপ্ চাইছি। আপনি আমার ওপর রাগ করবেন না। কিন্তু বড্ড যে মন ছটফট্ করছে, শিবানীদি! একটিবার আমায় বলুন, আমি একবার শুধু যাব ব্রতীদার কাছে। কোনও ক্ষতি করব না তাঁর, কোনও ক্ষতি হবে না আপনার!"

শিবানী সস্নেহে বলিল, "আমি বেশ বুঝতে পার্চ্ছি, বিভা, দাদার জন্যে তোমার মন কাঁদছে। কিন্তু কি করব বল? রেভোল্যুশনারীদের জীবন তুমি জানো না—হৃদয়ের ছোটখাট সুখদুঃখকে পায়ে পিষে ফেলতে হয় তাদের।"

বিভা বলিয়া উঠিল, "আমি তো রেভোল্যুশনারী নই!"

শিবানী মৃদু হাসিয়া বলিল, "তুমি তো নয়। কিন্তু রেভোল্যুশনারী দাদার বোন্ যে!"

বিভা ক্ষোভে গর্জ্জাইতে লাগিল।

শিবানী সান্ত্বনাচ্ছলে বলিল, "তুমি মন খারাপ কোরো না সেজন্যে। তিনি ভালোই আছেন—নিরাপদে।"

শিবানীদি জানেন ব্রতী নিরাপদে আছে, অথচ তাহার জানিবার অধিকার নাই! ব্যথিতচিত্তে বিভা পরিমাণ করিয়াই উঠিতে পারিল

না, কতখানি প্রাক্তন সৌভাগ্য সাথে করিয়া শিবানীদি জন্মিয়াছিলেন! দেয়ালের ছবিগুলির দিকে শূন্যচোখে তাকাইয়া কতক্ষণ বসিয়া থাকিয়া সে ম্লানমুখে বলিল, "তাহলে যাই, শিবানীদি।"

"আচ্ছা!—কিন্তু অনর্থক অস্থির হোয়ো না তাঁর জন্যে। যাঁকে ভালোবাসো, তাঁর মঙ্গলের জন্যে এতটুকু বিচ্ছেদ মেনে নিতে পারো না? তাঁকে এখন অজ্ঞাতবাসে থাকতেই যে হবে। জান্তে চেয়ো না।"

বিভার ম্লান মুখ কালো হইয়া উঠিল। শিবানীর মুখ হইতে এ অযাচিত উপদেশ কে চাহিয়াছে? দৃপ্ত দুই চোখে চাহিয়া সে উষ্ণভাবে জবাব দিতে গেল, "কে ভালোবাসে?" কিন্তু পলকে বুদ্ধি সংযত হইয়া মুখের কথা মুখেই চাপা পড়িয়া গেল, কেবল চোখ দুইটি জ্বলিয়া থাকিয়া একটা আগুনের হল্‌কা ছড়াইয়া দিল।

সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া শুধু বলিল, "আচ্ছা।"

৩২

বিভা চলিয়া গেল; কিন্তু শিবানীর মনের ভিতর হইতে তাহার ছবিটি মুছিল না। সুকোমল মুখখানার আর্ত্তি ও কাকুতির সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া ওঠা সরোষ দীপ্তি, আর স্বভাববিনত কথার ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ অকারণ তীব্রতা তাহার মনে একটা দোলা দিয়া গিয়াছে। সারা বিকালবেলা শিবানী ইহা লইয়াই কি যেন ভাবিল।

কল্যাণীর বেণী বাঁধিয়া দিতে দিতে শিবানীর আজ থাকিয়া থাকিয়া মনে আসিতেছে ব্রতীন্দ্রের মুখ, এমন সময় নীচের ঘর হইতে ডাক আসিল।

বেণীর আগায় রেশমীফুলের ঝুঁটিটি ঝুলাইয়া দিয়া সে তাড়াতাড়ি নীচে চলিয়া আসিল।

শঙ্করানন্দ নিমেষ বিলম্ব না করিয়া ত্রস্ত দ্রুতনিঃশ্বাসে বলিল, "আবদুল আজিজ্ ধরা পড়েছে, শুনেছেন?"

"ধরা পড়েচে!!" শিবানী চমকিত হইয়া শঙ্করের দিকে তাকাইয়া রহিল।

"হুঁ, কাল সন্ধ্যেবেলা। একেবারে মালমস্‌লা সমেত!"

"অ্যাঁ।"

শঙ্কর বলিয়া চলিল, "হাজার কপি ইস্তাহার নাকি ছিল তার সঙ্গে। সদ্য প্রেস থেকে নিয়ে আস্‌ছিল যখন, তখুনি পথের মধ্যে ধরা পড়েচে।"

শিবানী নির্ব্বাক্‌মুখে শুনিয়া গেল, কিছু উত্তর করিল না।

"শুধু তাই নয় দেবি! ধরা পড়েছে তো পড়েইছে, কিন্তু সঙ্কট হযেছে আমাদের এই যে, আজিজ্ সব বলে দিচ্ছে!"

"বলে দিচ্ছে!!" শিবানী একান্ত বিস্ময়ে ও অবিশ্বাসে চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "আজিজ্ বলে দিচ্ছে? বলেন কি গোস্বামীজি?"

শঙ্কর বলিল, "প্রমাণ পাচ্ছি বলেই বল্‌ছি। নইলে একথা আমিও বিশ্বাস কর্ত্তে পারি না। শুনুন ব্যাপারটা—ঠিক পরশু-দিন রাতে আমি আজিজ্‌কে দিয়ে কতক জিনিষ সরিয়েছিলাম

শশধরের ওখানে—সেই ভয়ানক তুর্যোগটার সময়। আজিজ্ আর আমি ছাড়া একটা কাক কোকিলেও এর বিন্দুবিসর্গ জানে না। অথচ আজিজ্ কাল সন্ধ্যেয় ধরা পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই আজ ভোরে শশধর স্বুদ্ধু গ্রেপ্তার হয়েছে, সেই সব জিনিষপত্তর সমেত !"

শিবানী বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

শঙ্কর বলিল, "অথচ দেখুন শশধরের বাড়ী সার্চ্চেড্ হওয়া কস্মিন্‌কালেও কেউ কল্পনা করিনি। কারণ গোয়েন্দার বাবারও সাধ্যি নেই শশধরকে ভুলেও সন্দেহ করে !"

শিবানী কতক্ষণ গম্ভীর হইয়া থাকিয়া বলিল, "কিন্তু আজিজ্ প্রাণান্তেও কোনও কথা বলে দিতে পারে, এ আমি বিশ্বাস করি না।"

"আমিও কর্ত্তাম না; কিন্তু এ ব্যাপারের যে আর কোনই যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না, সুতরাং না বিশ্বাস করে করব কি ? ছেলেরা তো কেউ কেউ বল্‌ছে—ও ছোক্‌রা আসলেই স্পাই, মিটমিটে শয়তান !—আমি অবশ্যি অতটা বিশ্বাস করি না, কিন্তু ভয়ে হোক, প্রলোভনে পড়ে হোক্, নির্ব্বুদ্ধিতায় হোক্, বলে যে ও দিচ্ছে, এ একেবারে নির্ঘাত !"

শিবানী নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

শঙ্কর বলিয়া চলিল, "আর আজিজ্ যদি বলেই, তাহলে আমার পরমায়ুও আর বেশীক্ষণ নয়—আজ রাতটাও কাটে কিনা সন্দেহ !"

"আপনি সত্যি আশঙ্কা করেন, আজিজ্ আপনাকে ধরিয়ে দেবে ?"

"অসম্ভব কিছু নয়।"

শিবানী বলিল, "তাহলে আজ রাতেই পালান্ আপনি।"

সমস্ত রাত্রি ধরিয়া শিবানী ভাবিল, কিন্তু বিশ্বাস করিতে পারিল না।—

পরের দিন সকালবেলা বেলা যখন নয়টা, তখন একটি ছেলে আসিয়া খবর জানাইল, "শঙ্করদার বাড়ী সার্চ্চ হয়েছে।"

সত্রাসে শিবানী জিজ্ঞাসা করিল, "আর শঙ্করবাবু?"

"তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না, কাল রাত থেকেই তিনি বাড়ী নেই।"

শিবানী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ছেলেটিকে বিদায় দিল।—কিন্তু আজিজ্? অস্পষ্ট বেদনা ও তিক্ততায় শিবানীর বুক হইতে আর একটা নিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল—আজিজ্?



অন্ধকার কৃষ্ণপক্ষের আকাশে মাথা ঠেকাইয়া লালবাজারের পুলিশ হাজত দাঁড়াইয়া আছে যেন দৈত্যপুরী। বাহিরে কলিকাতার রাজপথের চিরপরিচিত জনস্রোত প্রাচীরের অন্তরালে প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডের মধ্যে সঙ্গীনধারী সারি সারি পুলিশের দল, আলোর বাহুল্য বড় বেশী নাই—অৰ্দ্ধেক আলো অৰ্দ্ধেক কালোয় শবলীকৃত হইয়া এদিকে দুইটা মোটরগাড়ী, ওদিকে সদ্যপ্রবিষ্ট প্রিজন্‌ভ্যান্ আর সৈন্য সামন্তের ছায়ামূর্ত্তিগুলি আরোই বীভৎস

হইয়া উঠিয়াছে। অভ্যন্তরে বন্দীশালার দোতালায় নাতিপ্রশস্ত এক বদ্ধ কক্ষের ওপাশে আজিজ্।

দেয়ালের গায়ে অনেক উচ্চে গাঁথা, পুরু কাচের আবরণে ঘেবা, মিট্‌মিটে একটা ইলেক্‌ট্রীক বাতি জ্বলিতেছে। প্রকাণ্ড দুইটি দরজার একটি আপাদমস্তক লোহার জালে গাঁথা—দিনের বেলাযও চক্ষুকে হাজার নিপীড়ন করিলে কিছু দেখিবার সাধ্য নাই,—আর একটিতে আগাগোড়া পুরু গরাদে বসানো, বাহির হইতে তালাবন্ধ। রাতের বেলা এখান হইতেও সাম্নের রাস্তার বিশেষ কিছু নজরে আসে না, তবু আজিজ্ এইখানেই গরাদেতে মাথা ঠেকাইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া আছে।

সার্জ্জেণ্টের কাম্‌রার পাশেই তাহার ঘরখানা। সাম্নেব বারান্দায় তাহার দরজার ডান পাশে পাতা রহিয়াছে সার্জ্জেণ্টের বসিবার জন্য একখানা কাউচ; উহার হাতলেব কানিশেব উপর বারান্দার উজ্জ্বল বাতিটির রশ্মি পড়িয়া চক্‌চক্ করিতেছে, আজিজ্ অন্যমনে কতক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া থাকে, আবাব কখনও বড়রাস্তার ওধারে সাম্নের বাড়ীগুলির দিকে তাকায়। সেখানে দেখা যায় শুধু অন্ধকারের কুক্ষিভেদ করিযা ছুটিয়া বাহিব হইয়া আসা উদগ্র কতকগুলি আলোর রশ্মি। কাছেই কোন্ বাড়ী হইতে কচি বালিকার গলার গানও কানে আসে। আজিজ্ একবার গরাদে ছাড়িয়া সোজা হইয়া দাঁড়ায়,—একবার নিঃশ্বাস ফেলে।

শিস দিতে দিতে সার্জ্জেণ্টসাহেব সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া ঘরে ঢুকিয়া গেল। সিঁড়ির কোণে রেলিংএর কাছে যে পাহারাওয়ালা

বন্দুক হাতে বসিয়া ছিল, সসম্ভ্রমে সে একবার উঠিয়া দাঁড়াইল। আজিজের চোখের উপর দিয়া ছবিগুলি ভাসিয়া যায় অর্থহীন সমারোহের মত।

বাহিরে চলন্ত জগৎ—সজীব, সাড়ম্বর; ভিতরে সমস্ত প্রাণ প্রবাহ নিস্তরঙ্গ হইয়া থামিয়া আছে। পাগলের মত আজিজের একবার হাসি আসিল।

হাসি নিবিয়া যায় মুহূর্ত্তের মধ্যে। চোখের পলক না ফেলিতে আজিজের মুখের উপর আবার বিষণ্ণতা ঘনাইয়া আসে, বিষাদ কঠোর হইয়া উঠে। বাহিরের দিকে ভয়ঙ্কর চোখে একটা নিরুদ্দেশ কটাক্ষ হানিয়া সে গরাদে হইতে হাত ছাড়িয়া দাঁড়াইল। ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া, দুই বাহু বুকের উপর সন্নদ্ধ করিয়া পাদচারণা আরম্ভ করিল কুটরীর এপ্রান্ত হইতে ওপ্রান্তে।

সেদিন রাত্রি আটটার সময় সাব্ ইন্‌স্‌পেক্‌টার ও পাহারা-পরিবেষ্টিত হইয়া সেই যে সে এখানে আসিয়া ঢুকিল, সেই হইতে এই তিনচারিদিন এই কক্ষের বাহিরে তাহার গতি রুদ্ধ। নিঃসঙ্গ নির্ব্বাক হইয়া প্রতিটি মুহূর্ত্ত তাহার মনে হইতে থাকে যেন এক একটি কল্প। কোনও কিছু করিবার না পাইয়া তাই সে কখনও ঘরের মধ্যে অশান্তভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়, কখনও নিথর পাষাণ হইয়া গরাদের কাছে দাঁড়াইয়া থাকে আর চোখ দুইটা বাঘের মত জ্বলে, আপনমনে কখনও বা গুনগুন করিয়া গান ধরে, নয়তো ধূলি-ধূসরিত মেঝের উপর ছড়ানো মলিন কম্বলে রচিত বিছানায় শুইয়া উদাসচোখে সীলিং এর দিকে চাহিয়া থাকে।

অতি ভোরে আজিজের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। হিন্দুস্থানী পাহারাওলার ভজন গানের গম্ভীর আওয়াজের সুর অন্ধকারের রহস্যে মিশিয়া মিশিয়া তাহার কানে কেমন হইয়া উঠিতেছিল, এমন সময় হুড়ুক করিয়া কিসের শব্দ পাইয়া চোখ চাহিয়া দেখে পুরা একহাত লম্বা একটা বিপুলায়তন ইঁদুর বিছানার পাশ হইতে ছুটিয়া পলাইতেছে। ও বাবা! আজিজ তাড়াতাড়ি পা গুটাইয়া অর্দ্ধেক উঠিয়া বসিল। একটু দূরে শাল পাতার উপরে কাল রাত্রিবেলার যে অর্দ্ধভুক্ত ভাত তরকারীগুলি পড়িয়া ছিল, দেখিল, তাহার একটি কণিকাও অবশিষ্ট নাই, কেবল দুই তিনটি আলুর ছোবড়া মেজের উপরে ছড়ানো। ভজনগানের মাধুর্য্য অকস্মাৎ শুকাইয়া গিয়া আজিজের গা' অব্যক্ত ঘৃণায় শিরশির করিয়া উঠিল।

সকালবেলার রৌদ্র দেখিতে দেখিতে আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। সাম্নের বারান্দায় তাহারই এক ঝিলিক হাসি ছড়াইয়া পড়িল, কিন্তু আজিজের ঘরটি ছুঁইল না—গরাদের ওধার পর্য্যন্ত আসিয়াই থমকিয়া আছে।

বেলা যখন নয়টা রোজকার মতই সেই শালপাতায় ঢাকা এক-রাশি ভাত আর মাটির গ্লাসে ভর্ত্তি ঝোল ও ডাল আসিযা হাজির হইল। একবার দেখিয়া আজিজ মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিল—দেখিলেই অরুচি আসে।

কিন্তু আসিলে কি হইবে? বুভুক্ষা মানুষের প্রাথমিক অনুভূতি, ঠেলিয়া রাখিবার উপায় নাই। কতক্ষণ পরে ধীরে ধীরে চলিয়া

আসিতে হইল ঐ পাতার ধারেই, অবহেলায় পরিবেশিত ঐ অপরূপ আহার্য্যই নিত্যকার মত তাহাকে গিলিতে হইল।

কখন্ বেলা বাড়িয়া গিয়াছে। অসহ্য উত্তাপে বন্ধ ঘরের হাওযায আগুনের জ্বালা ধরিযাছে। আজিজ পাখার অভাবে অনন্যোপায় হইয়া বিছানায় পড়িযা পড়িয়া ধুতির প্রান্তভাগ বুকের উপর চাপড়াইতে লাগিল।

এমন সময় টকাটক্ টকাটক্ গোরাসৈন্যের বুটের শব্দ!

দুই মিনিট পরে অতর্কিতে ঘরের দরজা খুলিয়া গেল, পাহারা-ওয়ালা ঘরে ঢুকিযা বলিল, "সার্জ্জেণ্ট্ আয়া বাবুজী, এস্-বি অফিসমে যানে হোগা আভি।"

বাহিরে বারান্দায় দাঁড়াইয়া চঞ্চলভাবে হাতের কাগজখানা ঘুরাইতে ঘুরাইতে সার্জ্জেণ্ট্ হাঁকিল, "Hurry up, hurry up!"

মুহূর্ত্তে আজিজের বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল। আবার এস-বি অফিস!

কিন্তু দেরী করিবার অধিকার নাই। গোরা পেয়াদাটির মুহুর্মুহুঃ তাড়ায় অতিষ্ঠ হইয়া সে চট্ করিয়া উঠিয়া কোনরূপে গায়ে পাঞ্জাবীটা বসাইয়া গম্ভীরমুখে বাহির হইয়া আসিল।

বাহিরে প্রিজন্-ভ্যান্—নিকষ পাথরের মত কালো কুচ্‌কুচে লোহার গাড়ী, অন্ধকার অন্ধকূপের মত তার বিরাট উদর।

আরও কে একটি বন্দী গাড়ীতে গিয়া উঠিল। আজিজ্ পিছন পিছন ঢুকিয়া চাহিয়া দেখে,—"একি! শশধর যে? তুমিও?"

পিছন হইতে ধমক দিয়া সার্জ্জেণ্ট বলিযা উঠিল, "Don't talk !"

সশস্ত্র পাহারাওয়ালা গাড়ীতে ঢুকিয়া, দুই বন্দীকে দুই পাশে সরাইয়া মাঝখানে চাপিয়া বসিল। সশব্দে দরজা বন্ধ হইয়া বাহিব হইতে তালা পড়িল—খটাং !

ছোট্ট একটি কামরায় টেবিলের চাবিধারে তিন চারিটি ইন্স্পেক্টার ও সাব্ইন্স্পেক্টার আজিজকে ঘিরিয়া বসিয়াছেন।

স্থূলোদর প্রবীণ ভদ্রলোকটি গম্ভীর বচনে বলিলেন, "কি হে, ভেবে চিন্তে ঠিক করলে কি ? বল্‌বে, না বল্‌বে না ?"

আজিজ উত্তর দিল, "বল্‌বাব যা, সে তো বলেছি।"

"ও-বলা নয়। হাতে-হাতে যা ধরা পড়েচে, তা তো আব তোমার বল্‌বার অপেক্ষা করে বসে নেই। আর যা' জান, তাই বল।"

আজিজ্ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

"ঠিক ঠিক জবাব দেবে ?"

"কি জান্তে চান বলুন না ?"

আধ দিস্তাখানেক কাগজ টানিয়া ফাউণ্টেন্ পেনটি খুলিতে খুলিতে ভদ্রলোকটি চশ্‌মার ফাঁকে চোখ উঁচু করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পত্রিকাগুলো ছাপতে তোমায় দিয়েছে কে ?"

"কেউ না।"

ধমক্ দিয়া ইন্স্পেক্টার বাবু বলিয়া উঠিলেন, "কেউ না ? আবার মিছে কথা ?"

আজিজ উত্তর কবিল না।

পাশের বাবুটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "লেখাগুলো কার বল দিকিন্? পেপারটা চালাচ্ছে কে?"

আজিজ্ গম্ভীরভাবে বলিল, "আমি নিজে লিখেছি।"

সাব্-ইন্স্পেক্টার চৌধুরী উপহাস করিয়া বলিলেন, "অতটা বাহাদুরী নিজের ওপরে নিয়ে লাভ কি? সত্যি যা কথা, তাই বল।"

আজিজ্ বলিল, "বিশ্বাস না করলে কি করব?"

ইন্স্পেক্টারবাবু অন্য প্রশ্ন তুলিলেন, "কাগজগুলো নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল কোথায়?"

"আমার মেসে।"

"কি উদ্দেশ্যে?"

"বিলি করব বলে।"

"কার কার সাহায্যে?"

"একা।"

চৌধুরী বলিয়া উঠিলেন, "ওই সেই এক কথা! দ্যাখো আজিজ্, এখানে কচিখোকা কেউ নেই যে বাজে কথায় ভুলিয়ে রেহাই পাবে মনে করেছ। বল্‌তে হয় সত্যি কথা বল, নয়তো—"

ইন্স্পেক্টারবাবু চোখের পলকের ইঙ্গিতে তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া দিয়া গুরুগম্ভীরভাবে নিজের মনেই বলিলেন,—"হুঁ।—" তার পর হঠাৎ চোখ তুলিয়া, "আচ্ছা, শঙ্করানন্দ গোস্বামীকে তুমি চিন্‌লে কি করে?"

আজিজ্ জিজ্ঞাসুভাবে চাহিয়া বলিল, "শঙ্করানন্দ গোস্বামী কে?"

সামনের চেয়ারে হেলিয়া-বসা ব্যানার্জ্জি মহাশয় ব্যঙ্গভরে ভ্রূ টানিয়া বলিয়া উঠিলেন, "চেন না?"

আজিজ্ মাথা নাড়িল।

ইন্‌স্পেক্‌টার বলিলেন, "চেন না? বল কি? নিত্যি তার বাড়ী যাচ্ছ, অথচ তাকে চেন না?"

আজিজ্ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া সবেগে মাথা নাড়িল, "নিত্য আমি তাঁর বাড়ী যাই? বল্‌ছেন কি আপনারা? হতেই পারে না! শঙ্করানন্দ বলে কাউকে আমি চিনিই না!"

"সেদিন সেই ঝড়ের রাতে—তোমার ধরা পড়বার আগের দিন—শঙ্করানন্দের ওখানে যাও নি?"

আজিজ্ নির্ব্বিকার ভঙ্গীতে জবাব করিল, "কি বল্‌ছেন আপনারা, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।"

চৌধুরী ফোড়ন দিলেন, "কাপড়ের বস্তাটা কে দিয়েছিল?"

আজিজ্ বলিল, "কাপড়ের বস্তা কিসের?"

চৌধুরী সোজা হইয়া বসিয়া চোখ পাকাইয়া বলিলেন, "শশধরকে কাপড়ের বস্তা দাওনি তুমি?"

আজিজের বুকের মধ্যে হৃদ্‌পিণ্ডটা একেবারে লাফাইয়া উঠিল, মনে পড়িয়া গেল—ভ্যানের মধ্যে শশধরকে দেখিয়াছে। কোন রকমে মুখের ভাব সাম্‌লাইতে চেষ্টা করিয়া জবাব দিল, "শশধরকেও চিনি না, কাপড়ের বস্তারও খবর জানি না।" মনে মনে তখন

তাহার বিচার চলিতেছে, ওঘরে বসিয়া শশধর না-জানি কী সব বলিয়া ফেলিতেছে !

চৌধুরী শাসাইয়া বলিলেন, "ভালো মানুষ সেজে কোনও ফল হবে না বলে রাখচি। ভালো চাও তো বলে ফেল।"

আজিজ্ উত্তর দিল না।

ইন্‌স্পেক্‌টার আবার প্রশ্ন করিলেন, "শিবানী দেবীকে চেন ?"

আজিজ্ মনে মনে উত্তর ভাবিতে ভাবিতে ভদ্রলোকটির মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল, যেন ঠিক বুঝিতে পারে নাই।

ইন্‌স্পেক্‌টারবাবু পুনরুক্তি করিলেন, "শিবানী দেবী—শিবানী গুপ্তা—।"

আজিজ্ সপ্রতিভভাবে উত্তর দিল, "হ্যাঁ খুব চিনি। তাকে আবার না চেনে কে ?"

"বলি, আলাপ আছে ?"

"হ্যাঁ।"

"হল কি করে ?"

তেমনই সপ্রতিভ ভাবে আজিজ্ বলিল, "আমি একদিন নিজে গিয়ে আলাপ করেছি !"

"কেন ?"

"এমনি। নাম শুন্‌তাম, তাই।"

ইন্‌স্পেক্‌টারবাবু ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন।

চৌধুরী সশ্লেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার তাঁর ওখানে যাওয়া হয় কেন তোমার ?"

আজিজ্ একটিবার ভাবিয়া সোজা উত্তর দিল, "ভালো লাগে।"

টিট্‌কারি সহযোগে মুচ্‌কি হাসিয়া ব্যানার্জ্জি বলিয়া উঠিলেন, "বাঃ—বাঃ, খাসা জবাব।"

আজিজ্ ভ্রূকুঞ্চিত করিল।

ইন্‌স্পেক্‌টার মহাশয় একটু শ্রান্তভাবে চেয়ারের গায়ে হেলিয়া বসিয়া বলিলেন, "ভ্যাখো, বেরিয়ে তো গেছে সবই। অনর্থক ঢাক্‌বার চেষ্টা করে মিছে কথা বাড়িয়ে লাভ কি? তোমাদের শঙ্করদা, তোমাদের শিবানীদি—পুলিশের খাতায় বাকী নেই কারো কোনও খবর। তবু যদি তুমি নিজে থেকে স্বীকার কর এবং যা' যা' জান সব বল, তাহলে তোমাকে ছেড়ে দেব। এমন কি, বে-আইনী পত্রিকাগুলো যা তোমার সঙ্গে পাওয়া গেছে, তা নিয়েও কেস্ না আন্‌তে পারি। বুঝলে?"

আজিজ্ চুপ করিয়া রহিল।

ইন্‌স্পেক্‌টার আবার বলিলেন, "তোমরা ছেলেমানুষ, তাই বুঝচ না। কিন্তু এ তো ছেলেখেলার জিনিষ নয়। জেলে আট্‌কে থেকে জীবনটা নষ্ট করাতে তো লাভ নেই কিছু? বাড়ীতে তোমার মা রয়েছেন, ছোট ছোট দুটি ভাই বোন্ রয়েছে, তাদের ওপর একটা দায়িত্ব তো আছে তোমার! তোমার এখন পাঁচ সাত বছর জেল হয়ে গেলে মা যে কেঁদে কেঁদেই মারা যাবেন, সে কথাটাও মনে আসে না একবার? সব ভাবনাই তো ভালো করে ভাবতে হয়!" মনের দরদে ইন্‌স্পেক্‌টার বাবুর কথাগুলি একেবারে আর্দ্র হইয়া আসিল যেন।

ব্যানার্জি বন্ধুভাবে উপদেশ দিলেন, "শোনো আজিজ্, আমি একটা ভালো কথা বলি। যা করেছ তো করেইছ, কিন্তু এখন যদি মনটা সাফ করে সব বলে ফেল, তাহলে তোমার একটা ভালো রকমের চাকরীও জুটে যেতে পারে আমাদের মধ্যে। ভেবে ছাখো।"

চাকরীর লোভ দেখাইতেই আজিজের মনটা একেবারে বিরূপ হইয়া উঠিল। সে বলিয়া উঠিল, "দেখুন, বল্‌বার যদি কিছু থাকৃতই তাহলে এমনিই বলে দিতাম। চাকরীর লোভ দেখাবার দরকার ছিল না।"

ইন্‌স্পেক্‌টারবাবু হাল ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "হিন্দু ছোক্‌রাগুলোর সঙ্গে মিশে মিশে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে!"

ব্যানার্জি চৌধুরী মহাশয়ের দিকে চাহিয়া মন্তব্য করিলেন, "সত্যি কিন্তু চৌধুরী, মুসলমানের মধ্যে এমন পাগলামি তো কেউ বড় দেখে না।—তোমার কি বুদ্ধিশুদ্ধি সব গেছে, আজিজ্? এই সব কেলেঙ্কারী করে জাতের নাম কালি করছ?"

আজিজ্ সদর্পে উদ্ধত ভাবে জবাব দিল, "মুসলমান জাত কুকুরের জাত নয়!"

চৌধুরী এবার চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া কট্‌মট্ করিয়া তাকাইয়া বলিলেন, "রোসো, মুসলমানের সিংহগিরি দেখাচ্ছি! সোজা কথায় পোষ মান্‌বে না বুঝেছি!" ইন্‌স্পেক্‌টার বাবুর দিকে তাকাইয়া তিনি একবার ইঙ্গিতের অপেক্ষা করিলেন।

ব্যানার্জি বলিলেন, "শক্ত ইস্ক্রুপের প্যাঁচ্, বাবা!"

ইন্‌স্পেক্‌টার বলিলেন, "ঐ ঘরে নিয়ে গিয়ে একবার দেখুন, চৌধুরী মশাই, চেষ্টা করে। মিঞার মাথায় ভূত ঢুকেচে।"

"ভূত তাড়াবার ওষুধ আমি জানি।" বলিয়া সাব্-ইন্‌স্পেক্‌টারবাবু ভীমগর্জ্জনে হাঁকিলেন, "নেহালসিং!"

বাহির হইতে উত্তর আসিল, "জী!"

"ইধার আও—জল্‌দি!" চৌধুরী মহাশয় এক ধমকে আজিজ্‌কে চেয়ার হইতে উঠাইয়া লইয়া কক্ষান্তরে গিয়া ঢুকিলেন।

আজিজ্ বুঝিতে পারিল, ব্যাপার সঙ্গীন। কিন্তু এতক্ষণ আতঙ্ক ও উদ্বেগের শ্রমে ও রৌদ্রের অসম্ভব উত্তাপে পিপাসায় তাহার তালু শুকাইয়া আসিতেছিল; জেবায় জেবায় আপাদ-মস্তক ঘামিয়া উঠিয়াছে। চাদর দিয়া মুখটা মুছিয়া লইতে লইতে সে বলিল, "একটু জল!"

চৌধুরী বাবু মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "জল! আগে গায়ের রক্ত তোমার জল করে ছাড়ি, তার পর!—নেহাল সিং!"

সিপাহী ততক্ষণে দরজার গোড়ায় আসিযা দাঁড়াইয়াছে। সে লাঠি কাঁধে করিয়া অগ্রসর হইযা আসিল।

"চাদ্দর উতার লেকে বাঁধো শয়তানকো।" ক্ষুদে ক্ষুদে চক্ষু দুইটা রাঙ্গাইযা আগুনের ভাঁটার মত করিযা চৌধুরী আজিজের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "এখনও বল্‌বে কি না বল।"

আজিজ সভয়ে একটি নিমেষ চৌধুরীর হিংস্র মুখের দিকে চাহিযা থাকিয়া অকস্মাৎ বাঘের মত দৃপ্তভাবে বলিল, "না!"

৩৪

সাহনগরের পুরাণো দোতালা বাড়ীটার চূণখসা গায়ে মেঘলা সূর্য্যাস্তের রশ্মি আসিয়া পড়িয়াছে। পিছন দিকের ঘরখানার অর্দ্ধেক-খোলা জানালার কিছু দূরে শঙ্করানন্দ আর দুইটি বয়স্ক পুরুষ। উড়োজাহাজ হইতে আকাশপথে তাকাইলে শঙ্করের দীর্ঘ ঋজু দেহখানা পরিষ্কার দেখা যায়। আরও একটু দক্ষিণে সরিয়া দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়—জানালার কবাটের পাশে শিবানীর ছায়া-ঢাকা মুখ।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, "কতদূর আশাপ্রদ দেখলেন ?"

খর্ব্বকায় প্রবীণ ব্যক্তিটি বলিল "ওদের অর্গ্যানিজেশন আশাতীত রকম অগ্রসর। রেঙ্গুনে যা দেখে এলাম, সে আমাদের মতই, কিন্তু নর্থের ইনটিরিয়ারে এমন চমৎকার সংঘ গড়ে তুলেছে, যা আপনারা ধারণা কর্ত্তে পারবেন না! সমস্ত রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হয়ে গেছে—"

দ্বিতীয় ব্যক্তি সংশয়ভরে জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি ?"

"আশ্চর্য্যরকম সত্যি। আমি ওদের কাছে প্রস্তাব তুলতে গিয়ে মনে মনে নিজেই সঙ্কুচিত হ'যে এসেছি, এত বেশী প্রস্তুত তারা। আমার প্রস্তাবকে তারা অত্যন্ত আগ্রহভরে লুফে নিলে। আমাকেই মনে মনে ইতস্ততঃ কর্ত্তে হল, কারণ আমরা ঠিক এই

মুহূর্ত্তে তেমন প্রস্তুত আছি কিনা আমি সঠিক বুঝতে পারি নি। আপনাদের থেকে আজ শুন্‌ব।"

শঙ্করানন্দ ক্ষণেক ভাবিয়া পাশের ভদ্রলোকটির দিকে তাকাইল, "কি বলেন, নিয়োগী?"

নিযোগীর মুখে ততটা দীপ্তি দেখা গেল না। চোখেব চশমাটা একটু ঠিক করিযা গম্ভীরমুখে সে বলিল, "দু'তিন মাস? এপ্রিল মাসের প্রতিঘাত সামলাতে যেরকম বেগ পেতে হচ্ছে বর্ত্তমানে, তাতে সে দুতিন মাসের মধ্যেই আবার শক্তি সঞ্চয় কর্ত্তে পারবে কিনা, আমার সন্দেহ। আপনিই তো জানেন সব, শঙ্করবাবু আপনার কি মনে হয়?"

শঙ্কর নতমুখে গম্ভীর হইয়া ভাবিল, সঙ্গে সঙ্গে একবাব শিবানীর মুখের দিকে তাকাইল।

প্রথম বক্তা বলিল, "পাববে না? বলেন কি?"

নিযোগী বলিল, "আপনি সদ্য বর্ম্মা থেকে ফিবেচেন, কাজে কাজেই এখানকার বর্ত্তমান অবস্থা এখনও ঠিক টের পান নি। আমরা শক্তি কিছুমাত্র হারিয়েচি। সেই জন্যেই বল্‌ছি।"

"সে আপনারা বুঝুন। আমাব মনে হয় তৈরী হতে পাবলে ভালো হত।"

শিবানী কথা বলিল, "আমরা পারব না, এমন কথা অবশ্য বলা যায় না, আলি সাহেব। তবে, পাঞ্জাব আর ইউ-পির খবরের প্রতীক্ষায আছি।"

"তাদের ওদিকে আমাদের লোক গেছে কি?"

"হুঁ, ব্রতীবাবু নিজেই গেছেন। এবং তাঁর কাছ থেকে খবর আশা করছি প্রতিমুহূর্ত্তে।"

আলি বলিল, "তাহলে অপেক্ষা করাই উচিত। কিন্তু বাংলাদেশ সম্বন্ধে আপনারা যেরকম নির্ভরসার কথা বল্‌চেন, ওটা আমার ভালো লাগচে না।"

শঙ্কর দীপ্তচোখে বলিল, "নির্ভরসার কথা কিছুই নয়।"

বন্ধ দরজার গায়ে টক্‌ টক্‌ করিয়া তিনটা শব্দ আসিল। কান খাড়া করিযা নিয়োগী একবার শুনিল, তারপর আগাইয়া গিয়া দুয়ার খুলিয়া দিতেই একটি কিশোর ছেলে কানের কাছে মৃদু কণ্ঠে কি যেন বলিয়া উত্তরের অপেক্ষায দাঁড়াইয়া রহিল। নিয়োগী বলিল, "আচ্চা, নিযে এসো।"

আলি ও শঙ্কর উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ?"

"দেখচি।"

মিনিট পাঁচেক পরে দরজার কাছে যে ছেলেটি আসিযা দাঁড়াইল, তাহাকে চিনিল সবাই। নিয়োগী জিজ্ঞাসা করিল, "কি সংবাদ ?"

সে একপা দরজার এপাশে বাড়াইয়া সকলের মুখের দিকে এক পলকে চাহিয়া রুদ্ধনিঃশ্বাসে উত্তর করিল, "ব্রতীদা এসেছেন !"

অপ্রত্যাশিত সংবাদে চমকিত হইয়া একযোগে সবাই উচ্চারণ করিল, "এসেছেন !! নিজে !"

"নিজেই এসেছেন। কিন্তু ভয়ানক আহত।"

শিবানী চমকিয়া ঘাড় ফিরাইয়া বিস্ফারিত চোখে জিজ্ঞাসা করিল, "আহত ? কোথায় ? কি করে ?"

ছেলেটি ততক্ষণে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া টেবিলের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বলিল, "ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে।—পুলিশের চোখ এড়াতে পারেন নি, অত ছদ্মবেশেও পুলিশ তাঁকে চিনে ফেলেছে।"

ব্রতীন্দ্রের সমুন্নত অসাধারণ অবয়বখানা শিবানীর চোখের সাম্নে ভাসিল। হাজার মানুষের মধ্য হইতেও তাহাকে চিনিযা বাহির করা দুঃসাধ্য কাহারোই নয়; গোপন করাই কঠিন।

"—যাক্, ভগবানের আশীর্ব্বাদে দু'চারটে গুলি ছোড়াছুড়ির পরেই তিনি পুলিশের হাত ছাড়িয়ে পালিয়েছেন। কিন্তু গুলীর আঘাতটা লেগেছে বড্ড গুরুতর!"

"কোথায তিনি?"

"আপাততঃ আছেন আমাদের কাছে। কিন্তু আপনাবা ভালো ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করুন।"

শঙ্কর উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তাব পেয়েছ?"

"হ্যাঁ, ডাক্তার সেই থেকে সঙ্গে আছেন।"

শিবানী প্রশ্ন করিল, "অবস্থা কি বকম দেখ্‌চ? সাংঘাতিক?"

ছেলেটি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "তা হযতো নাও হতে পারে। ডাক্তার তো এখন পর্য্যন্ত নিরাশা দিচ্ছেন না।"

"জ্ঞান আছে?"

"মাঝখানে খানিকক্ষণ ছিল না, এখন আছে।"

সমস্ত মুখগুলি গম্ভীর হইযা উঠিল। শঙ্কর টেবিলে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া ডান হাতের পাঞ্জাবীর আস্তিনটা কনুই অবধি গুটাইয়া

সোজা হইয়া বলিল, "হুঁ।—আচ্ছা, তুমি এখন যাও। তাঁকে গিয়ে বল, আমরা এক্ষুণি সব বন্দোবস্ত করছি।"

ছেলেটি চলিয়া গেলে আবার দ্বার বন্ধ করিয়া নিয়োগী ফিরিযা আসিল। ঘরের হাওয়া মুহূর্ত্তে বদ্‌লাইয়া গিয়াছে, গবেষণানিরত উৎসাহোজ্জ্বল ললাটগুলিতে উৎকণ্ঠার কালি ঘনাইয়া আসিয়াছে,—বিশেষতঃ দেবীর।

নিযোগী বলিল, "আজকের মত আলোচনা স্থগিত থাক তাহলে ?"

শঙ্করানন্দ মত প্রকাশ করিল, "না, তার দরকার নেই। শেষ করে ফেলুন।"

নিযোগী ধীরে ধীরে বলিল, "ব্রতীবাবুর এই আকস্মিক বিপৎপাতে আমার মনটা যেন দমে যাচ্ছে,—মনে হয়, হয়তো এ একটা ভাবী ব্যর্থতার ইঙ্গিত।"

আগ্নেয়গিরির অগোচর গর্ভে যে আগুন ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা একেবারে সহস্রফণায লক্ লক করিযা বাহির হইয়া আসিল যেন। অস্তসূর্য্যের শেষ ছটায় শিবানীর গালের ও তুলের একাংশ জ্বল জ্বল করিতেছিল, এবার সমস্ত মুখের উপর দিয়া আগুন খেলিয়া গেল। বিদ্যুৎ ঠিক্‌রানো চোখের ভয়ঙ্কর দাহ লইয়া সে উত্তর করিল, "ব্যর্থতা নয় নিগোগী! নিরাশায় মন যাদের দমে যায়, তাদের পথ দেখিয়ে দেবার জন্যে এ বিধাতার চাবুক!"

ঘরের বাতাস উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। শঙ্করের পাৎলা ঠোঁট্ দুখানি পরস্পর সম্বন্ধ হইয়া ক্ষুরধার চোখের দৃষ্টিতে জাগিল শাণিত ঝিলিক্।

নারীর প্রাণের তলে যে অলক্ষ্য মধু তাহার হাতের স্পর্শে সকল কাজের মধ্যে তাহাই সুষমায় ফুটিয়া উঠে। তাই স্যাঁৎস্যেঁতে অন্ধকার বাড়ীখানির অভ্যন্তরে বিভার পা পড়িতেই কয়েকঘণ্টার মধ্যেই তাহার রূপ ফিরিল। মেঝেতে বালি ও ধূলারপুঞ্জ, ছেঁড়া কাগজের টুক্‌রা মরা আরশুলার খোসা নিরুপদ্রবে এতদিন বাসা ছিল; দেয়ালের প্রত্যেকটি কোণে এবং ছাদের কড়িকাঠগুলির একটা হইতে আর একটা পর্য্যন্ত সেতু বাঁধিয়া ক্ষুদে মাকড়সাগুলি জাল বুনিযা স্বচ্ছন্দে ঝুলিতেছিল, ঘরে হাওয়ার চলাচল বড় একটা না থাকিলেও ধোঁয়ার গতি বন্ধ হয় নাই এবং মাকড়সার জালের সঙ্গে সেই ধোঁয়ার রাশি বহুদিন হইতে মিশিযা মিশিয়া ঝুলের মিহি পর্দ্দায চারিদিক ছাওয়া। বিভা আসিয়াই নির্ম্মম ঝাঁটার ঘায়ে সমস্ত ছিঁড়িয়া ঝাড়িয়া একেবারে ত্রিসীমানার বাহির করিয়া দিয়াছে। শিল্পীর রুচি প্রাচুর্য্যে ঘরগুলির অবস্থান ও জানালার পরিসর এমনই চমৎকার যে বিকাল না হইতেই মনে হয় যেন সাযাহ্নের ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে। ইহার উপর প্রতিবিধান করিবার সাধ্য বিভার কিছুই রহিল না, শুধু গৃহবাসীর অমনোযোগে জানালাগুলির যে অপব্যবহার ঘটিয়া আসিতেছিল, তাহার সংস্কারার্থে কবাটগুলি সম্পূর্ণ মেলিযা দিয়া এতটুকু পরিমাণ খোলা হাওয়ার পথ করিয়া দিল যাহাতে মানুষ নিঃশ্বাস ফেলিয়া দুদণ্ড ঘরের মধ্যে দাঁড়াইতে পারে।

দরজার পাশে একটা জলের কুঁজা, গেলাস উবুড় করিয়া তাহার মুখ ঢাকা। নীচে এলুমিনিয়ামের রেকাবীতে ঔষধের কয়েকটা শিশি ও কাঁচের মেজার গ্লাস। একটা গুটানো মাদুর দেয়ালের কোণায় খাড়া করিয়া রাখা হইয়াছে—কেহ আসিলে বসিতে দেওয়ার ঐ একমাত্র আস্‌বাব। একধারে মেঝেতে মাদুর ও খানকতক কম্বলের উপর তোষক পাতিয়া সযত্নে তৈরী বিছানায় ব্রতীন্দ্র শুইয়া ঘুমাইতেছে,—অথবা তন্দ্রায় আচ্ছন্ন। চুলগুলি একটু একটু ভিজা, তাহার মলিন রুক্ষতা জলের চিক্কণ স্পর্শে কতকটা যেন তাজা দেখাইতেছে। সেই ভিজা চুলগুলির মধ্যে আঙ্গুল ঢুকাইয়া বিভা মাথার কাছে চুপটি করিয়া বসিয়া পাখার হাওয়া করিতেছে।

ব্রতীর মুদিত চোখের পাতার দিকে অপলকে চাহিয়া বিভা কত কথাই ভাবে, শেষ নাই। সেই ব্রতীদা আজ এতদিন পরে ফিরিয়াছে, ফিরিয়া স্মরণ করিয়াছে আজ তাহাকেই, একবার একেবারে তাহারই কাছে! কিন্তু এহেন দশা! অজ্ঞাত ভয়ে সে বারবার কপালে হাত ছোঁয়াইল। চক্ষু বুঁজিয়া মনে মনে আওড়াইল, 'দয়াময়!'

ঘুমের আবেশে ব্রতী অস্ফুট একটা শব্দ করিযা ডান হাতখানা এলাইয়া দিল, হাতের আঙ্গুলগুলি মাদুরের প্রান্ত ছাড়াইয়া মাটিতে গিয়া ঠেকিল। বিভা সন্তর্পণে ঝুঁকিয়া একান্ত মৃদুস্পর্শে হাতখানা তুলিয়া লইয়া বিছানার উপরে আবার শোয়াইয়া দিল।

ঘরের মধ্যে কোনও সাড়াশব্দ নাই, পাশের ঘরে এক আধবার মানুষের যাতায়াতের সতর্কধ্বনি কানে আসে। নিঃস্পন্দভাবে

বসিয়া থাকিতে থাকিতে পাখার অশ্রান্ত মন্থর তালে তালে বিভার চোখ এক একবার ঢুলিয়া আসিতে লাগিল। মধ্যাহ্নের নিস্তেজ নীরবতায় আরও তন্দ্রা আনিয়া দেয়।

অনেকক্ষণ কাটিয়া যায়। ব্রতীন্দ্র কখন চক্ষু মেলিয়া চাহিল, বিভা দেখিতে পায নাই। মুহূর্ত্তেব জন্য তাহার চোখ দুইটি নিজের অগোচরে মুদিয়া আসিয়াছে। হাটুর উপরে ঝুঁকিয়া-পড়া মাথাব একরাশি কালো এলোচুল আসিয়া ব্রতীর চুলের সঙ্গে মিশিযাছে।

ব্রতীন্দ্র মৃদুকণ্ঠে কথা বলিল,"তুমি ঘুমোও গে' বিভা।"

ধড়ফড় কবিযা মাথাটা তুলিয়া চোখ মেলিযা বিভা বলিল, "উঁ? উঁহুঁ, ঘুমুচ্ছি না আমি। কি, বল?"

"না, বলছি না কিছু। তুমি ওঘরে গিযে শুয়ে বিশ্রাম কব একটু, ঘুমোও।"

বিভা বলিল, "ঘুম পাযনি আমাব।"

ব্রতীন্দ্র মাথা পিছনে হেলাইয়া বিভার শ্রান্ত চোখ দুইটীর দিকে চাহিয়া ধীরে বলিল, "কাল তুমি সারারাত জেগেছ!"

"কে বল্লে?"

গতরাত্রে দেহের অস্থিবতায় ব্রতীর মোটেই ঘুম হয নাই, মস্তিষ্কের আচ্ছন্নতাহেতু মাঝে মাঝে তন্দ্রাগতেব মত পড়িয়া ছিল শুধু। যখনই সে-ঘোর কাটিযা গিযা চেতনা আসিযাছে, তখনই নিমীলিত চোখেই অনুভব করিযাছে কাহার যেন অতন্দ্রিত অভিনিবেশ, আর কানে আসিয়াছে বারে বারে শাড়ীর আঁচলের খস্ খস ও চুড়ির মৃদু রিনিঝিনি। ব্রতীন্দ্র নিস্তেজ সকরুণ চোখে

বিভাকে দেখিতে লাগিল। খানিক থামিয়া আবার বলিল, "আমি এখন ভালোই আছি, বিভা। তুমি যাও, শোও গে'। এত পরিশ্রম তোমার সইবে কেন?"

বিভা আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিল, "ভালো বোধ করচ একটু?"

"হুঁ।"

দেয়ালের গায়ে পেরেকের সঙ্গে সুতা দিয়া ঝুলানো ছোট পকেট ঘড়িটার দিকে তাকাইয়া বিভা দেখিল, ঔষধ খাওয়াইবার সময় হইয়াছে। পাখাটা মেঝের উপর রাখিয়া তাড়াতাড়ি দরজার পাশে উঠিয়া গিয়া শিশি ঝাঁকাইল, গ্লাসে ঢালিল; সঙ্গে সঙ্গে কুঁজা হইতে জল গড়াইয়া নিজের তন্দ্রালস চক্ষু দুইটায় ঝাপ্টা দিয়া আবার ফিরিয়া আসিল ব্রতীর শিয়রের কাছে।

বিভার গ্লাস-ধরা হাতখানা ডানহাতে ধরিয়া লইয়া ব্রতী ঢক্ করিয়া ওষুধ গিলিয়া ফেলিল। একটুখানি হাসিয়া বলিল, "যমের সঙ্গে লড়াই ক'রে পারবে বলে আশা হচ্ছে?"

বিভা দুরুদুরু বুকে ভৎর্সনা করিয়া বলিল, "ও রকম বল্‌বে না, ব্রতীদা!" মনে মনে ছেলেবেলাকার সাবিত্রী সত্যবানের মর্ম্মান্তিক ছবিখানি স্পষ্ট ভাসিয়া উঠিল; অদৃশ্য বিধাতাপুরুষকে যুগপৎ শাসাইয়া ও মিনতি করিয়া মনে মনে মনে বলিল, "পারব, নিশ্চয় পারব!"

ব্রতীন্দ্র শান্ত হইয়া আবার একটু চক্ষু বুঁজিল। আশ্বিনের নির্ম্মেঘ আকাশের নীলনয়ন যেখানে জানালার ফাঁক দিয়া কৌতূহলে চাহিয়া রহিয়াছে এই যুগল ছবির পানে, বিভা উদাস-

চোখে সেইদিকে তাকাইয়া তাকাইয়া নিঃশ্বাস ফেলিল। একটু একটু করিয়া অপরাহ্ণ নামিয়া আসে, আর বিভা সশঙ্ক হইয়া ভাবে—কাল সন্ধ্যাবেলা ব্রতীদার কাঁধের ব্যথাটা কি ভয়ানক বাড়িয়াছিল, একটু একটু করিয়া সজাগ জ্ঞান অস্থিরতার মধ্য দিয়া কেমন করিয়া আচ্ছন্ন হইয়া গেল! আজ সন্ধ্যাবেলাটা ভালয় ভালয় কাটিলে হয়!—ভাবে, আর অমনি হাতখানা অজ্ঞাতেই ব্রতীর মাথায় আসিয়া সন্তর্পণে লাগে, আদরে, স্নেহে ক্রমাগত কোমল স্পর্শ কপালটায় বুলাইয়া দিতে থাকে।

ব্রতী আবার চোখ মেলিল, "একটা কাজ কর্ত্তে পাব, বিভা ?"

"বল !"

ব্রতীন্দ্র একবার ঢোঁক গিলিয়া আস্তে বলিল, "তোমাদেব শিবানীদিকে খবর দেবে একবার ?"

বিভার বুকটা ধক্ করিয়া উঠিল। পাংশুমুখে বলিল, "কেন ?"

"দরকার।"

বিভা চুপ কবিয়া বহিল।

মুখের দিকে তাকাইয়া ব্রতী শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "পারবে যেতে ?"

বিভার সমস্ত অনুভূতি বিরস হইযা উঠিল। বোগশয্যায় শায়িত বিপন্ন ব্রতীদাব অসহায় অনুবোধ, অথচ হৃদয়ের তারে তাবে শিবানীর নামের প্রতিধ্বনি বিকট বেসুবা বাজিয়া উঠিয়াছে! সে শঙ্কিত অশান্ত হইয়া বলিয়া ফেলিল, "শিবানীদি তো আমাদের স্কুলে আর নেই এখন !"

ব্রতীন্দ্র একবার থামিল, তারপর বলিল, "তাঁর বাড়ী চেননা তুমি ?"

বিভা একটু থামিয়া অতিকষ্টে বলিল, "চিনি।"

"তাহলে যাও।"

বিভা তেমনই বসিয়া রহিল, নড়িলও না, উত্তরও দিল না।

প্রতীক্ষমাণ ব্রতীর মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা তাহার দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। এই দুইদিন ধরিয়া ব্রতীর দেহের সকল যন্ত্রণা নিজের দেহে অনুভব করিয়াও সে বিচলিত হয় নাই, শিয়রে দাঁড়ানো যমদূতের ভয়াল মূর্ত্তির কল্পনাতেও তাহাকে অধীর করিতে পারে নাই, মনে মনে তাহার সগর্ব্ব বিশ্বাস—ব্রতীর জন্য সে সব সহিতে পারে। কিন্তু এবার ভয়ানক আলোড়ন সুরু হইল। ব্রতীর কপালে ছোঁওয়ানো কোমল হাতখানা নির্জীব কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। আস্তে আস্তে সেখানা সরাইয়া আনিয়া সে একবার চক্ষু বুঁজিয়া প্রাণপণে একটা নিঃশ্বাস চাপিয়া ফেলিল। প্রবল প্রয়াসের ফলে মুদিত পল্লবের আড়ালে চোখের সূক্ষ্ম শিরাগুলি যে লাল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা ব্রতীন্দ্র দেখিতে পাইল না, কিন্তু দেখিল ঠোঁট দুখানি ভয়ানক শক্তভাবে পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়াও ভিতরকার আবেগে ফুলিয়া উঠিতেছে। অনেকক্ষণ পরে বিভা শান্তকণ্ঠে উত্তর করিল, "তুমি ভালো হয়ে ওঠ, তারপরে।"

ব্রতীন্দ্র কতক্ষণ কথা বলিল না; তারপরে কেমন একপ্রকার চোখে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "আমার আজই তাঁকে চাই। ভালো হয়ে নাও তো উঠ্‌তে পারি ?"

আজই চাই! শিবানীদিকে না হইলে আজ ব্রতীদার চলিবেই না? ব্রতীর যাতনা লাঘব করিতে তাহার চেয়ে শিবানীদির যত্ন কি বেশী নিপুণ! দুঃসহ ব্যথায় বিভার আকণ্ঠ বাষ্পে ভরিয়া আসিল। তাহার আর্ত্ত মুখখানার দিকে চাহিয়া ব্রতীন্দ্রের মনটা কেমন ব্যথিত হইয়া উঠিল। তথাপি মুখ ফুটিয়া সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "যাবে, বিভা?"

ঝর ঝর করিয়া বিভার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। সকল লজ্জা, সকল অভিমান ভুলিয়া গিয়া হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া সে অদম্য বেগে ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া ফোঁপাইয়া উঠিল।

ব্রতী চমকিয়া মাথা ফিরাইয়া বলিয়া উঠিল, "কাঁদ্‌চ? ওকি! কেন?" ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা আহত শরীর ফিরাইবার বা নড়াইবার সাধ্য নাই, বিভার মুখখানা ব্রতী দেখিতে পাইল না; শুধু মাথার ধাক্কায় বালিশটা যথাসম্ভব পিছনে ঠেলিয়া দিয়া ঘাড় ফিরাইতে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পাইল, তাহার কালো চুলে ঢাকা কাঁধের পাশটা মুহুর্মুহুঃ সবেগে নড়িয়া উঠিতেছে।

ব্রতীন্দ্র নিজের মনে কপালটা একবার একটুখানি কুঞ্চিত করিয়াই আবার প্রশান্তি ফিরাইয়া আনিল। গম্ভীর ভাবে বলিল, "যেও না, থাক্।"

বিভা কম্পিত ঠোঁট দু'খানিকে দাঁত দিয়া সবলে কামড়াইয়া শায়েস্তা করিতে গিয়া ভিতরের বাষ্পোচ্ছ্বাসকে আরো ফেনাইয়া তুলিল। অসংযত, রোরুদ্যমান, কম্পিত স্বরে বলিল, "যাব।— বল তাঁকে কি বল্‌তে হবে আমার!"

"কিছু বল্‌তে হবে না। যেও না তুমি!" বলিয়া ব্রতীন্দ্র প্রকাণ্ড একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া চক্ষু বুঁজিল।

বিভার ভিতরকার ফেনিল জলোচ্ছ্বাস বাড়বানলের স্পর্শে যেন হঠাৎ শুকাইয়া আসিল।

মুক্ত ডান হাতখানার সাহায্যে হাৎড়াইয়া ব্রতী পাখা খুঁজিয়া পাইল না; জানিল, বিভার হাতের কাছে। উত্তাপে কি উত্তেজনায় তাহার শরীর আচম্‌কা কেমন যেন ছট্‌ফট্‌ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু সে বিভাকে ডাকিল না। নিজের বলে পাশ ফিরিতে চেষ্টা করিয়া হঠাৎ আহত কাঁদের মধ্যে টন্‌টন্‌ করিয়া উঠিল; অস্ফুট আর্ত্তধ্বনি বাহির হইয়া আসিল—"উঃ!"

ঝন্‌ কবিয়া বিভার কানে বাজিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে চোখের জল মুছিয়া ফেলিযা সে বলিতে গেল, "কি হল?" কিন্তু কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। লাল চোখ দুইটি মেলিয়া সে কেবল চাহিয়া দেখিল, ব্যাণ্ডেজটা ভিতর হইতে লালে ছুপিয়া উঠিতেছে। সভয়ে ব্রতীব কাঁধের উপব হাত দিয়া মৃদুস্পর্শে কাপড়টা ছুঁইয়া দেখিল,—না, থামিয়া গিয়াছে। আরক্ত মুখে চোখে, স্ফুবিত অধবে সে এতক্ষণে বলিল, "নিজে নিজে ফিরতে গেল কেন?"

"এম্‌নি।—উঃ, পাখা, বিভা পাখাটা!"

ঘরের দরজাটা আস্তে ফাঁক হইয়া গেল। সুপ্রসন্ন দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ইঙ্গিতে শিবানীকে ঘরের মধ্যে আগাইয়া দিল।

বিভা পায়ের শব্দে মাথা তুলিয়া সবিস্ময়ে, সভয়ে দেখিল—শিবানীদি!

বিভার হাওয়ার সুখস্পর্শে ব্রতীন্দ্র ততক্ষণে আবার সুস্থ হইয়া নিমীলিতচোখে কপালে হাত রাখিয়া অবসন্নভাবে শুইয়া আছে। বিভার সজল রক্তিম নয়নকোণের ছবি মাথার মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া দোলা দেয়, আর সঙ্গে সঙ্গে তাহার অবিশ্রাম নিঃশব্দ পরিচর্য্যার অমৃতময় অনুভূতি গায়ে লাগে। ব্রতী নির্ব্বাক্, নিঃস্পন্দভাবে শুইয়া শুইয়া ভাবিতেছে। কী ভাবিতেছে, বাহির হইতে বুঝিবার উপায় নাই। শিবানী সন্তর্পণে পা টিপিয়া বিছানার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। অত্যন্ত মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছেন এখন, বিভা?"

ব্রতীন্দ্র চকিতে চক্ষু মেলিল। চোখের সামনে হইতে হাতখানা সরাইয়া ফেলিয়া উপরের পানে তাকাইতেই দেখিতে দেখিতে তাহার স্তিমিত চোখের আলো সজীব হইয়া উঠিল। অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের সঙ্গে একটুখানি হাসিয়া বলিল, "আপনি! এসেছেন?"

শিবানী পায়ের চটিজুতা খুলিয়া, বসিবার উদ্দেশে নত হইল। বিভা গম্ভীরমুখে বলিল, "দাঁড়ান্, মাদুর নিয়ে আস্‌ছি।"

"থাক, দরকার নেই।" ব্রতীন্দ্রের বিস্তৃত শয্যার একটি প্রান্ত অধিকার করিয়া শিবানী মাথাব কাছে বসিয়া পড়িল। "কি রকম বোধ করচেন, ব্রতীবাবু?"

ব্রতীন্দ্র গায়ের আবরণটা তাড়াতাড়ি টানিয়া বুকের কাছাকাছি তুলিয়া দিতে দিতে বলিল, "ভালোই একটু।—এপাশে সরে এসে বসুন না, দেখ্‌তে পাচ্ছি না আপনাকে।"

মিষ্ট একটু হাসিয়া শিবানী মাথার কাছ হইতে সরিয়া বুকের পাশে আসিয়া বসিল। ব্রতী তাহার মুখের উপর চোখ মেলিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "যাক, আপনি এসেছেন! ভাবছিলাম, দেখা হয়তো আর হবে না।"

বিভা নিজেকে আর সংবরণ করিয়া রাখিতে পারিল না, আস্তে পাখাটা নামাইয়া ঘরের বিপরীত কোণের জানালাটার কাছে দ্রুতপদে চলিয়া আসিল। বারেক ইচ্ছা করিল, ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়, কিন্তু পারিল না। কোণ হইতে একবার শিবানীর দিকে, আরবার ব্রতীর দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া পিছন ফিরিয়া জানালার উপর কনুইয়ে ভর রাখিয়া দুইহাতে মাথা গুঁজিয়া রহিল।

শিবানী ব্রতীকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "না, না, ভয় কি? ডাক্তারের সঙ্গে এক্ষুণি তো আমি কথা বলে এলাম। ভয় পাবার কিছু নেই!"

ব্রতী একটু হাসিয়া বলিল, "আমি ভয় পাচ্ছি, ভাবচেন? তা নয়। কিন্তু অনেক কথা আপনাদের কাছে বলবার জন্যে এসেছিলাম, মাঝ পথে এই বিভ্রাট্‌টা ঘট্‌ল; শেষ পর্য্যন্ত জানিয়ে যেতে না পাবলে ক্ষতি হবে। সেইজন্যে ভয় করছি।"

শিবানী ক্ষণেক চুপ করিয়া বলিল, "আজ বলতে পারবেন না বোধহয়, না?"

ব্রতীন্দ্র মস্তিষ্ককে পূরাপূরি সজাগ করিয়া তুলিবার একটা চেষ্টা করিয়া হাত দিয়া কপালের চুলগুলিকে পিছনে ঠেলিয়া

দিতে দিতে বলিল, "হুঁ। বল্‌ছি।" ভ্রূ দুইটি উপরের দিকে টানিয়া একবার চক্ষু বুঁজিয়া আবার মেলিয়া সে খানিকটা শক্তি সঞ্চয় করিয়া ঠোঁট্ খুলিতে গেল। শিবানী বাধা দিল, "থাক্, আজ থাক্। আজ কোনরকম ষ্ট্রেন্ ভালো নয়।"

"না দেখুন, যতটা পারি আজই বলে রাখি। ষ্ট্রেন্ মনে হলে থাম্‌ব।" বলিয়া সে মাথাটা ফিরিয়া ঘরের চারিদিক্ একবার দেখিয়া লইবার চেষ্টা করিল, তারপর জিজ্ঞাসা করিল, "ঘরে কেউ আছে?"

"বিভা।"

"ও। আচ্ছা শুনুন।—" ব্রতীন্দ্র গলার অনুচ্চস্বর আরও নামাইয়া কতক্ষণ কথা বলিয়া চলিল। শিবানী মাথাটা একটু নীচু করিয়া ব্রতীর শায়িত মুখের কাছে খানিক আগাইয়া সতর্কে শুনিতে শুনিতে হঠাৎ লক্ষ্য করিল, তাহার চোখ দুইটা ঘোলাটে হইয়া উঠিতেছে। ব্যস্তভাবে মাথা তুলিয়া সে বলিল, "আর নয়, আর কথা বল্‌বেন না।"

ব্রতীন্দ্রের সাধ্যও আর ছিল না বেশী। সে একান্ত শ্রান্ত হইয়া মাথাটাকে কাৎভাবে বালিশের উপর ফেলিয়া রাখিল; বার দুই ত্বরিত নিঃশ্বাস ফেলিয়া অসহায়ভাবে বলিল, "বাতাস।"

শিবানী পাখাটা তুলিয়া লইল। মাথার কাছে অর্দ্ধেক জল ভরা যে কাচের গ্লাসটা বিভা আনিয়া রাখিয়াছিল, তাহা হইতে জল তুলিয়া লইয়া সিক্ত হাতখানা ব্রতীর কপালে ও চোখের পাতায় বুলাইতে বুলাইতে গাঢ়দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে

তাকাইয়া রহিল। কী মলিন হইয়া গিয়াছে! দুইদিন মুণ্ডণের অভাবে কিঞ্চিদুদ্‌গত শ্মশ্রুরাশির রেখাগুলিতে সুন্দর মুখখানার নীচের দিক্‌টা কালো হইয়া ঢাকিয়া আছে। শিবানী অপলকে দেখিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে একটু নড়িয়া ব্রতী আস্তে ডাকিল, "দেবি!"

শিবানী নিষেধ করিল, "আর বল্‌বেন না কিছু।"

"না, বল্‌ছি না কিছু।"

শিবানী আপনার মনে মৃদু নিঃশ্বাস ফেলিল।

খানিক পরে ব্রতী আবার কথা বলিল, এবার চোখ মেলিয়া সোজা হইয়া।—"দেবি, আমি যদি মরি, তো আপনি রইলেন। যে মুক্তি দেশকে আমি দিয়ে যেতে পারলাম না, সেই মুক্তি সম্পূর্ণ কর্ত্তে আপনারা প্রাণপণে কাজ ক'রবেন এই আশ্বাস আপনার মুখ থেকে যদি পাই, তাহলে আমার আজ মর্ত্তে আফশোষ থাক্‌বে না।—আর—"

শিবানীর মুখের উপর আষাঢ়ের মেঘ নামিয়া আসিল। আনতমুখে ব্রতীন্দ্রের চোখের তারায় অচঞ্চলভাবে নিজের আয়ত নয়নের সমস্ত গভীরতা স্থাপন করিয়া সে দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "আপনি বাঁচ্‌বেন।" আপনার কাজ অন্যকে সম্পূর্ণ ক'রতে হবে না, নিজেই তা ক'রবেন। তবে এবার আপনাদের কর্ম্মপন্থা বদলাতে হবে। আমি বুঝেছি যে, দেশ উদ্ধার করবার এ পথ নয়। এতে শুধু হয় কতকগুলি শক্তিশালী প্রতিভার অপমৃত্যু। তার চেয়ে অন্য কোন পথ অবলম্বন ক'রলে তারা দেশকে শুধু মুক্তি নয়, অনেক কিছু বৃহত্তর জিনিষ দিতে পারে। আপনিও পারেন তা।"

ব্রতীন্দ্রের কানের মধ্যে কথাটি দৈববাণীর মত গিয়া পশিল। সে ম্লান মাধুরী ভরিয়া ঠোঁটের প্রান্তে হাসিয়া বলিল, "ভগবানের আশীর্ব্বাদে তাই হোক্!" তারপর আবার কি একটা কথা বলিতে উদ্যত হইয়া ক্ষণেক থামিল, ক্ষণেক শিবানীর চোখের দিকে তাকাইল। বলা আর শেষ হইল না, চোখের কোণগুলি লাল হইতে হইতে সমস্ত তারাসুদ্ধ আরক্ত হইয়া আসিল। অতর্কিতে ডান হাত দিয়া শিবানীর বামহাতের মুঠাখানি বুকের উপর টানিয়া লইয়া উচ্চারণ করিল, "শি—"

ব্রতীন্দ্র সংজ্ঞা হারাইল।

শিবানী নিজের সুঠাম্ হাতখানি ব্রতীন্দ্রের মুঠার মধ্যে ঠিক তেমনই ভাবে রাখিয়া ত্রস্তে ডাকিল, "বিভা, ডাক্তারকে ডাক।"

বিভা শুনিতেও পাইল না। তাহার ঝুঁকিয়া-পড়া মাথার এলোচুলের ফাঁক দিয়া মুখের উপর সায়াহ্নসূর্য্যের রক্তরশ্মি দেখাইয়া দিল, তাহার চেতনা নাই। ভয়ানক বিক্ষেপে কাঁদিয়া কাঁদিয়া কখন্ সে যেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে।

শিবানী দুয়ারের দিকে মুখ ফিরাইয়া তীক্ষ্নস্বরে ডাকিল, "ডাক্তারবাবু!"

সমাপ্ত